মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবী

প্র জ্ঞা প্র কা শ নী

পত্রিকা ভবন :: কলিকাতা-৩

পরিবর্ধিত সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ

২২শে শ্রাবণ ১৩৬৫

প্রকাশক

সুকমলকান্তি ঘোষ

প্রজ্ঞা প্রকাশনী

১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

কলিকাতা-৩

একমাত্র পরিবেশক

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ

পত্রিকা হাউস, কলিকাতা-৩

মুদ্রক

রঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড

কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট

বিভূতি সেনগুপ্ত

এস. এল. স্টুডিও

ব্লক ও মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

পূজনীয়া প্রতিমাদি'কে—

মৈত্রেয়ী

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী বিরচিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজশেখর বসু, শ্রীঅতুল গুপ্ত, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, শ্রীঅমল হোম প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এবং কবিগুরুর পুত্রবধূ শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রতিমা দেবী যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার পরে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক বই আছে। কিন্তু "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" অন্য সব বই থেকে স্বতন্ত্র। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘরোয়া জীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তাঁর আলাপ-আলোচনায় আর রঙ্গ-রসিকতায় যে অনির্বচনীয়ের প্রকাশ দেখা গেছে তা পাঠকদের কাছে এক নতুন আনন্দলোকের বার্তা এনে দেবে।

এই গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে : নতুন লেখা পঞ্চম পর্ব, রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্র এবং শ্রদ্ধেয় ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা, যা অন্য কোন সংস্করণে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নি।

গত বছর এই গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ আমরা প্রকাশ করি। অল্প দিনের মধ্যেই সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়। সেকারণে আমরা বিশেষ সার্থকতা অনুভব করেছি এবং উক্ত সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করে গৌরব বোধ করছি।

ভূমিকা

সে অনেক দিনের কথা। তের চৌদ্দ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে তাঁর একটি নাটক পড়েছিলেন। সেইটি শুনবার জন্য আমরা অনেকে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীও গিয়েছিলেন। তিনি তখন গৃহিণী হন নি। তাঁর সাক্ষাতে অন্যান্য কথার মধ্যে কবিকে বলেছিলাম মনে পড়্ছে, "মৈত্রেয়ী আপনার গল্প শুনতে খুব ভালবাসে; আর আমাকেও যে একটু স্নেহ করে, সে বোধহয় আমি তাঁর কাছে আপনার গল্প করি বলে।" শুনে কবি খুব হাসতে লাগলেন।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে রবীন্দ্রনাথের কথা আমি কি বলতাম মনে নেই। কিন্তু তখন কল্পনাও করিনি যে কবির খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকার শ্রীমতীর হবে এবং তিনি বিধাতার দেওয়া সেই সৌভাগ্যের প্রতিদান স্বরূপ স্বদেশবাসিগণকে রবীন্দ্রনাথের এমন বহু অপূর্ব কথা শোনাবেন যাতে মনে হবে রবীন্দ্রনাথের অধিষ্ঠানে মংপু মায়াপুরীতে পরিণত হয়েছিল।

লেখিকার এই গ্রন্থটি যিনি পড়বেন তিনিই আনন্দিত হবেন এবং বুঝতে পারবেন ঋষি মনীষী কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকার গল্প-লেখক সঙ্গীত-রচয়িতা সুরস্রষ্টা অভিনেতা নৃত্যস্রষ্টা চিত্রশিল্পী জনগণবন্ধু মানব-প্রেমিক কর্মী রবীন্দ্রনাথের মত সংলাপপটু আটপৌরে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অসাধারণ।

বাঁকুড়া
৩০শে ভাদ্র ১৩৪৯

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময়ে এই ভূমিকাটি শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখে পাঠিয়েছিলেন। কোনো কারণে এটি সে সময়ে ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ছাপা হয় নি। এবার দৈবাৎ খুঁজে পেয়েছি। তাই বিলম্বে হলেও আমার ভক্তিভাজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কবির প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগের কথা স্মরণ করে, আমার এই স্মৃতিকথার সঙ্গে তাঁর পুণ্য নাম যোগ করে কৃতার্থ হলাম।

মৈত্রেয়ী দেবী

নিবেদন

১৯৩৮ এর ২১শে মে পূজনীয় গুরুদেব প্রথমবার কালিমপং থেকে মংপু এসেছিলেন। ৯ই জুন পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে আবার কালিমপং ফিরে যান। দ্বিতীয়বার ১৯৩৯এর ১৪ই মে পুরী থেকে মংপু এসে গ্রীষ্মাবকাশটি কাটিয়ে ১৭ই জুন নাগাদ কলকাতায় নেমে গেলেন। ঐ বৎসরই শরৎকালে ১২ই সেপ্টেম্বর মংপুতে এসেছিলেন এবং দুই মাসের কিছু অধিককাল থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা নেমে যান। চতুর্থবার ১৯৪০এর ২১শে এপ্রিল এখানে আসেন, ২৫শে বৈশাখের উৎসব এখানেই সম্পন্ন হয়, তারপর কালিমপং যান। সেই বৎসর শরৎকালে আবার আসবার কথা ছিল, সেজন্য তাঁর জিনিসপত্র সবই রেখে গিয়েছিলেন,—কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আর তাঁর আসা হয়নি। ১৯৪০এর সেপ্টেম্বরে অসুস্থ শরীরে, মংপুর মত ডাক্তারহীন গণ্ডগ্রামে আসা উচিত হবে না বলে প্রথমে কালিমপং এলেন। কথা ছিল একটু সুস্থ হ'লে মংপু আসবেন। কিন্তু তা আর হোলো না। হঠাৎ দারুণ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, ২৮শে সেপ্টেম্বর অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হোলো।

আমার এই রচনার উপাদান ছিন্ন ছিন্ন পৃষ্ঠায় ইতস্তত ভাবে লেখা ছিল, প্রত্যেক দিনের তারিখও দেওয়া ছিল না। সেজন্য বইতে উপযুক্ত ভাবে তারিখ দিতে পারিনি। ইতিহাস রক্ষা বা সাহিত্য সৃষ্টি কোনোটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। অবসর পেলেই আমি তাঁর মুখের কথাগুলি লিখে রাখতাম-এবং কাজের মধ্যে মনে মনে আবৃত্তি ক'রে মনে রাখতাম, সে কেবল আমার নিজের আনন্দের

জন্যই। আর একটি কথা এখানে জানানো কর্তব্য যে আমার এই রচনা যদিও তিনি বার বার দেখতে চেয়েছেন, রহস্য করেছেন, কিন্তু কখনো দেখেননি। যে কথাগুলি নিতান্ত ঘরোয়া ভাবে বলেছেন, যেকথা ছাপাতে গেলে তিনি হয়ত অন্যভাবে বলতেন, তাও এখানে থাকতে পারে। ঘরের কথা হাটের মাঝখানে এলো, অপরাধ ঘটা অসম্ভব নয়। তবু তাঁর মুখের কথায় সমস্ত দেশের অধিকার স্মরণ করে এই ডায়েরি প্রকাশ করলাম।

মংপু
এপ্রিল, ১৯৪৩

মৈত্রেয়ী দেবী
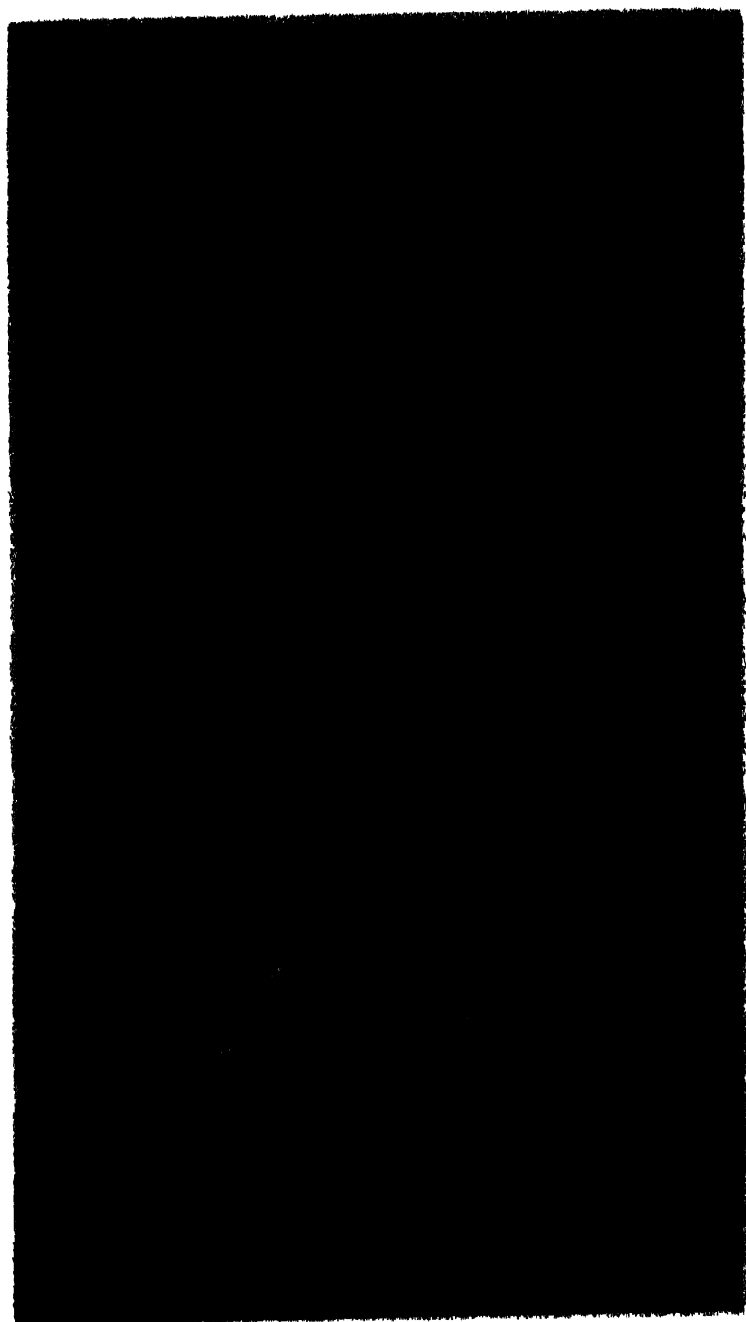
আজ যে রচনা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তা স্মৃতিকথা মাত্র নয়—তা আমার জীবনের জীবনী-প্রবাহ। বিদায়ের চার বৎসর পূর্বে তিনি আমাদের ঘরে এসেছিলেন অল্পকালের জন্যে, সেই অসীম সৌভাগ্যের আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি আজ জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের অবলম্বন ক'রে মৃত্যুবেদনার গভীর ক্ষতকেও আবৃত করতে পারি। সহস্র রকম কাজে ছোটখাট অসংলগ্ন ভাবনা চিন্তায় দিন কাটে; কিন্তু অবসর পেলেই মন চ'লে আসে তার নিভৃত কেন্দ্রে, যেখানে সঞ্চিত আছে অমূল্য সম্পদ। তাই বলছিলুম এ স্মৃতি মাত্র নয়, এ হৃদয়ের আনন্দধারা, যার সরস সজীব প্রাণের বেগ মৃত্যুও প্রতিহত করতে পারে না। যেখানে কবি মহামানব তাঁর সেই গভীরতম চিত্তের প্রকাশ কাব্যে গানে ছবিতে অসংখ্যবিধ রচনায়। তাঁর গানে কবিতায় পরমমানবের সেই অলৌকিক অনির্বচনীয় স্পর্শ অনেকেই পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর সাধারণ এলোমেলো ক্ষণগুলোর—প্রত্যহের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলোর যে অসীম মাধুর্য ও সুকুমার সৌন্দর্য ছিল, তাঁর প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি ব্যবহার যে কত উপভোগ্য কত মনোরম ছিল তা লিখে বা অন্য কোনো উপায়েই ধ'রে রাখা গেল না। যেমন কোনো প্রাণীকে চিরে চিরে খুঁজলে তার প্রাণ পাওয়া যায় না, তেমনি মানুষের কথাকে লিখে রেখে খুঁচিয়ে দেখলে তার প্রাণময় রূপটি নষ্ট হ'য়ে যায়। তার সমস্ত আবেষ্টন যে হারিয়ে গেছে। তার সঙ্গে যে মধুর হাসিটি ছিল, আধখানা-গাওয়া গানের সুর ছিল—চারিদিকের উজ্জ্বল প্রকৃতির স্পর্শ ছিল, সর্বোপরি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বরের প্রাণময় অমৃত ছিল, সে সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন, পরিবেষ্টনহীন দু'চারটি কথাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টার মধ্যে একটি অত্যন্ত সকরুণ ব্যর্থতা আছে। কিন্তু কি করি? যা হারিয়ে যাবার জন্যেই নির্দিষ্ট তাও হারিয়ে যেতে দিতে চায় না মন—

"সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ—দিব না দিব না যেতে।" সেজন্যে সময় পেলেই তাঁর সমস্তদিনের কথাবার্তা হাস্য-কৌতুক লিখে রাখতে ভালো লাগত। তিনি সে কথা জানতেন, সস্নেহ হাসি হেসে বলতেন, "জীবনে কত স্মৃতিমন্দির বানাবে? তা হয় না, জানো না জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ।" একথা যে কত সত্য তা অস্বীকার করা যায় না। সবই সেই দীপ্ত লেলিহান হোমানলে দগ্ধ হয়ে যাবে—তা না হ'লে কোথায় গেল সেই মধুর কণ্ঠের গান, সেই সহাস্য সরস প্রাণের দীপ্তি, সেই লৌকিক দেহকে ঘিরে অলৌকিক জ্যোতির্ময় আভা। কিন্তু তবু—"আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব, আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে, কহিতেছে শতবার—যেতে দিব না রে।"

এই ধরনের রচনার আরো একটা বিপদ আছে যে তা প্রাত্যহিক ঘরোয়া জীবনকে টেনে আনে, তার মধ্যে এমন একটা দিক থেকে যায়ই যা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং সেজন্যে সকলের মাঝখানে প্রকাশ্য বা সকলের উপভোগ্য হয় না। কিন্তু তাঁর প্রত্যহের দৈনন্দিন কথাবার্তা হাস্য-কৌতুক, কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ আলোচনা নয়, নিতান্ত সাধারণ কথা, যা তিনি তাঁর চাকর বনমালীর সঙ্গে বা কোনো বালকের সঙ্গেও বলতেন, তারও এমন অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য সৌন্দর্য ছিল যে সেই সৌন্দর্য ব্যক্তিগত কথার মধ্যেও নৈর্ব্যক্তিক রস সঞ্চার করত। তাই মনে হয় ব্যক্তিগত কথা বলতে যা বোঝা যায় তাঁর কোনো কথাই সে রকম সীমাবদ্ধ ছিল না। যে ভাষায় তিনি মূঢ়তম নগণ্যতম লোকের সঙ্গে কথা বলতেন সেও ছিল সাহিত্যের ভাষা, রসসিক্ত ছিল তার বিন্যাস—তাই আমাদের অন্য সব কথা বাদ দিয়ে তাঁর মুখের কথার কিছু কিছু টুক্‌রো, সেই উজ্জ্বল আনন্দময় দিনগুলোর কিছু কিছু ছবি এখানে একত্র করেছি। অত্যন্ত পঙ্গু এবং অসমাপ্ত এই রচনা, অনেক কিছু বাদ গিয়েছে ব'লে এর একটা সমগ্রতাও ফোটেনি। রচনার মধ্যে মানুষের যে প্রকাশ সে অন্যরকম, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে যে প্রকাশ সে

সেই বিশেষ মুহূর্তটির সঙ্গে জড়িত, তার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে খাতায় লিখতে গেলে সে সুরটি তার নষ্ট হবেই, তবু মনে হয় লিখে রাখি যতটুকু পারি।

যে কয়েকবার তিনি আমাদের এখানে এসেছিলেন সে কয়েক মাস আমাদের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে আনন্দময় সময়—তার কিছুই আমাদের হারানো চলে না। যে আনন্দ-প্রবাহ তিনি সৃষ্টি করতেন তার মধ্যে অবগাহন ক'রে জেনেছি জীবনে কত খুশি হওয়া সম্ভব। তিনি যদি এমন পূর্ণ প্রাণের উৎস নিয়ে, এমন সহাস্য প্রশান্তি নিয়ে, আমাদের মাঝখানে না দাঁড়াতেন আমরা কখনো জানতেই পারতুম না যে এত আনন্দিত হবার এত অকারণ খুশি হবার ক্ষমতা আমাদেরও আছে। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে চতুর্দিকে যে আনন্দের ঝরনা বইত, একথা এখানে বলতে হবে, যাঁদের তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তাঁরাও সে আনন্দের সঙ্গী ছিলেন। সে কয়দিনের উৎসবে তাঁদের অংশও ভোলবার নয়—এ লেখা থেকে সে সব আনন্দস্মৃতি বাদ গেছে, কিন্তু জীবনে সেই মহামূল্য দিনগুলির কিছুই ফেলবার নয়। এমন কি তার মধ্যে ঐ বনমালী ঐ কানুও প্রবেশ করেছে হৃদয়ের গভীরে।

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।

প্রথম পর্ব

টেলিগ্রাম পেলুম কালিমপং থেকে : "Have just arrived will be pleased to see you।"

কিছুদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল কবিকে আমাদের এখানে আনবার, কিন্তু দরিদ্র ব্যবস্থায় যথেষ্ট ভরসা হচ্ছিল না। সে কথা বলতেই ব'লে উঠলেন, "না না, তোমাদের পাহাড়ের বাংলো তো খুব সুন্দর হয় আমি জানি। তবে কিনা আমারই কল বিগ্‌ড়েছে, নড়াচড়া কষ্টসাধ্য হয়েছে।"

এইবারই কালিমপংএ পঁচিশে বৈশাখ জন্মোৎসবের দিনে টেলিফোনে broadcast করার ব্যবস্থা হয়েছিল। 'জন্মদিন' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা পড়েছিলেন। সকালবেলাই আমরা তিনজনে উপস্থিত হলুম। আমার ছোটবোন চিত্রিতাকে দেখে বললেন, "তোমাকে কি ক'রে সংগ্রহ হ'ল? ডাক্তার, তুমি তো ভাগ্যবান হে! একটি পাওনা, একটি উপরি? আমাদের তো এত সৌভাগ্য ছিল না।"

দুপুর বেলা হঠাৎ গুন গুন ধ্বনি শুনে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি চিত্রিতা পায়ের কাছে বেশ গুছিয়ে ব'সে হাতে একখানি 'সঞ্চয়িতা' দিয়ে কবিতা শোনবার ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছে। "এ কি, তুমি টের পেলে কি ক'রে? আমরা এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কাব্যালোচনা ক'রে নিচ্ছিলুম—"আব্রিত্তি" যাকে বলে,—যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো মোর হৃদয়নীরে। এ প্রেমের নানা স্তর নানা গভীরতার কথা। যদি শুধু উপর থেকে এতটুকু তুলে নিতে চাও তা আছে। যদি ভ'রে নিতে চাও তাও আছে, আর যদি এতটুকু স্পর্শ, কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও তাও চলে,—যদি ডুব দিতে চাও নেমে এসে হৃদয় ধারায় অবগাহন, সেও মন্দ কথা

নয়। আর যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও, তা'হলে কলস ভাসায়ে জলে ব'সে থাকলে চলবে না, ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে। ভালবাসার বিভিন্ন phase বিভিন্ন রূপের কথা এ।"

সেইদিন 'জন্মদিন' কবিতাটিও আমাদের শোনালেন। তার মধ্যে যে লাইনটি আছে 'এঁকেছে পেলব শেফালিকা'—তার সঙ্গে তার পরিবর্তে যেতে পারে এমন একটি লাইন ছিল 'এঁকেছিল তন্বী শেফালিকা।' "কোনটা রাখি বলতো?"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হ'য়ে বল্লুম, "আমায় জিজ্ঞাসা করছেন?"

"কেন নয়? দোষ কি?"

"কিন্তু উত্তর দেওয়াটা যে আমার পক্ষে ভয়ানক দোষের হবে!"

এমন সময় ডাক এল। সে এক প্রকাণ্ড বোঝা, সবই জন্মদিন-সংখ্যার পত্রিকা, জন্মদিনের প্রণামের চিঠি, কবিতা, কাগজ ইত্যাদি।

"তুমি একটা কবিতা লিখলে না যে? কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি তোমার ভক্তি অসম্ভব দ্রুত কমে যাচ্ছে। ওইতো কাগজ কলম রয়েছে, চট্ ক'রে, 'হে রবীন্দ্র কবীন্দ্র' ব'লে একটা লিখে ফেল না। আমার নামটা ভারি সুবিধের, কবিদের খুব সুবিধে হ'য়ে গেছে। মিলের জন্যে হাহাকার ক'রে বেড়াতে হয় না। রবীন্দ্রের পর কবীন্দ্র লাগিয়ে দিলেই হোলো।"

সেদিন অজস্র ফুল এসেছিল, কালিমপংএর অধিবাসীরা মালা পরিয়ে গেল। চিত্রিতা আর নন্দিনী তাঁর খাট ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল।

"দাদামশায়, দেখবে এস তোমার ঘর কি করেছি।"

"এই ছাখ কাণ্ড! এসব দেখলে যে মন খারাপ হ'য়ে যায়, সঙ্গিনীহীন ফুলশয্যা!"

সন্ধ্যাবেলা ফেরবার সময় কোথাও চিত্রিতার চশমার খাপ পাওয়া গেল না। বাড়িসুদ্ধ লোক তোলপাড় ক'রে খুঁজলে। বনমালী একবার বলেছিল বটে, "বাবামশায়ের পকেটটা দেখেছেন?"

"শোন কথা একবার। যদি নিতেই হয় তেমন তেমন জিনিষ নেব, চশমার খাপ নেব? তোর মত পছন্দ তো নয়!"

পরদিন মংপুতে একটা চিঠি ও চশমা এসে উপস্থিত। বনমালীর সন্দেহই সত্যি, চশমা তাঁর পকেটেই ছিল। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়, নিজের চশমা ব'লে ভুল ক'রে জোব্বার বিশাল পকেটের গহ্বরে তাকে ফেলেছেন। সেখান থেকে চশমার পুনরুদ্ধার বনমালীর অমর কীর্তি। সেই থেকে কোনো কিছু হারালেই প্রথমেই মনে পড়ত—'বাবামশায়ের পকেটটা দেখেছেন?'

স্থির করলুম আমাদের বাড়ি থেকে কিছু উপরে অরণ্যের মধ্যে একটা বড় খালি বাড়ি ছিল সেখানে সব ব্যবস্থা করব। চিঠি পেয়েছি সামনের বুধবার মংপু আসছেন। জিনিষপত্র লটবহর নিয়ে সবাই মিলে পরম উৎসাহিত চিত্তে সে বাড়িতে গিয়ে গোছগাছ শুরু করেছি। এমন সময় সংবাদ এলো যথারীতি মত পরিবর্তন হয়েছে। সে কি দারুণ নৈরাশ্য! আমাদের মেদিনীপুরের রাঁধুনি শুনেছিল বুধবার রবিবাবু আসবেন, সেই থেকে একটু গোলমাল ক'রে সে ভাবলে বুধুবাবু রবিবার আসবেন। সে বল্লে, "আচ্ছা দিদি, বুধুবাবু কী রকম লোক!" এ কথা নিয়ে পরে আমরা তাঁর সঙ্গে কত হেসেছি।

তার দু'চার দিন পরেই আসবার দিন স্থির ক'রে জানালেন। চিঠি পেয়েই আমরা কালিমপং গিয়ে উপস্থিত হলুম। রথীদা বল্লেন, "এবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে যাও। তুমি যখন কাল ফলের ঝুড়ি পাঠালে, বাবা বল্লেন, "আর দেরি করা চলে না। মৈত্রেয়ী রাগ করেছে তাই নেমন্তন্নের সব আয়োজন এখানেই পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছে।"

পায়ের উপর একটা সাদা চাদর চাপা দিয়ে একমনে বসে লিখছিলেন। "এই যে উপস্থিত। আমাকে যেতে বারণ করতে

এসেছ, না সুভদ্রার মত হরণ ক'রে নিয়ে যাবে? অপহৃত হবার আগে এবার নিজেই উপস্থিত হব দেখে নিও।"

যেদিন সুরেনের বাড়িতে তাঁর আসবার কথা সেদিন সকাল থেকে অবিশ্রাম বৃষ্টি। মংপুর বৃষ্টি যখন শুরু হয় তখন সে এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা। চারিদিকের সমস্ত পাহাড় আবৃত ক'রে মেঘ নামছে আর উঠছে। দ্বিধা সংশয়ে অপেক্ষা ক'রে আছি এমন দিনে আসা হয় কি না হয়।

বেলা প্রায় তিনটে, এমন সময় গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মনে এত আশঙ্কা, উনি গাড়ি থেকে হাত নাড়ছেন আমি তাও যেন দেখতে পাচ্ছি না; মনে হয় কেউ নেই যেন। গাড়ি থামতে থামতে ব'লে উঠলেন, "আজ এক কাণ্ড; তোমার ড্রাইভার তো এক মস্ত সাহেবের গাড়ির সঙ্গে লাগিয়েছে এক ধাক্কা। সে সাহেব ওকে তখুনি ধরে নিয়ে যায় আর কি—কত ক'রে ব'লে ক'য়ে তবে ছাড়ালুম ওকে। প্রাণটাও খুব রক্ষে হয়েছে। শুরুতেই এই কাণ্ড। তোমার এখানে আর নৈব নৈব চ।"

একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম বৈকি, সকলেরই মুখ দেখি নির্বিকার। ভাবলুম হবেও বা।—"যাক তোমার পরীক্ষা হ'য়ে গেল। যা বলব তাই বিশ্বাস করবে—সর্বদাই যদি সত্যি কথা বলব তাহ'লে কথা ক'য়ে সুখ কি — ?"

বারান্দায় একটা চৌকিতে একটু বিশ্রাম করলেন। "পথে আমার কোনো কষ্ট হয়নি। এমন সুন্দর অরণ্যপথ। তোমাদের এই বনটি কিন্তু অপূর্ব। লম্বা লম্বা সব গাছ সোজা উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্ধকার—একেই তো বলে অরণ্য।"

সিঁড়ি দিয়ে চেয়ারে ক'রে উপরে নিয়ে যাবার কথা হ'ল; গ্রাহ্য মাত্র না ক'রে সোজা উপরে উঠে গেলেন। উঠতে উঠতে বল্লেন, "অত ভাবছিলে কেন তোমরা, এ তো রাজবাড়ি গো।" উপরে ওঁর বসবার ঘরে জানালার সামনে চৌকিতে ব'সে জানালার

সিলের উপর পা রাখলেন। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসছিল; কতকগুলো সোয়ালো পাখী আমাদের ছাদের খোপের মধ্যে বাসা করেছিল, তারা কলরব ক'রে ঘরে যাতায়াত করছে—দূরের পাহাড়ে ছু'একটা ক'রে বাতি জ্বলে উঠছে। ঘরের মধ্যে ম্লান অন্ধকার—উনি বাইরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন, বল্লেন, "তোমারি জিৎ। তুমি জানতে এ জায়গাটা আমার ভালো লাগবে, তাই এত জোর করতে পেরেছিলে। ওরা আমায় বলেছিল, আমরা আগে গিয়ে দেখে আসি জায়গাটা কি রকম। আমি বল্লুম, কিছু দরকার নেই, আমি নিজেই দেখতে পারব যখন যাব।"

আনন্দে তখন আমার সমস্ত মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লুম, "আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন!"—উনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, বল্লেন, "কেন আসব না? এই তো এসেছি তোমার ঘরে।"

পরের দিন সকালে রান্নার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত এমন সময় চিত্রিতা এসে বল্লে, "এই দেখ ভাই, উনি চিঠি লিখে তিন আনা পয়সা দিয়েছেন টিকিটের জন্যে; আমি কিছুতেই নিতে চাইনি। বল্লেন, 'দাও গে তোমার দিদিকে।' কি করা যায় এখন?"

"বেঁধে দে আমার আঁচলে।"

সে বেচারা নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেই দিলে। কিছুক্ষণ পরে উপরে এসে দেখি একমনে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' বইটা লিখছেন। "আজ সকালে উঠেই তিন আনা পয়সা লাভ", ব'লে আঁচলে বাঁধা পয়সা দেখালুম।

"এই যে, বেঁধে ফেলেছ? যাক্। তোমার বোন বেচারা ভালোমানুষ, বলে, 'না, না, সে কি, আপনি কেন দেবেন টিকিটের পয়সা; আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি।'—আমি বল্লুম, দাও গে না তোমার দিদিকে, এসব জিনিসের মূল্য যে বোঝে—তোমাকে তো

আর সংসার করতে হয় না, তিন আনা পয়সার দাম কি ক'রে জানবে? একবার যথাস্থানে নিয়ে যাও দেখবে আত্মসাৎ করতে তিনি বিলম্ব করবেন না।—যাক্, কি আর হবে? আটআনা পয়সা বৌমা দিয়েছিলেন, তার থেকে তিন আনা খসল। এখন ঐ পাঁচ আনা সম্বল! সাবধানে রাখতে হবে", ব'লে কলমের বাক্সটা তুলে নিয়ে তার মধ্যে পাঁচ আনার সন্ধান করতে লাগলেন।

"আপনার একটা কলম কিন্তু আমায় দিতে হবে!" উনি গম্ভীর ভাবে পিছন ফিরে বনমালীর দিকে চেয়ে বল্লেন, "ওরে এ কোথায় এলুম? আর নয়, এবার বাক্স-টাক্স বেঁধে ফেল্। নৈলে আর সঙ্গে কিছু নিয়ে ফিরতে হবে না।" বনমালী হাসতে হাসতে চ'লে গেল। ঐ কলমের বাক্সের মধ্যে এক বোঝা কলমের সঙ্গে দু'চার আনা পয়সা যা ওঁর সম্বল—তা বরাবর থাকত—এবং বরাবর উনি সন্দেহ প্রকাশ করতেন যে সেই পয়সাগুলোর উপর নাকি আমার প্রচণ্ড লোভ আছে!

কিছুদিন আগে একবার একটা মজার দুর্ঘটনা ঘ'টে যায়। বোলপুর থেকে কলকাতা আসছিলেন, সঙ্গীরা ছিলেন অন্য কামরায়। বর্ধমানে একটা লেমনেড খেয়ে মহা বিপদে প'ড়ে গেলেন। ট্রেন তখন ছাড়ো ছাড়ো, বয়টা ওঁর অবস্থা বুঝে চ'লে গেল। সেই থেকে সঙ্গে কিছু পয়সা থাকে, যদিও উনি বলতেন, "কাছে পয়সা না থাকাটাই বিশেষ সুবিধের। কোন কিছুর দরকার পড়লে তখন এ পকেট ও পকেট দু' একবার হাতড়াতে শুরু করলে, সঙ্গে যিনি থাকেন—বিশেষ ক'রে তোমাদের মত করুণহৃদয়া হ'লে তো কথাই নেই—ব'লে ওঠেন, 'ব্যস্ত হবেন না, ও আমি দিয়ে দিচ্ছি।' বলা বাহুল্য, বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হইনি, তবু মুখের ভাবটা যথাসাধ্য নিরুপায় এবং করুণ ক'রে বলা যায়, 'আহা তুমি আবার কেন কষ্ট ক'রে—না, না, সে কি!'—এই রকম ক'রে বেশ ভালো ভাবেই চলে যায়!"

সেইদিন একটা পেলিকান কলম আমায় দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে এক টুক্‌রো কাগজে লিখলেন এই দলিলপত্র :—

সুরেল, দার্জিলিং

আমি বিখ্যাত ঠাকুরবংশোদ্ভব কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে অদ্য পুণ্য জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা দশমী তিথিতে দিনমানে পূর্বাহ্ণে ইংরেজি সাড়ে নয় ঘটিকায় পেলিকান রচিত একটি উৎসলেখনী স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে দান করিলাম। তিনি ইহা পুত্র-প্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার অধিকারিণী হইলেন। তিনি যদি ইহার পরিবর্তে তাঁহার কোনো একটি অক্ষুণ্ণ লেখনী আমাকে দান করেন আমি অসংকোচে তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিতে পারি ইহা সর্বসমক্ষে স্বীকার করিলাম। কদাচ অন্যথা হইবে না। চন্দ্র সূর্য সাক্ষী।

৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Fair exchange! তুমি যদি আমায় একটা কলম দাও, সেটা নিতে যে আমার একটুও আপত্তি নেই সে কথাও স্পষ্ট ক'রে লিখে রাখা ভালো। কিন্তু আমার সাক্ষীদের দেখা পাওয়া তো শক্ত হ'য়ে উঠল। তোমার মেঘের আড়ালে সূর্যদেব তো অদৃশ্য হয়েই রইলেন।"

"বাঃ, আপনার বিচার বেশ তো! আপনার চন্দ্র সূর্য, আর আমার মেঘ! বৃষ্টি হ'লে আপনি এমন ভাবখানা করেন যেন সেটা আমারি দোষ।"

"তাহ'লে দোষ দেব কা'কে? হাতের কাছে একটা প্রতিপক্ষ না থাকলে ঝগড়া না ক'রেই যে দিন কাটাতে হবে!"

সুরেলের বাড়িতে ভোর পাঁচটায় চা খেয়ে নিয়ে ন'টা সাড়ে-ন'টা পর্যন্ত চিঠি লেখা ও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' বইটা নিয়ে কাজ চলত। ওঁর বসবার ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে একটা

প্রকাণ্ড araucaria পাম গাছ দেখা যেত, বিশাল মহীরুহ, তার সোজা সোজা ডালগুলো যেন দুদিকে হাত বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নিচেই একটা ক্যামেলিয়া গাছ সাদা হ'য়ে থাকত ফুলে, ক্যামেলিয়াকে উনি বলতেন মোমের ফুল। কতদিন দেখেছি লিখতে লিখতে কলম বন্ধ ক'রে ঐ বিশাল ছায়াময় বনস্পতির দিকে চেয়ে ব'সে আছেন।

দশটার মধ্যে খাওয়া চুকিয়ে চৌকিতে বিশ্রাম করতে করতে একটা সংস্কৃত-ইংরেজি ডিক্‌সেনারি পড়তেন। ঘণ্টা দুই পরে উঠে আবার লেখা নিয়ে কোনদিন বিকেল পর্যন্ত কোনোদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ চলত। কতদিন বলেছি যে, "আরাম চৌকিতে ব'সেই একটা বোর্ডের ওপর রেখে লিখুন, তাহ'লে পরিশ্রম কম হবে।" কিন্তু কিছুতেই শুনতেন না। বলতেন, "চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে না লিখলে চিন্তার flow নষ্ট হ'য়ে যায়। আরামচৌকিতে হেলান দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে কখনো লেখা যায় না। এ একটা তপশ্চর্যা তো বটে, অত আরাম করলে কি হয়!"

সুরেলের বাড়িতে তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ ডাক আসত। সেই সময় কাগজ ও চিঠি পড়া নিয়ে খুব মজা হ'ত। একদিন একটা চিঠি এল, একজন ভদ্রমহিলা লিখেছিলেন, "আপনি শ্রীমতী মৈত্রেয়ীর বাড়িতে গিয়াছেন, তাঁহার এই সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হইয়াছি।" পড়তে পড়তে একটু হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "অর্থাৎ কিনা, ঈর্ষান্বিত হইয়াছি।" সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কারো কারো আসবার কথা হচ্ছিল। তাঁরা আমার এখানে না এসে অন্যত্র ওঠবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি প্রথমে জোরে পড়তে শুরু ক'রে আর থামতে পারেন নি। আমার খারাপ লাগল, দুঃখ হল একটু, "ভালই, আমাদের গরীবের বাড়িতে কেন আসবেন।" উনি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তাঁরা আমাদের মত অভাজন তো নয়, যে তুমি একটু ইঙ্গিত

করা মাত্র এসে উপস্থিত হবে, আর তারপর শত ইঙ্গিত সত্ত্বেও নড়বার নামটি করবে না।"

টেবিলের উপর একটা পিতলের ঘণ্টা থাকত, সেইটা বাজালে বুঝতুম ডাকছেন। একদিন সকালে ঘণ্টার শব্দে আমরা এক সঙ্গে সবাই ছুটে এসেছি। উনি হাসতে লাগলেন, বল্লেন, "তোমরা কিন্তু সহজে শুনতে পাও না; আমি তো অনেকক্ষণ বাজাচ্ছি।...এই লও, তোমার বাবাকে একখানা পত্র লিখলুম। কাল উনি আমায় কবিতায় চিঠি লিখেছেন। এমন ক'রে challenge করলে আমার কবিত্ব জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। উনি দার্শনিক হ'য়ে কবিতা লিখবেন, আর আমি কবি হ'য়ে গদ্যে উত্তর দেব, তাও কি হয় কখনো?"

"বন্ধু—

চিরপ্রশ্নের বেদী সম্মুখে চির নির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর,
তাহারি পরশ পায় যবে মন নম্র ললাটে বহে
আপন শ্রেষ্ঠ বর—

খনে খনে তারি বহিরঙ্গন দ্বারে
পুলকে দাঁড়াই, কত কী-যে হয় বলা,
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।"

একবার সমস্ত কবিতাটা পড়া হ'য়ে গেলে, থেমে থেমে বলে যেতে লাগলেন, "ধরা সে কিছুতেই দেবে না, এই এতটুকু দেখা যাবে ক্ষণিকের জন্যে। যতই চাও তার বেশি নয়।

মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায় বসুন্ধরা।...
অলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।

"কিন্তু সেইটুকু যে দেখলুম সেই আমার যথেষ্ট, নাই বা জানলুম তার তত্ত্ব, নাই বা জানলুম তার ব্যাখ্যা—মন তো সাড়া দিয়েছে,—

তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর,
নিজ অর্থ না জানে,
ধূলিময় বাধা-বন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।
দেখেছি দেখেছি এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায় কথা না জোগায় মুখে,
ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে
পরশাতীতের হরষ বাজে যে বুকে।

"সেই পরশাতীতের স্পর্শ পায় ব'লেই—সকল কুশ্রীতাকে ম্লান ক'রে জেগে ওঠে সুন্দর—তাই লিখেছি ঃ

দুঃখ পেয়েছি দৈন্য ঘিরেছে অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করেনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি,
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।

"কিন্তু তাই ব'লে প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই, চিরপ্রশ্নের সামনে চিরনির্বাক হ'য়েই আছে বিরাট নিরুত্তর। জানা যাবে না, জানা যাবে না।

যাহা জানিবার কোনো কালে তার জেনেছি যে কোনো কিছু
কে তাহা বলিতে পারে?
সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্য-লীলায় উঠেছে মেতে,

সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।...

"কিন্তু নাই বা জানলুম, সেজন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই।

জীবনেরে যাহা জেনেছি, অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক্ তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে।"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে অসুস্থ হ'য়ে কালিমপং থেকে কলকাতায় এলেন, দীর্ঘ একমাস রোগ ভোগের পর যখন অল্প সুস্থ হ'য়ে উঠলেন তখন একদিন কবিতা শুনতে চাইলেন। সেদিন এই কবিতাটা শুনিয়েছিলুম। দীর্ঘদিন পরে কবিতার ছন্দ কানে যেতেই উনি কী রকম খুশি হ'য়ে উঠেছিলেন সে ছবি এখনো দেখতে পাই। তারপর বারবার বল্লেন, "ঐ খানটা পড়—

সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।"

সকলে চলে গেল, আমি চুপ ক'রে পায়ের কাছে বসে রইলুম। উনি বলতে লাগলেন, "উত্তর কি কিছু আছে—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলেছি কি জানি—?

কি আছে জানিনা দিন অবসানে মৃত্যুর অবশেষে—
এ প্রাণের কোনো ছায়া,
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্তরবির দেশে
রচিবে কি কোনো মায়া?"

যখন সমাপ্তি হবে তখন চরম সমাপ্তি কিনা, যা অতীত তা শেষ হ'য়ে গেছে কিনা, কি জানি। যা সমুখে, আর যা পিছনে আমার কাছে সে উভয়ই অস্তিত্বহীন। কেবল বর্তমানটুকুই সত্য, সত্য মানে প্রত্যক্ষ। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ নয়, সেও সত্য হ'তে পারে। অতীত

আমার কাছে নিশ্চিহ্ন, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়তো সে নয়। ভবিষ্যৎ আমার কাছে অজানা, কিন্তু সেও আছে। একটা উদাহরণ দিই—খাইবার পাসের ভিতর দিয়ে চলেছি, যেখানে আছি সেই স্থানটুকুই আমার গোচর, কিন্তু যেখানটা অতিক্রম ক'রে এসেছি সেও আছে, আর যে পথ অতিক্রম করতে হবে সেও আছে। স্থানের বিষয়ে যেমন, কালের মধ্যেও এই রকমই যাতায়াত চলেছে, কেউ কেউ বলেন। জানি না আমি, বুঝি না কিছু ··যার যা ইচ্ছা কল্পনা করছে, আর তাই যদি হয় তাহ'লে স্নান ক'রে ফেল্লেই তো চুকে যায়।"

আমি ব'সে রইলুম, উনি স্নানে গেলেন। এত দেরি করতেন যে আমার মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠা হ'ত কি হ'ল। সেদিন ফিরে এসে আশ্চর্য হ'য়ে বল্লেন, "এখনও ব'সে আছ?"

"কি ক'রব? আপনি এত দেরি করেন, আমার ভয় হয়।"

"তুমি ভাবছিলে আমার মূর্চ্ছা হয়েছে? সুধাকান্তকে ডাকবে কিনা ভাবছিলে?"*

সন্ধ্যাবেলা চুপ ক'রে চৌকিতে ব'সে থাকতেন। একটা চাদর দিয়ে পা ঢাকা—আলোটা অধিকাংশ দিনই বাইরে থাকত -দরজার আড়ালে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকতেন। আমরাও পায়ের কাছে ব'সে থাকতুম নীরবে। একদিন ওঁর রক্ষীরা, যাঁদের উনি কখনো বলতেন অভিভাবক কখনও বলতেন নন্দীভৃঙ্গী, সুরেল থেকে নিচে মংপুতে বেড়াতে গিয়েছেন। রাত্রি হ'য়ে এলো তখনও ফেরেননি। পথে ভাল্লুকের উৎপাতের ভয় ছিল। তাই নিরস্ত্র বঙ্গযুবকদের জন্যে আমরা বেশ একটু ভাবিত হ'য়ে পড়লুম। লোক পাঠান হ'ল—লোকও ফেরে না, তাঁরাও ফেরেন না। উনি খুব ব্যস্ত হলেন, "আমি তোমায় বলেছিলুম আমার এই নন্দীভৃঙ্গী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে লোভনীয় কিছুই নেই, তাঁরা বিশুদ্ধ উপদ্রব।"

---

* ইতিপূর্বে ইরিসিপ্লাস অসুখের সময় চেয়ারে বসে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন এখানে সে কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"না, না, বিশুদ্ধ উপদ্রব কেন হবেন—তাহ'লে চায়ের টেবিলে অত উচ্চহাসি কি শুনতে পেতেন ?"

"সেইজন্যেই তো আরো ভাবনা হচ্ছে ; পাহাড়ে' পথ, অন্ধকার রাত্রি, পথ হারালে আর হাসির খোরাক জোগাবার কেউ বাকি থাকবে না।"

বেশ রাত্রি ক'রেই তাঁরা ফিরলেন।

"এ কি কাণ্ড তোদের এমন ভাবিয়ে তুলিস্।"

সুধাকান্ত বাবু বল্লেন, "আমাদের যে কি বিপদ হয়েছিল তা জান্‌লে আর রাগ করবেন না। সশরীরে যে ফিরে আসতে পেরেছি সেজন্যে খুশি হবেন বরং।···মাঝ পথে আলো নিবে গেল, গভীর অন্ধকার জঙ্গল, পাহাড়ে' রাস্তা, একজন আর-একজনের সাদা জামার আভাস ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে চলেছি ছাতা দিয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে। একবার ফস্‌কে খাদের মধ্যে পড়েছিলুম আর কি। ছাতাটার উপর ভর দিয়ে কোনো রকমে সামলে নিয়েছি, এমন টাল খেয়েছিলুম যে ছাতাটা ভেঙেই গেল। প্রাণ নিয়ে যে ফিরতে পেরেছি এই ঢের।"

উনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছাতাটা কার ?"

"ডাক্তার সেনের।"

"চমৎকার! ফিরে গিয়ে ভদ্রলোককে একটা ছাতা পাঠিয়ে দিস্।"

আমি হাসতে লাগলুম। সুধাকান্তবাবু চলে গেলে উনি বল্লেন, "এ গল্পের এক বিন্দুও যদি তুমি বিশ্বাস কর, তাহ'লে বলব তুমি বোকা। আসলে সেখানে আছে গল্পের মৌতাত, আড্ডা দিতে দিতে দেরি হ'য়ে গেছে ; এখন একটা রোমাঞ্চকর গল্প বানিয়ে আমাদের sympathy আদায় করা চাই তো। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, এদিকে খাদ, ওদিকে ভাল্লুক! এই গল্প যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছবে তখন যে আরো কত thrilling হ'য়ে উঠবে তা তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। চারদিক থেকে চারটে ভাল্লুক তেড়ে

এসেছে, অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না, শুধু তাদের সাদা দাঁত—আর মাঝখানে এরা দুই বীরপুরুষ—হাতে ডাক্তার সেনের ছাতা।”

সেই ভাঙা ছাতা নিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত খুব মজা হ'ত। পরের দিন সকালে বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত, রাস্তা পিছল হয়েছে। ডাক্তার সেন গাড়িতে আপিসে নামবেন। উনি বল্লেন, “অনিল, ড্রাইভারের হাতে ছাতাটা দিয়ে দে, গাড়ি যদি slip করে ছাতা দিয়ে ঠেকাতে ঠেকাতে যাবে।”

একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে নিত্যকার নিয়মমত তখনও লেখবার টেবিলে পৌঁছননি। আমি গল্প করছি পায়ের কাছে ব'সে। ওঁদের সেকালের কথা বলছেন। সুরেলের বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক ছিল না, সন্ধ্যে হ'লে ঘরে ঘরে আলো দিয়ে যেত। সেটা ওঁর ভালো লাগত। সেকালের কথা মনে পড়িয়ে দিত। বল্লেন, “আমাদের সময় এই রকমই তো ছিল। সন্ধ্যে হ'লেই সেজবাতি নিয়ে আসত বেহারা—তবে তোমার ওই দুর্ধর্ষ আলোটার মত আলো তখন ছিল না। এখনকার আলোর তুলনায় সে খুবই ম্লান। কিন্তু কিছু অসুবিধে তো হ'ত না, বেশ চলে যেত।”

“সেজবাতি কি রকম?”

“সে কি। তুমি সেজবাতি দেখনি!”

“বাঃ, আমি কি ক'রে দেখব!”

“ওঃ, তুমি বুঝি গোড়া থেকেই ইলেকট্রিকের যুগের? তুমি এত আধুনিক? আশি বছর প্রায় হ'তে চল্ল পৃথিবীতে এসেছি, কত লোকেরই শুরু এবং সারা হ'ল এর মধ্যে। তোমরা কে যে কখন্ দেখা দিয়েছ মনে থাকে না আমার, বিশেষত আজকাল। হয়তো ফস্ ক'রে তোমাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারি, ‘নতুন বৌঠানকে মনে আছে?’...তখনকার দিনগুলোর সঙ্গে আজকাল

সব রকমে কত যে পার্থক্য হয়ে গেছে, এ যেন অন্য জগৎ। এত ধীরে ধীরে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, লক্ষ্য হয়নি কখন কি হ'লো। কিন্তু যখন ফিরে চাই মনে হয় যেখানে শুরু করেছিলাম তার আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই—মানুষের সম্বন্ধ থেকে শুরু ক'রে সমস্ত জগতের বন্দোবস্তই বদলে গেছে। সে সময়ে একটা জিনিস ছিল পাল্কী। বড়লোকের বাড়ির পাল্কীগুলোর আবার সাজ থাকত জমকালো। ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কী ছাড়া মেয়েদের কি চলবার জো ছিল? কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল অত পাল্কী কলকাতা শহর থেকে। তুমি বুঝি পাল্কীও দেখনি?"

"দেখব না কেন, সে তো এখনও দেখা যায়।"

"ওঃ, সেই রকম! কলকাতার রাস্তায় পাল্কী চলতে দেখনি? হায় হায়, তুমি কতটা আধুনিক পরিষ্কার ক'রে বলোতো। আমি কিছুই মনে করতে পারছি না—কবে থেকে তোমায় দেখছি। দাঁড়াও, সেই যে তোমার বাবার সঙ্গে আসতে…"

"আচ্ছা সে থাক্, আর অত হিসেব ক'রে কি হবে—তার চেয়ে গল্প বলুন।"

"না, না, মেয়েরা আবার বয়সের হিসেব পছন্দ করে না।… তখনকার দিনে তো এ রকম সরকারী জলের বন্দোবস্ত ছিল না। ভারীরা জল দিয়ে যেত। নিচে একটা অন্ধকার ঘরে সম্বৎসরের খাবার জল জমা থাকত—গঙ্গাজল—বেশ মনে পড়ে, বড় বড় জালা ভর্তি জল—অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘর। সে ঘরটা ছিল ভূতেদের আড্ডা। কত দাসী যে সে-ঘরে কত রকম চেহারার ভূত দেখেছে তার ঠিক নেই।

"তখনকার দিনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কত যে সহজ ছিল তা তোমরা এখন ধারণা করতে পারবে না। এখনকার প্রত্যেক মানুষ, বিশেষ ক'রে বড়মানুষেরা এত গণ্ডীবদ্ধ, সে গণ্ডী পার হ'য়ে তাদের কাছে পৌঁছন যায় না—কিন্তু তখন ছিল সবই অন্যরকম, আভিজাত্যের বালাই কখনো মানুষকে দূরে সরিয়ে

রাখত না। দেখেছি তো বড়দা'দের, যে কেউ এসে অনায়াসে তাঁদের সামনে বসে যেত। অতিথি-অভ্যাগত যত অভাজনই হোক না কেন বাড়িতে সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার। একটা মোট কাঁধে ক'রে ঢুকে পড়লেই হ'ত, দুদিনেই পরমাত্মীয় হ'য়ে উঠত। দাদা মামা পিসে যা-হোক একটা কিছু হ'য়ে উঠতে কিছুমাত্র দেরি হ'ত না, এখনকার যুগে এটা কি সম্ভব? কিন্তু এক দিক থেকে দেখতে গেলে এর একটা মাধুর্য আছে—মানুষকে এই যে সহজে পাওয়া এ কম কথা নয়—এখন যে তোমরা ক্রমশই বড়মানুষ হ'য়ে উঠছ একি ভাল হচ্ছে? কত রকম সরঞ্জাম তোমাদের—ও লাইট, ফ্যান, চৌকি, টেবিল, আসবাব অসংখ্য, উপকরণ অসংখ্য। সহজ simple জীবনের এগুলো একটা প্রচণ্ড বাধা। এই বাধাই জড়ো হচ্ছে। স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে জীবনের অপ্রয়োজনীয় আয়োজন। এ আমার ভালো লাগে না। সেইজন্যেই আমি ইচ্ছে করি একটা মাটির ঘর বানিয়ে মুড়িটুড়ি খেয়ে স্বাভাবিক সহজ জীবন যাপন করতে। সেইজন্যেই তো একটা ছোট বাড়ি বানাতে চাই, কিন্তু তা হবে না, এ যুগে কিছুতেই তা হ'য়ে ওঠে না। নৈলে প্রথম যখন শান্তিনিকেতন হ'ল তখন তো অন্য রকমই ছিল। এখনো হয়তো আতিথ্য পুরোপুরিই হয়, জানিনে আমি। তখন আতিথ্যের আয়োজন অনেক সামান্য ছিল, কিন্তু সে ছিল হৃদয়ের আতিথ্য। আমার ছোট ছেলে শমী লোকজন এলে তাদের মোট ঘাড়ে ক'রে আনত। আমার ছেলেরা কখনো মনে করবার সুযোগ পায়নি যে তারা বড়মানুষ, সত্যি সত্যি তারা বড়মানুষ ছিল না—আমি তো নিঃসম্বলই হয়েছিলুম। সকলের সঙ্গে মিলনের পথ তখন সহজ ছিল। এখন কি সে আদর্শ আছে? না, না, সে fail করেছে। কিন্তু তার আর উপায় নেই—আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা দ্বারা যুগধর্ম তো বদলাতে পারব না, অতএব চুপ ক'রেই থাকব। তবু আমার ইচ্ছে করে আমার নিজের যতটুকু আয়োজন তা যেন

simple থাকে। যেমন সহজে জীবন শুরু করেছিলুম তেমন সহজেই শেষ করি।”

“আপনার বিয়ের গল্প বলুন।”

“আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু ক'রলেন, আমি বল্লুম, 'তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই।' তাঁরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাইনি। আমি বলেছিলাম, আমি কোথাও যাব না এখানেই বিয়ে হবে। জোড়াসাঁকোতে হয়েছিল।”

“সে কি, আপনি বিয়ে করতেও যশোর যাননি?”

“কেন যাব? আমার একটা মান নেই?”

“ভীষণ অহঙ্কার!”

“তা হোক্, তাঁরা তোমাদের মত আধুনিকা তো ছিলেন না, এসেছিলেন তো!”

“জানো একবার আমার একটি বিদেশী, অর্থাৎ অন্য province-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে, জমিদার আর কি, বড় গোছের। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী সে। আমরা কয়েকজন গেলুম মেয়ে দেখতে, দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন—একটি নেহাৎ সাদাসিদে, জড়ভরতের মত এক কোণে ব'সে রইল; আর একটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস্। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজালে ভালো—তারপর music সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'ল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়!—এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়েস হয়েছে, কিন্তু সৌখীন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বল্লেন,—'Here is my wife' এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে 'Here is my daughter'!...আমরা আর ক'রব কি, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে চুপ ক'রেই রইলুম; আরে তাই যদি হবে তবে

ভদ্রলোকদের ডেকে এনে নাকাল করা কেন! যাক্, এখন মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়।...যাহোক, হ'লে এমনই কি মন্দ হ'ত। মেয়ে যেমনই হোক না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্যে তো এ হাঙ্গামা করতে হ'ত না। তবে শুনেছি সে মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই ভাবি ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী বিধবা হ'লে আবার প্রাণ রাখা শক্ত।"

একদিন বিকেলবেলা দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে বেড়াতে এসেছিল। আমি বল্লুম, "ওরা আপনার কাছে কিছু শুনতে চায়।" সবাই মাটিতে বসলুম ওঁকে ঘিরে—উনি 'Crescent Moon' থেকে পড়তে শুরু করলেন। 'মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে', 'তুমি যদি মা আকাশ হ'তে আমি চাঁপার গাছ'—এগুলোর ইংরেজি তর্জমা পড়লেন। সে সুন্দর মধুর উচ্চারণ শুনে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে রইল। বোধ হয় ওদের মুখের ভাব দেখে, এবং সেই সন্ধ্যার আলোতে নির্জন বনের মধ্যে ওঁর নিজের কণ্ঠধ্বনি নিশ্চয় নিজের কাছেও ভালো লেগেছিল —উনি প'ড়েই চললেন। প্রায় সমস্ত 'গীতাঞ্জলি'টা পড়া হ'ল। 'কৃপণ' কবিতাটার তর্জমা মনে পড়ে, Least littlegrain,...শেষ হ'ল সেই কবিতাটায়—'In one salutation to Thee.... ।'

যেখানে উনি বসেছিলেন তার পিছনেই একটা তাকের উপর উজ্জ্বল আলো রেখে গেয়েছিল। রেশমেব মত সাদা চুলের উপর সাদা আলো পড়েছে। সে সৌন্দর্য যে কী অপরূপ মানুষের ভাষা তা প্রকাশ করতে পারে না, চোখ তা দেখে তৃপ্ত হয় না। বাইরে তখন অরণ্যছায়ায় অন্ধকার গভীর হ'য়ে এসেছে, ঘরের মধ্যেও চারিদিক ম্লান, শুধু আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোকে প্রকাশিত মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি, আর কানে আসে সুমধুর কণ্ঠস্বর। পড়া শেষ হ'য়ে গেলে আমরা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম, আর হৃদয়ের মধ্যে নীরব ধ্বনিতে ধ্বনিত হ'তে লাগল—"In one

salutation to Thee—In one salutation to Thee—একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে!" সেদিনের অনুভূতি আজ কিছুতেই তেমন ক'রে মনে আনতে পারিনে। এত অক্ষম আর এত অকৃতজ্ঞ আমাদের মন। যা ভোলার নয়, যা মনে থাকলে জীবন সার্থক হ'য়ে যায়, তাও আমরা এমন অনায়াসে এমন অবহেলায় ভুলে যেতে পারি।

অনেকক্ষণ পরে ওরা সকলে চলে গেলে সেদিন বলেছিলেন প্রথম যখন গীতাঞ্জলি লেখেন তখনকার কথা। শান্তিনিকেতনে এখন যেটা Guest house তার দোতালায় থাকতেন। সেইখানে বারান্দায় কত সন্ধ্যা কত প্রত্যুষ কেটেছে এই গানগুলি নিয়ে।

"প্রথম যখন ইংরেজি তর্জমা করি, একটু মাত্র বিশ্বাস ছিল না যে সে ইংরেজি পাঠ্য হবে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে এণ্ড্রুজ অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন। বেচারা এণ্ড্রুজ সে কথা শুনে ভারি লজ্জা পেতেন। রথেন্‌ষ্টাইনের বাড়িতে ইয়েটস্ যেদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করলে 'গীতাঞ্জলি' শোনাবার জন্যে, সে যে কি সংকোচ বোধ করেছিলুম বলতে পারিনে। বারবার বলেছি কাজটা ভাল হবে না। ইয়েটস্ শুনলে না কিছুতে। অদম্য সে। করল আয়োজন, বড় বড় সব লোকেরা এলেন, হ'লো 'গীতাঞ্জলি' পড়া। কারো মুখে একটি কথা নেই—চুপ ক'রে শুনে চুপচাপ সব বিদায় নিয়ে চ'লে গেল—না কোন সমালোচনা, না প্রশংসা, না উৎসাহসূচক একটি কথা। লজ্জায় সংকোচে আমার তো মনে হ'তে লাগল ধরণী দ্বিধা হও। কেন ইয়েটস্-এর পাল্লায় প'ড়ে করতে গেলুম একাজ। আমার আবার ইংরেজি লেখা, কোনদিন শিখেছি যে লিখব? এই সব মনে হয়, আর অনুতাপ অনুশোচনায় মাথা তুলতে পারিনে। তার পরদিন থেকে আসতে লাগল চিঠি—উচ্ছ্বসিত চিঠি—চিঠির স্রোত; প্রত্যেকের কাছ থেকে চিঠি এল একেবারে অপ্রত্যাশিত রকমের। তখন বুঝলুম যে সেদিন এত moved হয়েছিল যে কিছু প্রকাশ

করতে পারেনি। ইংরেজেরা সাধারণতই একটু চাপা, তাদের পক্ষে তখনি কিছু বলা সম্ভব ছিল না। যখন চিঠিগুলো আসতে লাগল কি আশ্চর্য যে হয়েছিলুম। এতো আমি প্রত্যাশাও করিনি, কল্পনাও করিনি। বন্ধু ইয়েট্‌স্ খুব খুশি হয়েছিল।”

“এটা একটু খাবেন? রোজ রোজ আপনাকে কি নিরামিষ খাওয়াব ভেবে পাইনে।”

“ও পাদার্থটা কি?”

“Brain।”

“এই দেখ কাণ্ড। এতো প্রায় অপমানের সামিল। কি ক'রে ধরে নিলে ও পদার্থটার আমার প্রয়োজন হয়েছে? আজকাল কি আর ভাল লিখতে পারছিনে? বিশ্বকবির কবিত্বশক্তি হ্রাস হ'য়ে আসছে? যাক সন্দেহ যখন একবার প্রকাশ ক'রেই ফেলেছ তখন শুরু করা যাক।…কিন্তু একটা কথা, বৌমা কি মনে করবেন? তাঁর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব বল? তিনি যদি বলেন ‘এতদিন আমি ব'লে ব'লে কিছুতেই আপনাকে মাংস খাওয়াতে পেরে উঠছিনে, আর যেই ওই কন্যাটি একবার বল্লে, আপনি অমনি একেবারে বাধ্য ছাত্রের মত, সুবোধ বালকের মত'—”

“মোটেই বৌমা তা বলবেন না, আপনি খেলেই তিনি খুশি হবেন।”

“তুমি দু-এক খানা সাইকলজির বই সাজিয়ে রেখেছ বটে কিন্তু তোমার সাইকলজির জ্ঞান কিছুই হয়নি দেখছি—”

“বাঃ, সব মানুষের সাইকলজি কি এক?”

“এ ঠিক বলেছ, তা নয়—বৌমার মন খুব উদার, তোমাকে তো খুবই স্নেহ করেন। আর এই বৃদ্ধ শিশুটির ওপরে তো তাঁর স্নেহের অন্ত নেই। তাই কোনকালে যাহা ছিল না এ বয়সে আমার তা হয়েছে। মনটা খোকা হয়ে উঠ্‌ছে। সর্বদাই মা মা করে মন। যখন তিনি কোথায়ও যান তখন চারিদিক শূন্য বোধ হয়। ঐ যে

তিনি খাবার সময় কাছটিতে এসে বসেন, আস্তে আস্তে বলেন 'এটা একটু খেয়ে দেখুন'—সে শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। এরকম কিন্তু আমার ছিল না, মনের দিক থেকে শরীরের দিক থেকে একেবারে স্বাধীন ছিলুম বরাবর। ছোটবেলায় চাকরদের কাছে মানুষ, হেলা ফেলায় মানুষ—তাই কোনো সেবা-যত্ন প্রত্যাশা করিনি বহুদিন—অভ্যাস ছিল সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর থাকবার। অভ্যাস ছিল অযত্ন। বাঙালী বাবুদের মত গরমের সময় মেয়েদের হাতের পাখার বাতাস আমার অভ্যাস নয়—কিন্তু ইদানিং এই মা-টি আমায় খোকা ক'রে তুলেছেন, বোধ হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার শিশু হ'য়ে যাচ্ছে।"

একদিন খেতে বসেছেন, কথা উঠল গদ্য কবিতার। আমি বল্লুম, "একটা কথা নির্ভয়ে বলব ?"

"সম্পূর্ণ—দেবি! কবে তুমি ভয়ে নির্বাক হ'য়ে থাক ? সে শুভদিন তো আজ পর্যন্ত দেখিনি।"

"আচ্ছা তাহ'লে ব'লে ফেলি, গদ্য কবিতা আমার ভালো লাগে না।"

"তার অত্যন্ত সহজ কারণ এই যে এখনও তুমি অভ্যস্ত হওনি।"

"তা হ'তে পারে। তাহ'লেও একটা প্রশ্ন থাকে, অভ্যস্ত হলুম না কেন ? ভালো লাগে না বলে পড়িনে তা ত নয়। কোনটা কিছু কিছু ভালোও লাগে হয়তো, কিন্তু মিলের কবিতার মত কিছুই নয়। যে কবিতা প'ড়ে রাতের পর রাত কাটান যায়, যে কবিতা উচ্চারণ ক'রে সকল সময়ে সকল রকম মনের অবস্থাতেই মন মুক্তি পেতে পারে, গদ্য কবিতায় সে আনন্দ-স্বাদ কোন দিন পাইনি।"

সুধাকান্তবাবু বল্লেন, "আমারও তাই মত।"

"কী, তোমার তাই মত কি রকম, তুমি তো আজকাল গদ্য কবিতা লেখবার রীতিমত চেষ্টা শুরু করেছ। ওর একটা গুণ আছে জানো, যখন যেদিকে সুবিধে দেখে সেইদিকে জুটে পড়ে।"

"আজ্ঞে না, আমি কোনোদিন গদ্য কবিতা লেখার চেষ্টামাত্র করিনি, সে আমার ভাই লেখে।"

"আসল কথা সস্তা মিলের মোহ তোমাদের পেয়ে বসেছে।"

"সস্তা কি ক'রে বলবেন? 'বলাকা' কবিতায় মিল আছে, তাতে তার দাম কিছু কমেছে কি?" 'ছবি' কবিতাটা মনে এল, বলে গেলুম। "এতে মিল থাকাতে কি ক্ষতি হয়েছে? অর্থের তাৎপর্যের গভীরতা কিছুমাত্র খর্ব হয়েছে কে বলবে? কিন্তু এও ঠিক যদি মিল না থাকত এমন ক'রে অন্তরে প্রবেশ করত না, এর ছন্দবন্ধ এমন ক'রে মনে থাকত না।"

"না, তোমরা একটা বড় ভুল কর—এ দুই-এর মধ্যে তুলনা চলে না, দুটোর দু'রকম রস, এ দুই জিনিষ। তুমি যদি গদ্যের সঙ্গে কবিতার তুলনা কর সেই রকমই হবে। 'লিপিকা' তোমার কেমন লাগে?"

"খুব ভালো।"

"দেখ একবার, contradiction কি রকম তোমার মধ্যে। 'লিপিকা' কেন ভালো লাগে? সে তো গদ্য কবিতা, বিশুদ্ধ গদ্য কবিতা। লেখাটা গদ্যের ছাঁদে, এই মাত্র তফাৎ।"

"শুনুন বলি 'পায়ে চলার পথ' আমার মুখস্থ আছে, কিন্তু একটাও গদ্য কবিতা বলতে পারব না; তা থেকেই বুঝবেন যা বলছি সেটা মনের কথা। কিন্তু কেন যে একটা ভালো লাগে আর একটা লাগে না অত বিশ্লেষণ করবার কি ক্ষমতা আছে আমার?"

"বুঝেছি, তা'হলে হয়তো পড়তে পার না।"

"তা খুবই সম্ভব। মনে আছে একবার রবীন্দ্র-পরিষদে আপনি পড়েছিলেন "সাধারণ মেয়ে"—সেই প্রথম আপনার মুখে গদ্য কবিতা শুনি, ভালো লেগেছিল সেদিন।"

"আচ্ছা তাহ'লে আজ সন্ধ্যেবেলা পড়া যাবে, দেখি ভালো লাগাতে পারি কি না।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা চেয়ারের পিছনে বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে 'শ্যামলী', 'পত্রপুট' প্রভৃতি নিয়ে আমরা দুই বোন উপস্থিত। বইগুলো ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বল্লেন, "কোথা থেকে শুরু করব ?"

"একটু অপেক্ষা করতে হবে, সবাই আসবেন।"

"ওদের যদি তোমাদের মত উৎসাহ থাকত—তাহ'লে এমন হরিণীর মত ছুটে আসত—এসো আমরা শুরু করি।"

যা হোক ক্রমে সকলে এসে বসলেন। শুরু হল পড়া। 'শ্যামলী' সম্পূর্ণ পড়া হ'ল। 'পত্রপুটে'রও অনেকখানি। সেই 'সাধারণ মেয়ে' আবার পড়লেন। ক্রমে রাত্রি হ'য়ে এল—অরণ্যে ঝিঁঝিঁ পোকাদের ঐকতান প্রবলতর হ'য়ে উঠল, ওঁর খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। গৃহিণীর কর্তব্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলুম সেদিন। কত যে ভালো লেগেছিল সে কথা আজ মনে পড়ে, তবু ঔদ্ধত্য তো কম নয়। অনায়াসে বল্লুম, "আপনি পড়লে তো ভালো লাগবেই। সর্বদা আপনাকে পাব কোথায় ?"

উনি হাসলেন, "হেরেও জিতবে এই কি প্রতিজ্ঞা ?"

সন্ধ্যেবেলা এবং প্রায় চার বেলাতেই যখন খেতে বসতেন সুধাকান্তবাবু এসে আসর জমাতেন। একদিন হাতে একখানা কাগজ নিয়ে এসে বল্লেন, "গুরুদেব, কালকের কাগজে একটা মজার ঘটনা বেরিয়েছে। আমাদের অমুক বাবুর বয়স তো বার্ধক্যে পৌঁচেছে। এই তো সেদিন তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হ'ল, এর মধ্যে গিয়েছিলেন একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে। পাড়ার ছেলেরা টের পেয়ে ভারি নাকাল করছে ভদ্রলোককে।" তখন ভদ্রলোকের সেই নাকাল সম্পর্কীয় আলোচনায় আমরা সকলেই বেশ উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিলুম ; উনি চুপ ক'রেই ছিলেন, একটু পরে বল্লেন, "এ তোমাদের ভারী অন্যায়, সে ভদ্রলোকের দোষটা কি ?"

"বাঃ, দোষ নয় বলছেন? এত বয়স, এই সেদিন স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে—"

"সেই জন্যেই তো আরো দরকার। চিরজীবন যার স্ত্রীকে অভ্যাস হয়েছে শেষ জীবনে সে-ই তো বেশি অসহায় হ'য়ে পড়ে।"

"তাই ব'লে একটি ছোট মেয়েকে—"

"সেই ছোট মেয়ের হয়তো বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, সে খোঁজ তোমরা কি ক'রে জানবে। এসব মানুষের ব্যক্তিগত কথা, বাইরে থেকে তোমরা কি ক'রে বিচার ক'রবে! এ নিয়ে তাই ব্যঙ্গ করা ঠিক নয়।"

তার পর দিন সন্ধ্যেবেলা খাবার টেবিলের কাছে ব'সে আছেন। জানালাটা খোলা, বাইরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে গাছের সারি কালো কালো প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দুটো প্রকাণ্ড ৭।৮ ইঞ্চি চওড়া 'মথ' প্রজাপতি ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে টেবিলের উপরের প্রকাণ্ড আলোটাকে দুচার বার প্রদক্ষিণ ক'রে, আলোর চাইতেও জ্যোতিষ্মান যিনি ছিলেন তাঁর কাছেই আশ্রয় নিল। অতবড় প্রকাণ্ড 'মথ' পূর্বে কখনো দেখিনি। আমরা সবাই খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলুম।

"দেখুন, আপনি কালকে সে ভদ্রলোকের বিয়ে সম্বন্ধে যে রকম মতামত প্রকাশ করছিলেন তাতেই আমাদের একটু সন্দেহ হয়েছিল। আজ এত লোক থাকতে এ প্রজাপতি দুটো আপনার গায়েই বসাতে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।"

"ও, তোমরা বুঝি মনে করেছিলে আমার আর কোনো আশাই নেই? দেখ, অমন ক'রে বয়সের প্রতি ইঙ্গিত কোরো না, মনে বড় আঘাত লাগে। একেবারে সব সম্ভাবনার বাইরে চলে যাবার মত এমনই কি বয়স হয়েছে?"

"আপনি তাহ'লে মন স্থির ক'রে ফেলুন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিই।"

"দিয়েই দেখনা, পরের দিন বড় বড় Head Lineএ খবর বেরুবে। আর দেশ বিদেশ থেকে কত যে ভাল ভাল সম্বন্ধ

আসবে। তখন কাকে রাখি তাই ভাবনা হ'য়ে উঠবে। তোমায় কিন্তু বাছতে দেব না, তাহ'লে ফল ভাল হবে না মনে হচ্ছে, তোমার যেন ব্যাপারটা পছন্দ নয়।

"আমার অপছন্দ হবে কেন? আপনার গায়ে প্রজাপতি বসেছে, আপনি করবেন বিয়ে, আমার ক্ষতি কি তাতে। তবে যত আবেদন আসবে মনে করছেন তত নাও আসতে পারে।"

"কি, আবার বয়সের প্রতি ইঙ্গিত? সুধাকান্ত, বড় অপমান করছে হে!—যাক গে, তোমার চাইতে উঁচুদরের পছন্দর অনেক কন্যা আছেন এই যা ভরসা।"

"ওগো সীমন্তিনি! জিনিসপত্রগুলো নিয়ে অত ছুটোছুটি কোরো না, কোরো না। এই চাকরগুলো আছে কি করতে? ওদের পায়ে যে মরচে প'ড়ে যাবে। তার চেয়ে তুমি ওই চৌকিটায় বোসো, কথা বল ধীর মধুর ভাষে—ওগো ধীর মধুরভাষিণী বলো ধীর মধুর ভাষে, তোমার গোপন কথাটি সখী রেখনা মনে, শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে, তোমার গোপন কথাটি!"

উনি আমার কাছে তিন দিন থাকবেন ব'লে এসেছিলেন, এ সময় পনের-ষোল দিন উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। প্রবল বর্ষা নেমেছে স্নুরেলের অরণ্য অন্ধকার ক'রে, দিন রাত মেঘের ছায়া, কুয়াশার আবরণ সামনের সমস্ত আকাশ অবগুণ্ঠিত ক'রে রয়েছে। আমার ভয় করছিল যদি এইবারে ওঁর মন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়। উনি তখন দিবারাত্রি লেখা নিয়ে রয়েছেন, বইটা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

"বনমালী, তোর জায়গাটা লাগছে কেমন?"

"আজ্ঞে আমার তো ভালই লাগছে—আমার দেশের লোকও রয়েছে কিনা।"

"তোর দেশের লোক আবার এখানে পেলি কোথায়?"

"কেন, খুকুর আয়া; ওর বাড়ি—আর আমার বাড়ি, মাত্র একখানি গ্রাম মধ্যিখানে।"

বনমালী চলে যেতেই বল্লেন, "লোকটি রসিক আছে, এমন নৈলে আর আমার চাকর হয়—মধ্যে মাত্র একখানি গ্রাম।"

একদিন ভোরবেলা ঘরে ঢুকতেই বল্লেন, "ওগো গৃহিণী, তোমার সুসজ্জিত গৃহস্থালীর মধ্যে কিছু বিপর্যয় ঘটাব?"

"নিশ্চয়ই, অনায়াসে, কি করতে চান বলুন।"

"ওই পাশের ঘরটা তো পড়েই রয়েছে। ওইখানে আমার জায়গা ক'রে দাও।"

"কেন বলুন তো? এ ঘরটা থেকে তো চারিদিক ভালো দেখতে পাওয়া যায়।"

"তা ঠিক। কিন্তু ও দিকটা পূবদিক, সকাল বেলায় রোদ এসে পড়ে, সেই প্রথম আলোটি আমার বড় দরকার। দেখেছ তো আমায় শান্তিনিকেতনে, ভোরবেলা উঠে ব'সে থাকি, অপেক্ষা ক'রে থাকি কখন আমার আকাশের মিতা আসবে, আমায় আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেবে। কি ক'রে এ নামের ঐক্য হোলো জানিনে, আমি যে আলোর পূজারী, সূর্যোপাসক।

আজ মনে পড়ে তাঁর সেই ভোরবেলাকার শান্ত সমাহিত মূর্তি। দুটি হাত কোলের কাছে জড়ো করা, ভোরবেলার আলো গায়ে এসে পড়েছে। সামনের সমস্ত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে অদৃশ্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি। সেই সময় তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয় অনুভব করেছেন কতদূরের মানুষ তিনি। অথচ কিছুক্ষণ পরেই দেখেছি খুকুর সঙ্গে ছড়া বলছেন আনন্দে। কত গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, কত লিখেছেন, অথচ সহজ সরল ভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, হাস্য-পরিহাস একটুও ব্যাহত হয়নি। সেই মহৎ অনন্যসাধারণ মন নিজেকে পৃথক ক'রে সরিয়ে

নিয়ে যায়নি। সকলের মধ্যে থেকেই যে সকলের ঊর্ধ্বে তিনি, সেই তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন।

অতএব স্থির হ'য়ে গেল ঘর বদল হবে। সন্ধ্যেবেলা ওলট পালট চল্ল। অনিলবাবু বল্লেন, "মৈত্রেয়ী দেবী, লক্ষণ ভালো নয় কিন্তু।"

"কী রকম ?"

"এই ঘর বদল যেন যাত্রা বদলের সূচনা করে। মনে হচ্ছে এইবার হয়তো যাবার সময় হ'য়ে এল আমাদের।"

"আচ্ছা আপনাকে এসব কথা তুলতে হবে না।"

"আমি তুলব না ভয় নেই, একটা warning দিলাম মাত্র।"

সেদিন দুপুরবেলা আমার একটু মংপু আসবার প্রয়োজন ছিল, ওঁকে বল্লুম, "চিত্রিতা রইল, যা দরকার হবে ওকে বলবেন।"

"কিছুই দরকার হবে না। নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুরে এসো। একটুক্ষণ বিচ্ছেদে বিশেষ ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবার সম্ভাবনা।"

"এ যে রীতিমত অপমান।"

"ঐ দেখ, এমন বদ অভ্যেস হ'য়ে গেছে, কখন যে সত্যি কথা ব'লে ফেলি ঠিক থাকে না।"

মংপু থেকে ফিরে যখন এলুম তখন চারটে বেজে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনি চিত্রিতাকে বলছেন, "ছিঃ ছিঃ, এত অবহেলা, বাড়িতে অতিথিকে বসিয়ে রেখে বেড়িয়ে বেড়ানো? যেমন তেমন ক'রে কয়েকটা আপেল পাঠালেই যত্ন হয়। খাবনা, এসব নিয়ে যাও।"

চিত্রিতা যথাসাধ্য গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, "উনি কিন্তু সত্যি রাগ করেছেন।"

"ভালই, মাঝে মাঝে রাগ দরকার।"

উনি তখন হাসতে লাগলেন। "যাক, তোমার অনেকটা উন্নতি হ'য়ে এসেছে। ঠাট্টা ক'রে আর সঙ্গে ফুট্‌নোট দিতে হয় না যে এটা ঠাট্টা। আগে হ'লে ঠিক এতক্ষণ কাঁদতে বসতে, সেই সেবার শান্তিনিকেতনে—"

"সে পুরানো ব্যাপার থাক এখন, তার চেয়ে একটা দরকারী কথা শুনুন। আপনার জানা কোনো ভালো পাত্র আছে?"

"দেখ হে সীমন্তিনী, আমার জানা একটিমাত্র পাত্র আছে। অতি সৎপাত্র বলেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু তোমাদের ধারণায় তার একটু বয়স বেশি হ'য়ে গেছে। কাজেই সে তো হবে না।"

"দেখ, গৃহিণী, তুমি যদি সুগৃহিণী হ'তে তাহ'লে এমন কাজ করতে না।"

"কি করলুম আমি?"

"গাড়িখানা তো নষ্ট করতে বসেছ। এই বর্ষায় পাহাড়ে' রাস্তায় দুবেলা ডাক্তারকে নিয়ে ওঠা-নামা।"

"কিছু ক্ষতি নেই তাতে। গাড়ি তো চলবার জন্মেই থাকে—"

"তা বটে, কিন্তু তারও তো সীমা আছে। সেখানে তোমার সংসার, ক্ষণে ক্ষণে দরকার হচ্ছে, আর গাড়ি ছুটছে। কাল যেই ত্রিফলার দরকার হ'ল অমনি গাড়ি ছুটল। আমি ভেবে দেখলুম এ উচিত হয় না, তা ছাড়া ডাক্তারেরও কত অসুবিধা হচ্ছে। কোথায় খায়—কোথায় থাকে,—যাওয়া আসা—"

"কিছুই অসুবিধে নেই, অত আপনাকে আর ভাবতে হবে না।"

"না তা ভাবতে হবে কেন? কিছুমাত্র ভাবতে হ'ত না, যদি তুমি একটু চিন্তাশক্তি ব্যয় করতে।"

"আচ্ছা সে হবে একটা ব্যবস্থা। এখন আপনি দিন আমাকে কি কর্তব্য আছে।"

"ঐ রেখেছি টেবিলে, তুমি যে দ্রুতগতিতে কপি চালাচ্ছ এখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে হবে আমায়। তবে তোমার একটা সুবিধে, দেখে দেখে লিখে গেলেই হ'ল, আমাকে যে ভেবে ভেবে লিখতে হয় কাজেই দোষ নেই।"

"আপনার আর একটা বই কপি করেছিলাম—তার manuscript রয়েছে আমার কাছে, আপনি দিয়েছিলেন—"

"ও, এটা একটা ইঙ্গিত হলো, যাকে বলে ইসারা। যাক্ বুঝে নিলাম কথাটা। কিন্তু কি বই সেটা— ?"

" 'বাঁশরী'।"

" 'বাঁশরী' কবে কপি করলে ?"

"কেন দার্জিলিংএ।"

"দিও তো একবার দেখব।"

'বাঁশরী' দেখে বল্লেন, "দেখ, এতে অনেক কিছু আছে যা পরে বাদ দিয়েছিলুম, কিন্তু সেগুলো অত অবহেলার যোগ্য ছিল না। এটা নিয়ে যাই, কপি ক'রে পাঠিয়ে দেব।"

"তা হয় না, দিতে পারব না। কপি করে দেব বরং।"

"এত এখন কপি করবে— ?"

"সে আপনাকে ভাবতে হবে না, কতক্ষণই বা লাগবে। কিন্তু আপনার হাতে দেওয়া মানে এত লোকের হাতে দেওয়া—সে হবে না।"

"আচ্ছা, করো তাহ'লে তোমার যা আছে কর্মভোগ।"

নীচে এসে সবাইকে বল্লুম, "কর্তা কিন্তু গাড়ির জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; আরো ব্যস্ত হয়েছেন ডাক্তারের অসুবিধে হচ্ছে ব'লে।"

ডাক্তার ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন,—"যাও যাও, বুঝিয়ে বলো আমার কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না।"

"আমি তো বলেছি যথেষ্ট, তোমার অসুবিধের কথা ভাবছেন, তোমারই উচিত বলা।"

ডাক্তার তো অথৈ জলে প'ড়ে গেলেন, "আমি কি বলব ওঁকে ? একি বিপদে পড়লুম!"

সুধাকান্তবাবু এলেন বিপদ-ভঞ্জন, "চলুন, আমি দোভাষীর কাজ করব।"

অনেক বোঝানোর পর গুরুদেব অনিচ্ছাসত্ত্বেই রাজী হলেন বাসা পরিবর্তনের সংকল্প ছাড়তে। "কিন্তু সে বাড়িতে গেলে

আমার কোনই অসুবিধা হ'তনা। তোমরা জাননা, ছোটবাড়ি আমি অনেক বেশি পছন্দ করি।"

"আজ যে সমস্ত দিন দর্শন নেই, ছিলে কোথায়? একটা চৌকিতে 'নাম্বা' হয়ে শুয়ে বালিশের উপর চুল মেলে দিয়ে 'প্রবাসী' পড়তে পড়তে 'লিদ্রা' দিচ্ছিলে, 'লিদ্রা'? আমি ঠিক করেছি এবার থেকে বনমালীর মত বলব 'নাম্বা'। এতদিন থেকে ওকে বলছি 'নাম্বা' নয়, 'লম্বা', কিন্তু যখন কিছুতেই শুনবে না তখন আমাকেই ওর ভাষাটাকে মেনে নিতে হবে।"

"মোটেই আমি লিদ্রা দিইনি, আমি কতবার এসে ফিরে গেলুম, আপনি কাজ করছেন দেখে।"

"আজ যে ভাষার খেয়াল নিয়ে মেতে উঠেছিলুম—অদ্ভুত সব ব্যাপার চলেছে ভাষার জগৎ জুড়ে, কি ক'রে যে ভাষাটা গড়ে উঠছে সে এক রহস্যময় কারখানা। আর এত খেয়ালী,—কেন যে কিছু বাদ যায়, কিছু এসে জোড়ে, তা বোঝা যায় না। ভাষার সব খেয়াল, কত অত্যুক্তিই যে বোঝাই হ'য়ে আছে! ধর যদি তুমি বল 'নড়া চড়া' বন্ধ, সে একটা বাড়াবাড়ি নয়? যার নড়া বন্ধ তার চড়া তো বন্ধ হবেই। আজ রাম শব্দটার ব্যবহার মনে করছিলুম। শ্রীরামচন্দ্রকে যত স্তবই করুক, ভাষার মধ্যে অলক্ষ্যে রামের প্রতি লোকের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাকে বিশুদ্ধ ভক্তি-পূর্ণ বলা যায়না। যেমন ধর, বোকারাম ভোলারাম হাঁদারাম গাধারাম—চলেইছে। লোকটা যে কিছু ভয়ঙ্কর রকম খারাপ তা নয়, কিন্তু একেবারে ভোম্বলরাম বা ভ্যাবাগঙ্গারাম!···আগেকার দিনে আর একটা ভাষা ছিল যাকে বলা যেত মেয়েলি ভাষা। অবশ্য তার মধ্যে যে অংশটা প্রধান, সে মধুর মনোভাব প্রকাশের জন্য নয়। আজকাল আর তোমরা মেয়েলি ভাষা বল না, না? তোমরা কি বলবে,—'হ্যাঁ গা এ কেমনধারা কাণ্ড গা?' 'মুখপুড়ী

মরতে কি জায়গা পেলে না'। কিংবা, 'দূর হ আদেখ্‌লে, অত সোহাগে আর কাজ নেই'।"

"Copy কর সীমন্তিনী, একটু দ্রুতগতিতে Copy কর।"

"এ কবিতাটা কখন লেখা হলো?"

"এই তো লিখলুম। ঐ যে বইটা দিয়েছে না, স্টেট্‌স্‌ম্যানের 'সুন্দর ভারত' ওর মধ্যে দেখছিলুম রাজপুতানার ছবি। দেখেই মনে হ'ল, হায় হায় এই কি সেই রাজপুতানা? মৃত্যুর বোঝা বহন ক'রে বেঁচে আছে। এর চেয়ে তার ধ্বংস ছিল ভালো। কোনো একরকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল, মরণই সম্মানের।

একি আত্মবিস্মরণ মোহ
বীর্যহীন ভিত্তি পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।

এ যে ব্যঙ্গ করা নিজের সমস্ত অতীত গৌরবকে। তাই ভাবি,

হে রাজপুতানা
কেন তুমি মানিলেনা যথাকালে প্রলয়ের মানা।
লভিলেনা বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন,
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।"

এই কবিতাটি পরে 'নবজাতকে' প্রকাশিত হয়েছে।

"ওগো গৃহিণী, গৃহস্বামিনী, গৃহকর্ত্রী, তুমি কি আমায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণী মনে কর?"

"না তো, কেন?"

"তবে কেন তোমার ধারণা তোমার নীচের বাড়িতে আমায় ধরবে না? এই যে একটা বৃহদাকার পেটমোটা ঘর পড়ে রয়েছে, এর কি দরকার? এর চার ভাগের এক ভাগ হ'লেও আমায় ধরে। তোমাদের ধারণা মস্ত ঘর না হ'লে সে যে মস্তলোক সেটা প্রমাণ হয় না। আমার কিন্তু ছোট ঘর ভাল লাগে। ছোট ঘরে সব

কাছাকাছি, সেখানে একটা ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যায়। তা ছাড়া সে তোমার বাড়ি, সেখানে নিজের হাতে বাগান করেছ, তোমার আপন গৃহস্থালীর মধ্যে আমায় নিয়ে যাবে, সেই তো ভালো লাগবে। আর অনিল তো বলছিল সে-বাড়ি দেখতে খুবই ভালো।"

"কিন্তু যদি আপনার অসুবিধে হয়?"

"কিছুমাত্র অসুবিধে নেই, না হয় তোমরা একটু কাছাকাছিই থাকবে, সে তো আরো ভালোই হবে। মাঝে মাঝে তোমাদের বিলাপধ্বনি শোনা যাবে।"

"সে কি, আমরা বিলাপ করব কি জন্যে?"

"ঐ হ'ল, বিলাপ প্রলাপ বা মধুরালাপ নির্জনে যা করবে সেটা না হয়···না না কোনো ভয় নেই, জানই তো আমার কানের অবস্থা।"

"তাহ'লে যাবার বন্দোবস্ত করে ফেলি—?"

"নিশ্চয়ই, শুভস্য শীঘ্রং।"

"কিন্তু যদি আপনার অসুবিধে হয় আমি জানিনে।"

"তোমাকে জানবার জন্য পীড়াপীড়ি তো করা হচ্ছে না।"

জিনিসপত্র পাঠানো শুরু হ'য়ে গেল।

"যাওয়া আসার এইটে বড়ই হাঙ্গামা, বাঁধা, ছাঁদা, পরিশ্রমের অন্ত নেই। আর এত অনাবশ্যক জিনিসপত্র যোগাড় কর তোমরা, জমা-ই করছ, জমা-ই করছ,—জীবনের অপ্রয়োজনীয় আয়োজন। মানুষের কতটুকু দরকার? একমাস কি দেড়মাসের জন্যে আসা, বৌমা যা জিনিস এনেছেন অনায়াসে এক বছর চলবে তাতে। জামা কাপড় যেগুলো কোনো কালে ব্যবহার করিনে, কোথাও যাবার সময় সব চল্ল। যদি লাগে, 'যদি'—সেই একটা মস্ত বড় 'যদি' আছে কিনা। আবার আমাদের বনমালী বলেন—কোনটি রেখে কোনটি নিই। যেটি রেখে যাব বাবামশায় সেইটিই চাইবেন। ওদের ধারণা এ সম্বন্ধে আমার uncanny রকমের জ্ঞান হয়, যেটি আনা হয়নি সেইটিই চেয়ে বসি।"

৬ই জুন আমরা নীচের বাড়িতে নামলুম। সে দিন সারাদিন খুব লিখলেন। একে একে সবাই নেমে গেলেন। জিনিসপত্র আগেই চলে গিয়েছিল—গাড়ি ওপরে এলো আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। ওঁর ঘরে এসে দেখি তৈরি হয়ে বসে আছেন।

"আমি তো অনেকক্ষণ তৈরি, এখন টুপিটা দাও, কালো টুপিটা।"

অনিলবাবু টেবিলের খাতাপত্র এটাচি-কেসে গুছিয়ে তুলতে লাগলেন—আর অদরকারী কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। তার মধ্যে হঠাৎ দেখি ওঁর হাতের লেখা।

"একি করছেন ?—"

"কি হবে টুকরো ?"

"বাঃ ওঁর হাতের লেখা যে।"

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কলহের বিষয়টা কি—"

"আপনার হাতের লেখা কাগজের টুকরো ফেলে দিচ্ছেন। আমি রেখে দিতুম।"

"ওরা অনেক পায় কিনা,—তাই তোমাদের মত কৃপণের সঞ্চয় করতে হয় না। supply বেশি হ'লে দাম কমবে, বাজারের নিয়মই এই। তুমি তো ইকনমিক্স পড়নি, পড়েছ মুগ্ধবোধ, তাই একটু মুগ্ধ-ই আছ।"

ঘন বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে সরু পাহাড়ে' পথ দিয়ে গাড়ি নামতে লাগল। তখন বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে,—ম্লান রোদ্দুর অসংখ্য আলোছায়ার ছবি আঁকছে গাছের তলায় তলায়।—সোজা সোজা দীর্ঘ গাছের শ্রেণী উর্ধ্বমুখে উঠেছে আলোর প্রত্যাশী। গাড়ি যতবার বাঁকে হেলে পড়ছে উনিও একটু হেসে বলছেন, "I beg your pardon madam !"

..."এই অরণ্যের একটা ছবি আঁকতেই হবে, এর একটা বিশেষত্ব আছে।"

অনিলবাবু বল্লেন, "গুরুদেব, a forest of parallelograms ?"

ঘন ছায়াচ্ছন্ন পথ দিয়ে মেঘ কুয়াশার রাজ্য ছাড়িয়ে মংপুতে যখন নামলুম তখন রোদ চারিদিকের ধোয়া সবুজের উপর ঝিলমিল করছে, শেষ বেলাকার রোদের সুন্দর শান্ত হাসি। ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "অনেকদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল, আলো নৈলে চলে না, আমার আলো চাই। Light, more light !"...

"এতো চমৎকার বাড়ি! তুমি কেন আপত্তি করেছিলে?—কি সুন্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে সবুজ বন্যা নেমে এসেছে। এই সামনের মাঠটিও তোমার ভালো, আমি মাটির কাছাকাছিই থাকতে চাই। চলৎশক্তি কমে এসেছে; মাটির স্পর্শ চোখ দিয়েই তাই মিটিয়ে নিতে হয়। চল তা' হলে, তোমার বাড়ির জিয়োগ্রাফীটা জেনে আসি।...এই কাঁচের ঘরটি বুঝি আমার লেখবার? এতো খুবই ভালো, একেবারে উত্তম বলা যেতে পারে। এ চৌকিতে সকাল বেলা বসব আর রোদ্দুর এসে পড়বে কাঁচের ভেতর দিয়ে।—তোমার ঐ বৃহদাকার বনস্পতির পাতার ফাঁক দিয়ে শতধারায় ঝরে পড়বে সকাল বেলার আলো, ভোরের সেই রৌদ্র-স্নানটি আমার কত সুন্দর হবে। কেন তুমি এখানে আসতে চাইছিলে না?...বাঃ, এ চানের ঘরও তোমার ওপরের বাড়ির চাইতে ঢের ভালো। এই পাশের ঘরেই বুঝি তোমরা থাকবে—সে তো আরো সুবিধে, রাত্রে হঠাৎ মূর্চ্ছা যাবার দরকার হ'লে ফস্ ক'রে তোমায় খবর দিয়ে মূর্চ্ছা যাব। আর আমার সাঙ্গোপাঙ্গরা থাকবে কোথায়? ওদিকটায় বুঝি? ভালই করেছ ওদের একটু দূরে দিয়েছ—ওরা একটু সিগারেট খায়, হো হা করে, বেশি কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে না।"

"আপনার খাবার কি এই বারান্দায় নিয়ে আসব?"

"কেন, এখানে তো সবই কাছাকাছি, যথাস্থানেই যাব।...... কি বনমালী, জায়গাটা লাগছে কেমন?"

"আজ্ঞে এটায় ও-জায়গার থেকে অনেক সুবিধে রয়েছে আর অত জোঁকও নেই, জোঁকের জ্বালায় সেখানে চলবার জো ছিল না।"

"সেইজন্তেই এলুম এখানে, তোমার যেখানে পছন্দ, সেইখানেই আমার পছন্দ।" বনমালী হাসছিল।

"ওর সঙ্গে একটু ঠাট্টা করি, ও সেটা পছন্দই করে, আবার ঠাট্টা না করতে পেলে আমার চলে না সে চাকর নিয়ে। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

খেতে বসে বল্লেন, "বনমালী, খাওয়া দাওয়া চলছে কেমন?"

"আজ্ঞে তা ভালই চলেছে, দিদিমণি আবার আমায় দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

"দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন, তার চেয়ে দুধ মাখালে পারতেন, খেয়ে তো রং-এর বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না।"

একদিন সন্ধ্যেবেলা প্রবল ঝড় উঠেছে। বাইরে বন্য বনস্পতিদের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। কাঁচের ঘরে জানালা বন্ধ করতে ঢুকে দেখি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বাইরের দিকে চেয়ে। বল্লেন, "কলমটা দেবে?"

পরের দিন সকালে যথারীতি ঘণ্টা বাজল—ছুটলুম সবাই। প'ড়ে শোনালেন নতুন কবিতা "অধীরা"—

"চির অধীরার বিরহ আবেগ
দূর দিগন্ত পথে
ঝঞ্ঝার ধ্বজা উড়ায়ে ছুটিল
মত্ত মেঘের রথে।

দ্বার ভাঙিবার অভিযান তার
বার বার কর হানে,
বার বার হাঁকে চাই আমি চাই
ছোটে অলক্ষ্য পানে।

এ কিন্তু তোমার বেথুন ইস্কুলের বেণী-দোলানো অধীরা নয়—তা ব'লে দিতে হবে না তো বোকাদের জন্য? কাল ঝড়ের প্রলয় মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক চঞ্চলা অধীরা ছুটে চলেছে, সে বন্ধন মানে না, সে দুর্বার—

মানে না শাস্ত্র জানে না শঙ্কা
নাই দুর্বল মোহ
প্রভুশাপ পরে হানে অভিশাপ
দুর্বার বিদ্রোহ!

সে বিদ্রোহিণী—

তাপসের তপ করেনা মান্য
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে
মঞ্জীরে বাজে যে ছন্দ তার লাস্যে
সে নহে মন্দাক্রান্তা
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমল কান্তা।

সেই সমস্ত সংকোচ-আবরণহীন একটা সত্যমূর্তি প্রকৃতির আছে—সে চঞ্চলা অধীরা, সৃষ্টির বেদনা বহন ক'রে অনাদি কাল থেকে ছুটে আসছে,—সে আসছে,

নির্লাজ ক্ষুধায় অগ্নি বরষে—
নিঃসংকোচ আঁখি
ঝড়ের বাতাসে অবগুণ্ঠন
উড্ডীন থাকি থাকি।"

সেদিন হঠাৎ সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ মশায় এসে উপস্থিত। বিদেশে যাবেন, তাই গুরুদেবকে প্রণাম করতে এসেছেন। আমাকে ডেকে বল্লেন, "ইনি একটু পরেই চলে যাবেন, এঁর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দাও।" মিনিট পাঁচেক পরে বনমালী এল, "দিদিমণি, বাবামশায় বলছেন, যে বাবু এসেছেন তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।" তার অল্প একটু পরেই চিত্রিতা এল, সেই সংবাদ নিয়ে।

"আরে থাম্, লুচি ভাজা হবে তবে তো, এখনও ঢের সময় আছে ট্রেনের।"

"তা কি করব, ওদিক দিয়ে তো চলাফেরা বন্ধ হ'ল, উনি ভীষণ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। যাকে দেখছেন, বলছেন, এঁর চায়ের ব্যবস্থা হ'ল? ওঁর ভয় হয়েছে অতিথির যথোপযুক্ত যত্ন হবে কি না।"

কারও আসবার কথা হ'লে সে কোথায় থাকবে, কি ব্যবস্থা হবে তা সর্বদা তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল। অতিথির সব রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি ছিল সর্বদা। অন্য সকলের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভুলে থাকতে পারতেন না।

সে সময় কয়েকদিন থেকে এখানে—বাবুর আসবার কথা হচ্ছিল। তাই নিয়ে ক'দিন তুমুল আলোচনা চলেছে। ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোকের পাঠানো কতকগুলো গানের রেকর্ড এসেছে। বসবার ঘরে সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলে বসেছি, উনি বল্লেন, "বাজাও, শোনা যাক রেকর্ড।"···

"কি রকম লাগল তোমাদের?"

"হয়তো খুব ভালো, musicএর আমি কি বুঝি? কিন্তু আমার ভালো লাগেনা। গানের অদ্ভুত কথাগুলো মনকে বাধা দিতে থাকে। আর অত ওস্তাদী তো আমার সহ্য করাই শক্ত হয়। মন যখন সুরের মধ্যে ডুবতে চায় তখন এই সব আধুনিক কাব্যগীতির অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থহীন শব্দসমষ্টি যেন তাল ভঙ্গ করে। আপনার গানের এক লাইন এখান থেকে নিয়ে, আর এক লাইন অন্য খানা থেকে জুড়েই তো এসব গান—কি দরকার? তিনখণ্ড 'গীতবিতান' হাতের কাছেই তো রয়েছে, সে কি যথেষ্ট নয়?"

"আমারও কতকটা তাই মত, আমারও ভালো লাগে না। গানেরও একটা কথা থাকা চাই বই কি? যত simpleই হোক, তবুও এমন একটা message যা সুরে লীলাময় হ'য়ে প্রাণের মর্মে এসে লাগবে।—মরি লো মরি আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে"—

সেদিন গলা ভালই ছিল সম্পূর্ণটা গাইলেন—

ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না

ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী বলো কী করি।

শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনা তীরে

সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশী ধীর সমীরে—

এর পরেও এ গানটা ওঁর মুখে আরো বহুবার শুনেছি—কিন্তু সে দিনের সুর সবচেয়ে স্পষ্ট ক'রে মনে পড়ে। কালো একটা জোব্বা প'রে বসবার ঘরের ছোটো চৌকিতে বসেছিলেন—গান শুনতে শুনতে ওঁর দিকে চেয়ে আমাদের আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল। পরমাশ্চর্য এ ঘটনা! উনি যে সেই রবীন্দ্রনাথ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, কত সুদূরের, শিশুকাল থেকে উনি আমাদের স্বপ্নের মানুষ। তিনি যে একদিন আমাদের এই আমাদের ঐ বিশ্রী-রকম পরিচিত চৌকিতে বসে এই প্রত্যহের দেখা কার্পেটের উপর পা রাখবেন, তা কে মনে করতে পেরেছিল? কত দিন কত গান শুনে, কত নিস্তব্ধ রাত্রে কবিতা পড়তে পড়তে এ কথা মনে করেছি—বলে আসি তোমার বাঁশী আমার প্রাণে বেজেছে গো আমার প্রাণে বেজেছে।

চিত্রিতা বল্লে, "আর একটা গান করুন।"

"ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ

আরো কি তোমার চাই—

ওগো ভিখারী আমার ভিখারী চলেছো

কী কাতর গান গাই—

...মম প্রাণ মন ধন যৌবন নব

করপুট তলে পড়ে আছে তব,

ভিখারী আমার ভিখারী

হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও

ফিরে আমি দিব তাই।"

এর পরে আরও একটা গান করেছিলেন। বল্লেন, "এ গানের সুরটা খুব নতুন। এটা বিশেষ কেউ লক্ষ্য করেনি। এই সব পুরোনো গানই আমার মনে আছে—সহজ সুর। এ সব গানের যে রস সে

এত সহজ ব'লেই। আজকাল তো আজ লিখলে কাল ভুলে যাই সুর। তাই খুকুদের বলি তখুনি শিখে নিতে, পরের দিন যদি আবার আমার কাছে আসে তখন আমার সুর একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে।"

সে দিন অনেক রাত অবধি আমরা ব'সে রইলুম, গুন গুন করে গাইতে লাগলেন—

মরি লো মরি আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে—

"এখন কি আর গলা আছে! একদিন ছিল যখন সভা হ'লেই সবাই ব'লত, রবিবাবুর গান রবিবাবুর গান—দত্তাপহারক ভগবান দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিলেন। তোমরা তখন ছিলে কোথায়? এখন এই ভাঙা গলার গান শুনে কি হবে?"

একদিন সুন্দর রোদ ঝলমল ক'রে উঠল। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ কুয়াশা কেটে গিয়ে নির্মল নীল আকাশ। বল্লেন, "এ যে ঠিক বসন্তকাল, তেমনি ঝুর ঝুর ক'রে বাতাস দিচ্ছে, অসময়ে এ বসন্ত ভারী সুন্দর।"

বিকেল বেলা যখন সংবাদ নিতে গেলুম, একটা লেখা আমার হাতে দিলেন, "এই লও, যতক্ষণ তুমি ঘুম লাগাচ্ছিলে, আমি ততক্ষণ এটা লিখে ফেলেছি। র'য়ে গেল মংপুর একটা কবিতা—এখন তুভ্যং অহং সম্প্রদদে—"

ঘণ্টা বাজল, সবাই এলো, পড়া হ'ল কবিতা—

"কুজ্‌ঝটি জাল যেই সরে গেল মংপুর
নীল শৈলের গায়ে দেখা দিল রংপুর।

এ কিন্তু তোমাদের E. B. R-এর রংপুর নয়। বোকাদের জন্যে তা বলে দিতে হবে না তো?

বহুকেলে যাদুকর খেলা বহু দিন তার
আর কোনো দায় নেই লেশ নেই চিন্তার
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।

কত রাজা এলো গেল ষোলো এরি মধ্যে
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে
কত মাথা কাটাকাটি সভ্যে অসভ্যে
কত মাথা ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে'।

সামনেই একটা প্রকাণ্ড সেগো-পামের গাছ ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে মালার মত। সে গাছটা ওঁর ভারি ভাল লাগত।

ওই গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত
সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।

প'ড়ে চল্লেন সামনের পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে—

ওই ঢালু গিরিমালা রুক্ষ ও বন্ধ্যা
দিন গেলে ওরি পরে জপ ক'রে সন্ধ্যা
নিচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার
নিঠুরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।
হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে
টানাপাখা চলা সেই সেকালের বিশ্বে
রবি ঠাকুরের দেখা সেই দিন মাত্তর
আজ তো বয়স তার কেবল আটাত্তর
সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শূন্য
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য!
ছোট আয়ু মানুষের তবু একি কাণ্ড
এটুকু সীমায় গড়া মনো-ব্রহ্মাণ্ড—
কত সুখে দুখে গাঁথা ইষ্টে অনিষ্টে
সুন্দরে, কুৎসিতে তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ উৎসবে কত সভা সজ্জায়
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়,
ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলব্ধি
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তারা স্তব্ধি।

কিন্তু একমুহূর্তে এ সব ভেঙে দিতে একটুও তো বাজবে না কোথাও—এত দিনের গড়া ভাঙবে এক নিমেষে।

মংপু পাহাড়ে

কুজ্ঝটিজাল যেই সরে গেল মংপুর
নীল শৈলের গায়ে দেখা দিল রঙ্গপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এলো গেলো, মোলো এরি মাঝে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল কাব্য।
কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ঐ ঢালু গিরিমালা রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
[illegible] বাষ্প ও ধূঁয়ের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে,
টানা-পাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে

অবশেষে এক দিন বন্ধন খণ্ডি
অজানা অদৃষ্টের অদৃষ্ট গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি
এত মধু অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল ভাঙা হয় তার কার্য।
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছু মাত্র
আমারি কি লোকসান হই যদি শূন্য
শেষ ক্ষয় হ'লে তারে কে করিবে ক্ষুণ্ন।
এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সত্য
তখনো তো হেথা এই অখণ্ড অত্য
জাগ্রত রবে চির দিবসের জন্যে
এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে,
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি
বার বার ঢাকা দেওয়া বার বার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি!"

পরে এ কবিতা ঈষৎ পরিবর্তিত হ'য়ে 'নবজাতকে' প্রকাশিত হয়েছে।

আজও এই গিরিতটে মেঘ রৌদ্রের খেলা চলেছে, নীলিম অরণ্যের নীলিমা ম্লান হয়নি তা জানি। নির্মম প্রকৃতি হাসি মুখে চেয়ে আছে, জানে না তার দর্শক নেই—তবু আজও মনে করতে চাই শেষ ক্ষয় হয়নি, ভরা পাত্র শূন্য নয়—

এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।

"রামানন্দবাবু চিঠি লিখেছেন, এই লও।" দেখলুম তিনি লিখেছেন,—'কাগজে প্রকাশিত হয়েছে আপনি সিনকোনা ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। মৈত্রেয়ী বোধকরি মনে মনে হেসে থাকবে, সে জানে সে তিক্ত নয়।'

"জানো তুমি তিক্ত নয়? একেবারে নিশ্চিত জানো?"

"সেটা তো আমার জানবার কথা নয়।"

"এই দেখ মুশকিলে ফেল্‌লে, সত্য বল্‌লে ভদ্রতা বজায় থাকেনা, আবার ভদ্রতা করলে যদিই মিথ্যাচরণ হ'য়ে পড়ে।"

"কি, আমাকে তিক্ত বলছেন?"

"অমন স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল কেন? Ask no questions, and you will be told no lies."

একদিন হঠাৎ খবর এলো কালিম্‌পং ফিরতে হবে। সেখানে বিশ্বভারতী সম্পর্কীয় কাজে রাজপুরুষেরা আসবেন। ৯ই জুন যাবার তারিখ, একটু অপ্রত্যাশিত রকম তাড়াতাড়ি স্থির হ'য়ে গেল। আমি একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। উনি বল্লেন, "অত ভাবছ কেন? কাজ সেরে আবার না হয় আসব।"

"তা কি আর হ'য়ে উঠবে?"

"অন্তত এখন মনে সে আশা রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া যেতে তো একদিন হ'তই। চোখে দেখাই কি সব চেয়ে বড় ক'রে দেখা? নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,—তাও ভাবতে পার তো? ধৈর্য ধর বৎসে, তুমি তো বঞ্চিত হও নি।"

যাহা মরণীয় যাক্‌ মরে

জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে

দ্বিতীয় পর্ব

পুরী থেকে সংবাদ এলো ১৪ই মে মংপু পৌঁছবেন—।

স্টেশনে জনারণ্য উদগ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে আছে একবার একটুক্ষণের জন্য তাঁকে দেখবে। যাঁরা তাঁকে দেখেন নি তাঁরাও তাঁকে দেখেছেন, বিশ্ববিজয়ী প্রতিভা তাঁর তাঁকে তো গোপনে রাখে নি। কিন্তু কাব্য শরীরে যে রূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছেন সেই রকমই এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় স্পর্শ ছিল প্রত্যক্ষ দেহধারী রবীন্দ্রনাথের দর্শনে। কত হৃদয়কে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, কত মূককে তিনি ভাষা দিয়েছেন, কত অকথিত কথা তিনি বলেছেন সে কারোরই অজানা নয়। কিন্তু কেবল মাত্র তাঁর শরীরী উপস্থিতি, তাঁর ক্ষণিকের দর্শনও মানুষের মনে যে আনন্দ উদ্বেলিত করত তা বহুলোকের জানবার সৌভাগ্য হ'ল না।

সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

তিনি ফুল ফোটাতে পারতেন মানুষের হৃদয়ে। মূক জড় মৃত্তিকার মধ্যে যেমন ফুল ফুটে ওঠে—

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে।

একথা বার বার অনুভব করেছি আমরা।

সাড়ে ন'টার সময় নর্থ-বেঙ্গল একস্‌প্রেস ঢুকল শিলিগুড়ি প্ল্যাটফর্মে।

উৎসুক জনতা পথ ক'রে দিল। কোনো মতে চেয়ার নিয়ে গাড়ির সামনে উপস্থিত হ'লাম। একটা 'কুপে'র মধ্যে চকোলেট রংয়ের জোব্বা প'রে ব'সে ছিলেন।

"আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার সাজ গোজ কিছু হয়নি, কোথায় লিপ্‌স্টিক, কোথায় রুস্‌, একেবারে ফস্‌ ক'রে ঢুকে পড়লে!"

"সুধাকান্ত বাবু আসেন নি?"

"আহা, সুধাকান্ত বাবু না এলে তো কোনো মজাই নেই জীবনে। তাহ'লে তো ফিরে গিয়ে এখনই তাকে পাঠিয়ে দিতে হ'ত। বাবা, কী টেলিগ্রাফ করলে! Sudhakanta Babu's letter read clear। আমি বলি 'বলডুইন'কে, যে এত মস্ত লিপিকুশল পত্রলেখক হ'য়ে উঠলি কবে থেকে, একেবারে যে read clear! আমরাও তো মাঝে মাঝে চিঠি লিখে থাকি কিন্তু সে তো এত পরিষ্কার হয় না। অন্তত আজ পর্যন্ত তো টেলিগ্রামে জবাব পাইনি—Rabindranath's letter read clear!"

"আহা, আপনি যদি টেলিগ্রাম না পড়তে পারেন তো আমি কি ক'রব?—আমি লিখেছিলুম Sudhakanta Babu's letter, তারপরে stop, তারপরে Road clear। এখানকার পথ বন্ধ আছে কি খোলা আছে তা জানাতে হবে না!" (পাহাড়ে' বর্ষাকালে মাঝে মাঝে মাটি ধ্বসে পথ বন্ধ হয়ে যায়।)

"সে আমি জানিনে, স্পষ্ট দেখলুম রেড্‌ ক্লিয়ার। বলডুইন তো বিপদে পড়ে গেল। টাক ঝক্‌ ঝক্‌ ক'রতে লাগল। 'রেড ক্লিয়ার'—এ তো সোজা কথা নয়।"

"আপনি না এসে পৌঁছন পর্যন্ত বিশ্বাস হয় না যে আসবেন—কখন মত বদলায় সেই ভয় সর্বদা থাকে।"

"তা তো হ'তেই পারে! আমাদের বংশানুক্রমিক সংস্কার। Babu changes his mind—সে জানতো!"

শুনেছি দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের ইউরোপ প্রবাসের সময় ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রায়ই মত পরিবর্তন ঘটত। তাঁর বিষয়ে তাঁর এক সহচর কোনো চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমাদের শীঘ্রই অন্যত্র যাবার কথা আছে ; কিন্তু স্থির বলা যায় না, কারণ Babu changes his mind so often. সে কথা নিয়ে প্রায়ই মজা হত। কারণ মত পরিবর্তন করতে, বিশেষত ভ্রমণের প্ল্যান পরিবর্তন করতে—ইনিও সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, বলতেন "জানোই তো ওটা আমাদের বংশানুক্রমিক।"

"তুমি কল্‌কাতায় ফোন করেছিলে নাকি ? এক একবার যে ফিরে দৌড় দেবার ইচ্ছে হয়নি তা নয়। তারপর ভাবলাম এ কন্যাটিকে আর দুঃখ দেবো না।"

"সেইজন্যেই এবার আপনাকে চিঠিও লিখিনি, আসবার কথাও লিখিনি। এখানে সবাই বলেছিলেন, আসল ব্যক্তিকে কিছুই না লিখে অন্য সকলকে লেখার মানে কি। আমি বললুম তার অর্থ অতি গূঢ়। এবার যাবও না আনতে, কিছু লিখবও না। কোনো রকম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করব না। আমার দাবী তাহ'লেই মিটবে, যদি ধৈর্য ধরে নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকি।"

"ঠিকই ধরেছ, ঠিকই ধরেছ, তুমি দেখছি মস্ত সাইকোলজিষ্ট হ'য়ে উঠলে। যে আড়ালে থাকে সেই বেশি সামনে আসে, যে নীরবে থাকে সেই বলে বেশি। যদি যেতে কলকাতায়, হয়তো বুঝিয়ে দিতুম এখন আর যাওয়ার হাঙ্গামা না করাই ভালো, কিন্তু হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পাঠান—unavoidably detained, can't come, সে চলেই না—সে বড়ো কঠোর হ'য়ে পড়ে।"

"জানি তা, সেই জন্যেই তো এবারে যাইনি আনতে। সেবার পূজোর সময় যা কাণ্ড করলেন, কলকাতা পর্যন্ত এসে—"

"ও সে বারে! আঃ, তোমার স্মৃতিশক্তি এত প্রখরা কেন ? ভুলে যাও ভুলে যাও। এবারে তো একেবারে নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হয়েছি—। তোমার দিন গণনা শেষ হয়েছে দেহলী-দত্ত পুষ্পেঃ।"

যখন মংপু পৌঁছলাম দুপুর বেজে গেছে।

"ওরে আলু, আমার সেই পুরীর টাকার থলিটা সাবধানে রাখিস, এখানে আবার বলতে নেই—সকলের স্বভাব তেমন সুবিধের নয়। আলুর ন্যামের উৎপত্তি জানো তো? ওর একটা মজবুত রকম সংস্কৃত নাম ছিলো, কিন্তু সে এখন আর কেউ জানে না, যেদিন শুনলুম ও পটোলের ভাই, সেইদিন থেকে ও আলু, আজকাল আবার দিশী-আলুতে কুলোচ্ছে না, তাই বলি potato! আমার একদিকে বলডুইন একদিকে পটেটো,—জোরালো সব নাম।"

"পুরীর টাকার থলিটা কি?"

"ওই দেখ, ঠিক দৃষ্টি পড়েছে। যার যা স্বভাব। পুরীতে আমায় পার্স উপহার দিয়েছিলো। জানো, ওর মধ্যে আছে উনিশ টাকা আট আনা! আজকাল আর সেদিন নেই—হাতে আছে তাজা উনিশ টাকা আট আনা, তা যে জায়গায় এসেছি এখন সামলে রাখতে পারলে হয়—। একবার তো এক জায়গায় জুতোর এক পাটি গেল হারিয়ে। আরে সরাতে হয় তো দু পাটিই সরাও, তা নয়। স্ত্রীবুদ্ধি বলে একে!"...

"তোমার এই বাঁশের পুষ্পাধারটি ভারী সুন্দর। এই রকম জিনিসেই ফুল ভাল মানায়—শৌখীন দামী পাত্রে ফুলকেও যেন সাজাতে চায়—একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি সেটা। আমি তাই মাটির পাত্রে ফুল রাখতে চাই, এ তোমার আরো ভালো। কি এই নীল ফুলের নাম? ফুলের নীল রংটাই আমার ভালো লাগে বেশি—ভালো দেখতে পাই, কে এ বিদেশিনী?"

"নাম শুনলে অশ্রদ্ধা হ'য়ে যাবে আপনার। এর নাম জ্যাকারাণ্ডা।"

"ও কি ও, বল কী, এমন সুকুমার রূপে এমন দম্ভবিমর্দিনী নাম! তোমরা হ'লে শিক্ষিতা মালিনী, তোমাদের এসব নাম মনে থাকে।

আমি একেবারে মনে করতে পারি না। একটা জানি—'কারনেসান'। তোমার কন্যা যে এই ফুলের দেশে প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ হচ্ছে এ খুব স্বাস্থ্যকর। শহরে মানুষের চাপে ইস্কুলের অত্যাচারে সে এক প্রাণ-বের-করা আবহাওয়া। আমাদের ওখানেও খোলা মাঠের মধ্যে খোয়াই-এর ওপর ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়, বৃষ্টি নামলেই দল বেঁধে ভিজতে বেরিয়ে পড়ে। কী আনন্দ তাদের—খুশি হবার সুযোগ পায় তারা। সেদিন তোমার কন্যে একটা পোকা ধরে এনে অনেক প্রাণীতত্ত্ব বোঝালেন। কি বললে কিছুই শুনতে পাইনি যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না—উৎসাহ কিছুই কমল না। এরকম উৎসাহ বাড়তে থাকলে এ রাজ্যের পোকাদের কিন্তু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়তে হবে।"

সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় একটা চৌকিতে বসতেন, সামনের পাহাড়ের গায়ে একটি একটি ক'রে আলো জ্বলে উঠত। এইটি ওঁর ভারী ভালো লাগত দেখতে। অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে, একাকার হ'য়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট দীপবর্তিকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্তা বহন ক'রে আনছে। বলতেন, "আশ্চর্য লাগে ভাবতে ওখানেও মানুষের জীবন যাত্রা চলেছে! এই রকম ছোট ছোট তাদের ঘর; কী রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবন যাত্রা, কিছুই জানিনে, শুধু গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু এতটুকু আলো, প্রাণের আলো।"...

"ওকি ও, অন্ধকারের মাঠের মধ্যে আমাদের মহামান্য পোটেটো আর ডাক্তার কী করছেন? আলু যখন আছে তখন মনে হচ্ছে আজ একটা কাণ্ড ঘটবেই।

"সামনের পাহাড়ে চিত্রিতারা আছে, তারা আলো দিয়ে এখুনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবে। আমাদের নিজেদের কোড্ আছে। তাই ওঁরা আলো নিয়ে তৈরী হচ্ছেন।"

"ও বাবা, এ তো ব্যাপার কম নয়! সুচিত্রা দেবী বিরহিণী ব'সে আছেন, আর এখান থেকে তাঁর ভগ্নীপতি আলোর দূত পাঠাবেন! ও

যখন মংপু পৌঁছলাম দুপুর বেজে গেছে।

"ওরে আলু, আমার সেই পুরীর টাকার থলিটা সাবধানে রাখিস, এখানে আবার বলতে নেই—সকলের স্বভাব তেমন সুবিধের নয়। আলুর ন্যামের উৎপত্তি জানো তো? ওর একটা মজবুত রকম সংস্কৃত নাম ছিলো, কিন্তু সে এখন আর কেউ জানে না, যেদিন শুনলুম ও পটোলের ভাই, সেইদিন থেকে ও আলু, আজকাল আবার দিশী-আলুতে কুলোচ্ছে না, তাই বলি potato! আমার একদিকে ,বলডুইন একদিকে পটেটো, —জোরালো সব নাম।"

"পুরীর টাকার থলিটা কি?"

"ওই দেখ, ঠিক দৃষ্টি পড়েছে। যার যা স্বভাব। পুরীতে আমায় পার্স উপহার দিয়েছিলো। জানো, ওর মধ্যে আছে উনিশ টাকা আট আনা! আজকাল আর সেদিন নেই—হাতে আছে তাজা উনিশ টাকা আট আনা, তা যে জায়গায় এসেছি এখন সামলে রাখতে পারলে হয়—। একবার তো এক জায়গায় জুতোর এক পাটি গেল হারিয়ে। আবে সবাতে হয় তো দু পাটিই সরাও, তা নয়। স্ত্রীবুদ্ধি বলে একে!"...

"তোমার এই বাঁশের পুষ্পাধারটি ভারী সুন্দর। এই'রকম জিনিসেই ফুল ভাল মানায়—শৌখীন দামী পাত্রে ফুলকেও যেন সাজাতে চায়—একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি সেটা। আমি তাই মাটির পাত্রে ফুল রাখতে চাই, এ তোমার আরো ভালো। কি এই নীল ফুলের নাম? ফুলের নীল রংটাই আমার ভালো লাগে বেশি—ভালো দেখতে পাই, কে এ বিদেশিনী?"

"নাম শুনলে অশ্রদ্ধা হ'য়ে যাবে আপনার। এর নাম জ্যাকারাণ্ডা।"

"ও কি ও, বল কী, এমন সুকুমার রূপে এমন দন্তবিমর্দিনী নাম! তোমরা হ'লে শিক্ষিতা মালিনী, তোমাদের এসব নাম মনে থাকে।

আমি একেবারে মনে করতে পারি না। একটা জানি—'কারনেসান'। তোমার কন্যা যে এই ফুলের দেশে প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ হচ্ছে এ খুব স্বাস্থ্যকর। শহরে মানুষের চাপে ইস্কুলের অত্যাচারে সে এক প্রাণ-বের-করা আবহাওয়া। আমাদের ওখানেও খোলা মাঠের মধ্যে খোয়াই-এর ওপর ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়, বৃষ্টি নামলেই দল বেঁধে ভিজতে বেরিয়ে পড়ে। কী আনন্দ তাদের—খুশি হবার সুযোগ পায় তারা। সেদিন তোমার কন্যে একটা পোকা ধরে এনে অনেক প্রাণীতত্ত্ব বোঝালেন। কি বললে কিছুই শুনতে পাইনি যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না—উৎসাহ কিছুই কমল না। এরকম উৎসাহ বাড়তে থাকলে এ রাজ্যের পোকাদের কিন্তু নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়তে হবে।"

সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় একটা চৌকিতে বসতেন, সামনের পাহাড়ের গায়ে একটি একটি ক'রে আলো জ্বলে উঠত। এইটি ওঁর ভারী ভালো লাগত দেখতে। অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে, একাকার হ'য়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট দীপবর্তিকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্তা বহন ক'রে আনছে। বলতেন, "আশ্চর্য লাগে ভাবতে ওখানেও মানুষের জীবন যাত্রা চলেছে! এই রকম ছোট ছোট তাদের ঘর; কী রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবন যাত্রা, কিছুই জানিনে, শুধু গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু এতটুকু আলো, প্রাণের আলো।"...

"ওকি ও, অন্ধকারের মাঠের মধ্যে আমাদের মহামান্য পোটেটো আর ডাক্তার কী করছেন? আলু যখন আছে তখন মনে হচ্ছে আজ একটা কাণ্ড ঘটবেই।

"সামনের পাহাড়ে চিত্রিতারা আছে, তার' আলো দিয়ে এখুনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবে। আমাদের নিজেদের কোড্ আছে। তাই ওঁরা আলো নিয়ে তৈরী হচ্ছেন।"

"ও বাবা, এ তো ব্যাপার কম নয়! সুচিত্রা দেবী বিরহিণী ব'সে আছেন, আর এখান থেকে তাঁর ভগ্নীপতি আলোর দূত পাঠাবেন! ও

হে ডাক্তার, এ যে মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গেল। ঐ যে জ্বলেছে আলো। এতটা বাড়াবাড়ি—তুমি সহ্য কর কি ক'রে?—আবার হাসে, অত হাসি কেন? বারবার বলেছি আমার কথায় কখনো হেসোনা তোমরা। আমি তো ঠাট্টা করতে পারিনে, আমার যে হিউমারের বোধ নেই তা প্রমাণ হ'য়ে গেছে, জাননা? একজন প্রোফেসার প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন লিরিক্ কবিদের হিউমারের বোধ থাকে না, অকাট্য তার সব যুক্তি। কাজেই, হয় মানতে হয় আমার হিউমারের বোধ নেই, নয় স্বীকার ক'রে ফেলতে হয় আমি কবি নয়—এত কষ্টের কবি খ্যাতিটি খোয়া যাবে? কাজ কি, তার চেয়ে আমার কথায় আর তোমরা হেসোনা।"

"কে আবার একথা লিখলে?"

"একজন অধ্যাপক গো অধ্যাপক, তা নৈলে আর এত বিশ্লেষণ বুদ্ধি হয়? এত অকাট্য যুক্তিই বা আর কে পাবে—নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা যাঁদের!"

"এখানে সন্ধ্যাবেলা তোমরা কি কর? তাস খেল না? আজকাল যে ঐ এক খেলা হয়েছে ব্রীজ?"

"না ওসব আমার আসে না একেবারে।"

"আমারও না, তবে এক সময়ে একটু একটু খেলেছি বটে দায়ে প'ড়ে। আমাদের সময়ে সব অন্যরকম খেলা ছিল—গ্রাবু খেলা হোতো খুব।"

"আজ তাস খেলবেন সন্ধ্যেবেলায়?"

"মন্দ কি? কিন্তু এসোসিয়েটেড্ প্রেসে খবর দিওনা যেন। আমার আবার ঐ এক গেরো, সঙ্গে আছেন এসোসিয়েটেড্ প্রেস, তারপর থেকে বোঝা বোঝা তাস আসতে থাকবে—সার্টিফিকেট লেখ কোন্ তাসের কী গুণ—তাস খেলায় কী উপকার, কাদের তৈরী তাস উৎকৃষ্ট। সার্টিফিকেটের জ্বালায় আর নামকরণের জ্বালায় পেরে উঠিনে। যত লোকের নাম দিয়েছি আজ পর্যন্ত,

প্রশান্তকে বলতে হবে তার ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ ক'রে দেখবে তার মধ্যে কে কি হয়েছে, ক'টা খুনী ক'টা বা চোর ডাকাত—আর আশীর্বাদেরও একটা হিসেব নেওয়া দরকার। তা'হলে আমার আশীর্বাদের যে কী মূল্য হাতে হাতে তার একটা প্রমাণ হ'য়ে যায়।"

সন্ধ্যেবেলা তাস সাজিয়ে বসলুম সবাই মিলে। আমাদের ভারি মজা লাগছিল, ওঁর সঙ্গে তাস খেলা, এসোসিয়েটেড প্রেসে খবর দেবার মতই এ ঘটনা।

"দেখ আমি তোমাদের ও সব আধুনিক খেলা মোটেই জানিনে। তুটো খেলা জানি, একটার নাম স্ন্যাপ্ আর একটার নাম—" (সে নাম আমারো লেখা নেই, খেলাটা অনেকটা Poker খেলার মত)। সবাই মিলে টেবিল ঘিরে খেলতে বসা হ'ল—আলুবাবু বললেন, "ও কি, আপনি গুরুদেবের পাশে বসেছেন যে? তাহ'লে আপনাদের পার্টনার হ'তে দেওয়া হবে না।"

"বা, তাতে কি হয়েছে, বসলেই হ'ল!"

"কৈ তোমাদের সম্বল কি? টাকা বের কর, বিনি পয়সায় তাস খেলবে তা হবে না, এবার আমার সচ্ছল অবস্থা, সাড়ে উনিশ টাকা থলি ভর্তি তা জানো। অবশ্য এখন আছে কিনা তা জানিনে।"

সুধাকান্তবাবু ধ'রে ফেল্লেন, "একি কাণ্ড, নিশ্চয় কিছু গোলমাল করেছেন আপনারা, তাস বদল করছেন!"

উনি হেসে হাতের তাস ফেলে দিলেন, "নাঃ, এরকম মোটাবুদ্ধি পার্টনার নিয়ে আর যাই-হোক তাস খেলা চলে না। কতক্ষণ থেকে ইসারা করছি, বোকার মত হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। তার চেয়ে কবিতা পড়া যাক। এরকম স্থূলবুদ্ধির পক্ষে তাসের চেয়ে কবিতাই ভালো।"

ভোর বেলা অল্প অল্প রোদ এসে পড়েছে কাঁচের ঘরে। কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে তুটো প্রকাণ্ড 'হলিহক' ফুটে রয়েছে।

ঘরের মধ্যে একটা ভ্রমর কাঁচের আবরণ বুঝতে পারে না, বারে বারে ফুলের উপর পড়তে চায়।

"এসোহে কমলিনী, দ্বার উন্মোচন কর, মুক্তি দাও আবদ্ধ ভ্রমরকে। অনেকক্ষণ থেকে বেচারার দুঃখ চলেছে, আমি গাইছিলুম "ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে'—ওর দুর্দশা দেখে থামতে হ'ল।"

"তোমার এই হল্‌দে ফুলের সারিটি কিন্তু অতি অপরূপ হয়েছে, আমি এতক্ষণ বসে দেখছিই দেখছিই। কি ফুল এ? কোনো অভিজাতবংশীয়া নিশ্চয়!"

"মোটেই নয়, বন্য লিলি, একেবারে বন্য।"

"এ কিন্তু ফুলের রাজ্য ফুলের দেশ।"

"কিন্তু এখন মোটেই ফুলের সময় নয়—মার্চ এপ্রিলে এখানে ফুল দেখবার মত হয়। এখন তো বাগান শূন্য আমার!"

"এই যা করেছ এর জন্যেই আমি grateful madam—I am grateful to you। শুধু যদি দয়া ক'রে তোমার চাকরদের বুঝিয়ে দাও এমন ক'রে একটা পাত্রে এত ফুল না গুঁজে দেয়। ওই দেখনা, মহাদেব এইমাত্র ঐ ফুলগুলোকে রেখে গেল। এতগুলোকে এক সঙ্গে গুঁজে দিলে ওদের প্রত্যেকের জাত মারা হয়—ওতে সকলেরই বিশিষ্টতা নষ্ট হয়, আর সকলকে মিলিয়েও এমন কিছু একটা সার্থক সৌন্দর্য সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে না। জাপানীদের ফুল সাজান এত সুন্দর, কারণ সে ভারি simple। ওরা একটা পাত্রে একটি মাত্র ফুল রাখে, তাই সেটিকে দেখা যায় পরিপূর্ণ রূপে। সেই একটিই যথেষ্ট হ'য়ে ওঠে।"

সেদিন রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল একেবারে হঠাৎ। দরজা জানালা যেন ভেঙে দিতে চায়। ওঁর ঘরের স্কাইলাইটগুলো খোলা ছিল, একটু ভাবনায় পড়লুম আমরা। যাহোক ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকা গেল—রাত্রি গভীর, তখন অন্ধকারে যতদূর মনে হ'ল ঘুমিয়ে

আছেন, গায়ে একটিমাত্র বালাপোষ। আমরা জানালা বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে কম্বল গায়ের উপর ঢেকে দিয়ে চলে এলুম।

পরদিন সকালে উঠেই বলছেন, "কাল তোমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে কি কাণ্ডই করলে! সে এক সমারোহ ব্যাপার। আমি চুপ ক'রে দেখছি যে কি দুর্ঘটনা ঘটে।"

"আপনি জেগে ছিলেন? আমরা কিছুতো বুঝতে পারলুম না!"

"বুঝতে না দিলেই বোঝা যায় না। রাত দুপুরে এসে জানালা বন্ধ করছেন, পাছে ভূমিকম্প ঢুকে পড়ে। দুজনে দিব্যি আমার দুটো জামা চুরি ক'রে—"

"আহা আপনার জামা কেন চুরি ক'রব—?"

"আবার বলে কেন চুরি ক'রব? ঐ রকমই স্বভাব ব'লে। স্পষ্ট দেখলুম আমার মত জামা।"

"ও তো ড্রেসিংগাউন।"

"ফস্ ক'রে একটা ইংরেজি নাম বলে দিলেই হ'ল—যাক্ যা হবার তা হ'বে, একলা চলেছি এ ভবে, জামা যার লবার সে লবে। এখন তোমার কর্তৃকারককে বল আজকের খবরটা শুনুন। এ চীন দেশের কাহিনী আর শুনতে পারি নে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিওর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারি নে। চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হ'য়ে উঠল। আশ্চর্য এই, যত দুঃখ পাও, যতই শুভ ইচ্ছা কর, এতটুকুও শুভ ঘটাতে পারোনা—শুভ কামনার কল্যাণ বুদ্ধির কোনোই ফল নেই। বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। মানুষ মানুষের বুকে অকারণ বার বার নিষ্ঠুর ছুরি উদ্যত করছে, এ নৃশংসতা আর কত দেখব!"

"তোমাদের মেয়েদের এই বড় দোষ, একটা যদি কিছু হ'ল সে আর মন থেকে তাড়াতে পার না। কে কি বলেছে আর বলে নি,

কী এসে যায় তাতে? আমায় তো যত লোকে নিন্দে করে তত গায়ে জোর পাই, টনিকের কাজ করে। অতএব বাজে কথা না ভেবে আমার সুপরামর্শ শোনো, এস কাব্যালোচনা করা যাক। তুমি একটা কবিতা পড়, আমি অবহিত হ'য়ে শ্রবণ করি।"

"ভাল লাগছে না এখন।"

"ঐ তো দোষ, যখন খুব ভাল লাগা উচিত ঠিক তখনি লাগে না। শোনো আমার কথা, আজকাল কী লেখ বল দেখি, নিয়ে এস দেখব।"

"অসম্ভব, সে হ'তেই পারে না।"

"কেন হ'তে পারে না? অবশ্য হবে, এখুনি হবে—যাও, আর লজ্জায় কাজ নেই। সেই যে কবিতাটা আমায় পাঠিয়েছিলে সেইটে আনো এখন, লক্ষ্মী হ'য়ে পড়। এতে আপত্তির কি আছে? কবিতা পড়াটা তো দুষ্কর্ম নয়।"

"কুণ্ঠিত কৈশোর যবে আপনারে আপনি না জানে,
কখন দাঁড়ালে এসে কম্পিত মর্মের মাঝখানে।
কত সে নিস্তব্ধ রাতে জাগি' দীর্ঘ তামসী রজনী
হৃদয়ে শুনেছি নিত্য অশ্রুত তোমার কণ্ঠধ্বনি।
অলস মধ্যাহ্নে কত বাদলের সন্ধ্যায় সজল
অপূর্ব বেদনা আনে গীতস্নিগ্ধ ছন্দ অবিরল
অদৃশ্য মূরতি জাগে ভরি মোর মুদিত নয়ন
প্রত্যহের বন্ধ হ'তে ছুটে যায় উড়ে যায় মন।
তুচ্ছ হয় দুঃখ সুখ গ্লানি যত ঢাকা প'ড়ে যায়
নিভৃত মন্দিরে মম স্বপ্নাচ্ছন্ন মুগ্ধ চেতনায়।
শুধু তব কাব্য নয় নহে শুধু সুর সম্ভার
সমস্ত ছাড়ায়ে তুমি দাঁড়ায়েছ হৃদয়ে আমার।
জীবন প্রত্যুষ হ'তে সে স্পর্শ গভীর মর্মে লিখা
আমারে জ্বালায়ে তোলে অকম্পিত ঊর্ধ্বমুখী শিখা!
তবু কি যে খুঁজে ফিরি জানিনা কি জাগে মনে আশা
অর্থহীন কী বেদনা নিত্য চায় প্রকাশের ভাষা।

গোপনে সঞ্চিত অর্ঘ্যে ম্লান পুষ্প সিক্ত অশ্রুজলে
খলিয়া পড়িতে চায় সরম কুণ্ঠিত চিত্ততলে।
কেন এ আকাঙ্ক্ষা জাগে কোনো তার পাইনা উত্তর
ধূম্রলীন প্রদীপের কেন এ আরতি নিত্য মোর।
কেন এ দুর্বল সাধ কম্পমান হয় ক্ষুদ্র বুকে
মলিন অঞ্জলি মম আনি তব নয়ন সম্মুখে।
শক্তিহীন এ আরতি দৃষ্টির প্রসাদ নাহি চায়
আপন অন্তরে মরে প্রকাশের দুঃসহ লজ্জায়।
কোনো তার মূল্য নাই, নাই কোন তুচ্ছতম দাম।
সমস্ত জীবন ভ'রে এ আমার নিঃশব্দ প্রণাম।"

"এ তো ভালো হয়েছে। যা সত্যি মনে হয়, সত্যি কথা লিখলেই ভালো হয়—বানিয়ে বানিয়ে লিখলে তা হবার নয়। যত কবিত্বই কর, ততই সে গাঁজিয়ে ওঠে কিন্তু তোমরা মেয়েরা বড় কম লেখ * * *"

"আপনি এর যা উত্তর দিয়েছিলেন আপনার নিশ্চয় মনে নেই। বলি শুনুন—

"ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন
দক্ষিণ অর্ণবে
অতল বিরহ তার যুগ যুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য অশান্তের
সীমানার ধারে,
ব্যথায় ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া
বেড়াল যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল সাথে।
অবশেষে রজনী প্রভাতে
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিঃশ্বাসে তার এতটুকু মল্লিকার কলি,

উঘারিল গন্ধ তার
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে
সমুদ্রের উদ্বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে।"

(এই কবিতাটি পরে 'সানাই'তে প্রকাশিত হয়েছে)

"তোমার তো মুখস্থ থাকে মন্দ নয়? এটা কি আমার কাছে নেই?"

"বোধ হয় না, আমি 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে আবার ফেরত এনেছিলাম! প্রকাশিত হয় নি।"

"তা'হলে লিখে দিও আমাব খাতায়। লেখার জন্য যা তাগাদা আসতে থাকে নানা স্থান থেকে! পাঠিয়ে দেওয়া যাবে কোথাও।"

পরের দিন তাস খেলতে ব'সে একটু পরেই বললেন, "তোমার সেই কবিতাটা তোমাব বন্ধুকে শোনাও না? এতে আর লজ্জার কি আছে? কবিতা লেখাটা তো লজ্জার বিষয় ব'লে আমিও মনে করিনে, সুধাকান্তও করে না, তা হলে 'প্রবাসী'র উপকার করা হ'ত।"

অগত্যা পড়তেই হোলো আবার।

"আমার এর একটা উত্তর আছে, সেই কালো মলাটের খাতাটা নিয়ে আয় তো, উত্তরটা পড়ি, পুরীতে লেখা 'জন্মদিন' কবিতাটা যাতে আছে।

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনিনে আমি
চেনেন না মোর অন্তর্যামী,
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা
বিধাতার সৃষ্টি সীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে
কাল সমুদ্রের তীরে বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি

রূপকার আপন নিভৃতে,
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া
আর কল্পনার মায়া
আর মাঝে মাঝে শূন্য এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে
সংসার খেলার কক্ষে তাঁর
যে খেলেনা রচিলেন মূর্তিকার
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণ ভঙ্গুর
কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।
সে বহিয়া এনেছে যে দান
সে করে ক্ষণেক তরে অমরের ভান
সহসা মুহূর্তে দেয় ফাঁকি
মুঠি কয় ধূলি রয় বাকি—
আর থাকে কাল রাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলা।
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে?
এ কথা কল্পনা করো যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখি কোণে
সে কথাই ভাবি আজ মনে।"

আমরা সবাই স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম। হয়তো তাই সত্য—সে ক্ষণভঙ্গুর—'কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর' কিন্তু

মন তা মানে না। সব ফাঁকি হ'য়ে যাবে? মুঠি কয় ধূলি রবে বাকি? বিরাট সেই রূপসৃষ্টি হারাবে কায়া, হারাবে রূপ, তা জানি, তবু কিছুই কি বাকি রবে না, যা চির সত্য হ'য়ে 'এই লুব্ধ বিরাট ধূলিরে এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে?' জানি মহাকবি অনাগত দীর্ঘকালের মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে, সত্য হ'য়ে থাকবেন। কিন্তু শুধু তাতে মন খুশি হয় না। এই মানুষ, এই শরীরী লৌকিক দেহধারী অলৌকিক মানুষ, যাঁকে রূপকার সৃষ্টি করেছেন অতি অপরূপ ক'রে, সেই মানুষ কোথায় যাবেন! কাব্যের অমরতা সে ক্ষতিকে পূরণ তো করতে পারে না—সেদিন আজকের কথা মনে করতেই পারিনি—সহসা মুহূর্তে দিয়ে ফাঁকি মুঠি কয় ধূলি রবে বাকি, আর রবে কাল রাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলা।

"বয়স হলেই বৃদ্ধ হ'য়ে যে মরে
বড ঘৃণা মোর সেই অভাগার পরে
প্রাণ বেরোলেও তোমাদের কাছে তবু
তাইতো ক্লান্তি প্রকাশ করিনে কভু।"

একথা যে তাঁর জীবনে কত সত্য তা যারা তাঁকে দেখেছেন সবাই জানতেন। আশি বছর বয়সেও নবযৌবনের প্রতীক কবি, শারীরিক কোনো দুর্বলতা, রোগের ক্লান্তি, কিছুই তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারত না। যখন তিনি আমাদের এ রকম সহাস্য পরিহাসে আলাপে কৌতুকে আনন্দে মুখরিত ক'রে রাখতেন, সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা প'ড়ে শোনাতেন, তখনও তাঁর শরীরের ভিতরে রোগের বেদনা মূল প্রসারিত ক'রে চলেছিল। প্রায়ই জ্বর হ'ত, কিন্তু সে সব কিছুই গ্রাহ্য করতেন না, এবং অন্যরাও তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলে বা বেশি ব্যস্ততা প্রকাশ করলে পছন্দ করতেন না। গতবারের বড় অসুখের পর থেকেই শরীর ক্রমে দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু হাসি মুখে, কবিতার ঝর্নায়, সুরের প্রবাহে, সহাস্য কৌতুকে, শরীরের সমস্ত দুঃখ গোপন করেছেন।

কাউকে এতটুকু উদ্বিগ্ন করা দূরের কথা, আনন্দে মাতিয়ে রেখেছেন চারপাশের আবহাওয়া। মানুষের জীবন কত আনন্দোজ্জ্বল, কত প্রাণরসে পরিপূর্ণ, কৌতুকে সুস্নিগ্ধ হ'তে পারে তা তাঁকে না দেখলে কখনো আমরা কল্পনা করতে পারতুম না। যে ক'টা দিন জীবনে তাঁর কাছে থাকবার সুযোগ পেয়েছি, তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছি, শুধু তাই নয়, আমরা বেঁচেছি বাঁচার মত ক'রে। আমাদের যে বয়স অল্প, তা তাঁর কাছে না এলে এমন ক'রে কখনো জানতুম না। 'প্রাণ বেরোলেও তোমাদের কাছে তবু, তাইতো ক্লান্তি প্রকাশ করিনে কভু—' এ কথা প্রত্যক্ষ করেছি প্রতিদিন।

কালিংপং-এ ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে যখন অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, তার পরে প্রায় এক বৎসর দারুণ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কিন্তু তাঁর রোগশয্যাও উজ্জ্বল ক'রে রাখতেন হাস্যকৌতুকে। রোগীর ঘর ব'লে সে ঘরের আবহাওয়া নিরানন্দ ছিল না। যাঁরা কাছাকাছি থাকতেন তাঁদের রোজই নতুন নতুন নামকরণ হতো। রোগশয্যার পাশে যাঁদের থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা তাই রোগীর ঘরে আবদ্ধ হয়ে অবসাদগ্রস্ত হননি। পরমানন্দে তাঁর সঙ্গসুখ লাভ করেছেন। সে সঙ্গে সুখ ছিল, ছিল গভীর আনন্দ, ছিল জীবনের উজ্জ্বলতা, রোগক্লান্ত হ'য়েও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আনন্দস্বরূপ কবি। শেষ দিন পর্যন্ত অপরাজেয়। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল —কালিংপং-এ তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটাবার পর প্রথম কলকাতার রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ির মধ্যে স্বাভাবিক চৈতন্য ফিরে এল। চোখ মেলে একটুক্ষণ দেখে বললেন, "এ কোথায় পুরেছ আমায়, এ যে একটা খাঁচা! খাঁচার বাইরে কি আছে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" জ্যোতিবাবু বসেছিলেন মাথার কাছে, তিনি বললেন, "আমরাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনা শুধু আপনাকে ছাড়া।" উনি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "সেই যথেষ্ট, কী বল?" অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমাখা ছিল

মুখ। আজ তা স্মৃতিতেই শুধু দেখতে পাব। তবে এই আমাদের আনন্দ যে আমরা বিলম্বে এসেছি ব'লেও কিছুমাত্র বঞ্চিত হইনি। চির পুরাতন কবি শেষ দিন পর্যন্ত চির নবীন ছিলেন—জরা তাঁকে স্পর্শ করে নি।

আজ সকালের দিকে শরীর একেবারে ভালো ছিল না। ভোরবেলা যখন প্রণাম করতে গেলুম, বারান্দায় চৌকিতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে বসেছিলেন। মেঘ কুয়াসার আড়াল থেকে ম্লান রোদ্দুর গায়ের উপর এসে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "ডাক্তার আনবার বন্দোবস্ত ক'রব" ?

"ননসেন্স্, ডাক্তার! ডাক্তার আমার কী করবে? আমি কি ডাক্তারের ওষুধ খাই? তাছাড়া এ আমার হার্টের কষ্ট। আমি জানি এইটেই আমার দরজা—প্রত্যেকেরই একটা না একটা দরজা থাকে, আমার মৃত্যুবাণ এইখানেই আছে। হঠাৎ একদিন স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, সে মন্দ নয়। দেখ,—নাকি বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে, যে উনি মৃত্যুকে ভয় করেন বড় বেশি, সেই জন্যই সর্বত্র লেখেন ভয় করিনে, ভয় করিনে। কিন্তু একথা সত্য নয়, একেবারেই সত্য নয়। জীবন সম্বন্ধে আমার আর স্পৃহা নেই। কেবল একটি কথা মনে হয় কি জানো? এই যে বিশ্বভারতী এত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, আমার অবর্তমানে এর আর মূল্য কি কিছুই থাকবে না? এর পিছনে যে কী পরিশ্রম আছে তাতো জান না, কী দুঃখের সে সব দিন গেছে যখন ছোটবৌর গহনা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। চারিদিকে ঋণ বেড়ে চলেছে, ঘর থেকে খাইয়ে পরিয়ে ছেলে যোগাড় করেছি, কেউ ছেলে তো দেবেই না, গাড়ি ভাড়া ক'রে অন্যকে বারণ ক'রে আসবে। এইরকম সাহায্যই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি। আর তখন চলেছে একটির পর একটি মৃত্যুশোক, সে দুঃখের ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'য়ে গেছে। লোকে জানে উনি শৌখীন বড়লোক। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হ'য়েছিলুম, আমার সংসারে কিছুমাত্র বাবুয়ানা ছিল না। ছোটবৌকেও অনেক ভার

সইতে হয়েছে, জানি সে কথা তিনি মনে করতেন না। কিন্তু এত বাধা যদি দেশের লোকের কাছ থেকে না পেতুম তাহ'লে শুধু অর্থাভাবে এত কষ্ট পেতে হ'ত না। সাহায্য পাইনি সে সামান্য কথা, কিন্তু কী বাধা! যাক্ সে সব যা হবার তা হয়েছে, এখন এত ক'রে যা গড়ে তুলেছি আমার অবর্তমানে যদি তার মূল্য ক্ষয় হয়, তাহ'লে এত দিনের এত পরিশ্রম সব যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, আর রথীরাই বা বাঁচবে কি নিয়ে? তাদের চারপাশে যে একটা মহত্তর আবেষ্টন, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে গ'ড়ে উঠেছে, সেটা ভেঙে গেলে ওরা যে বড় অসহায় হ'য়ে পড়বে। মৃত্যু সম্বন্ধে এই একটি মাত্র বাধা আমার মনে হয়, সে আমার বিশ্বভারতী, আর কিছুই নয়।"

শারীরিক মানসিক যে দুঃখগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত সে সম্বন্ধে তিনি চিরদিন নীরব থাকতেন। তাঁর মুখে তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা খুব কমই শোনা যেত। তবে ইদানীং মাঝে মাঝে বলতেন। বিশেষ করে যে সময়ে শান্তিনিকেতন শুরু করেছিলেন সেই সময়ের কথা বলতে বলতে যেন তিনি সেই তীব্র দুঃখের সম্মুখীন হয়ে থেমে যেতেন। তিনি তো সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং অন্যান্য কবিদের মত খেয়াল খুসীর উদ্দাম মুক্তিতে জীবন ভাসিয়ে দেননি। সাধারণ গৃহস্থের মত সংসারের ভারও তাঁকে পুরোদমেই বইতে হয়েছে। বলতেন, "তোমাদের এখনকার মত আমরা এত বড়মানুষ ছিলাম না। এখন তো তোমাদের দেখি কিছুতেই কুলোয় না। আমার বরাদ্দ ছিল ২০০৲ কী ২৫০৲। তাই এনে ছোটবৌকে দিয়ে দিতুম ব্যস্। তিনি যা খুসী করতেন, সংসার চালাতেন। আমায় সেদিকে কখনো কিছু ভাবতে হোতো না।" কিন্তু এ ব্যবস্থা তো দীর্ঘ দিন চলে নি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুরু হবার অল্প পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। মেজ মেয়ে দীর্ঘ দিন রোগে ভুগে মারা গেলেন। তাঁদের রোগশয্যায় শুশ্রূষা ও অন্যান্য ব্যবস্থা কি ভাবে করেছেন—মুমূর্ষু কন্যার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য আলমোড়া থেকে কাঠগুদামে তাকে ডাণ্ডিতে করে বহন করে

৬ মাইল পাহাড়ে' পথ হেঁটে নেমেছেন—সে সব কাহিনী নানা জায়গায় নানা জনে লিখেছেন—। কবির কাছে, বিশেষ করে এমন লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবির কাছে, কোনো দেশ ও পরিবার এ আনুগত্য কোনো দিন পায় নি। শেলী, গেটে প্রভৃতি জগৎ বিখ্যাত কবিদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে তাই আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। প্রতিদিনের প্রতিটি তুচ্ছ কর্মকে আনন্দে বহন করেও তিনি দৈনন্দিন তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে গিয়েছেন। এ কথা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং কাব্যজীবন উভয় দিকেই সত্য। আদর্শবাদী বাস্তববাদী বল্লে কি বোঝায় জানিনা, কিন্তু মনে হয় তিনি সমস্ত বাস্তবতার ভিতর দিয়ে আদর্শকে স্পর্শ করেছেন। এ অঘটন খুব কম কবির জীবনেই ঘটেছে। কিন্তু ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে যে বৃহৎকে জানা, সীমার ভিতরে যে অসীমের অনুভব, বিশেষের ভিতরে যে বিশ্বরূপ দর্শন তা আমরা রবীন্দ্রজীবনে ও কাব্যে সমান ভাবেই দেখতে পাই। তাই নিজের সন্তানের শিক্ষা দিতে গিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় এবং নিজের জাতির মঙ্গল সাধনের প্রয়াস বিশ্বের কল্যাণে গিয়ে পৌঁছয়।

সেই দুঃখের দিনে সবচেয়ে যা তাঁকে গভীরভাবে কষ্ট দিয়েছিল সে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলবার পথে দেশের লোকের কাছ থেকে বাধা—যে সময় যে কাজে সহানুভূতি পাওয়া উচিত ছিল তার পরিবর্তে পেলেন অপমান ও নিন্দা। সেইজন্য এই বিষয়ে শেষদিন পর্যন্ত দেশের লোকের সম্বন্ধে তাঁর গভীর অভিমান ছিল।

বলতেন—"আমি যা ভাল বুঝেছি প্রাণপণে তা দিতে চেয়েছি এর চেয়ে আর অপরাধ কি করেছি বল? কিন্তু তোমরা তা নেবেনা, ফিরিয়ে দেবে, শুধু ফিরিয়ে দেবে তা নয়, গাল দিয়ে ফিরিয়ে দেবে। নিয়ে এলাম জাপানীকে যুযুৎসু শেখাবে, তার পিছনে আমার কি কম খরচ হল? শিখলে কি ভাল হত না? কিন্তু ক'টা ছেলে শিখলে বল? নিরস্ত্র অসহায় অক্ষম আমাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষ, ভাবলুম এ বিদ্যেটা এদের কাছে পৌঁছে দেওয়া

যাক—হোল না। আমার কাজ সম্বন্ধে সমালোচনায় নিন্দায় রসনা মুখর হয়ে আছে কিন্তু সাহায্য করতে কেউ কড়ে আঙ্গুল নাড়ল না।"

"কী তুমি যে চুপচাপ ব'সে আছ, প্রস্তুত হওনি এখনও—নাইবে না?"

"এইবারে যাব, কুঁড়েমি লাগছে।"

"কুঁড়েমি লাগছে—? সে তো অতি উত্তম, ঠিক আমার মত অবস্থা তাহ'লে। আমারও ঐ রকম মাঝে মাঝে কুঁড়েমি লাগে, চুপ ক'রে ব'সে থাকি চৌকিতে। একটা কাক কা-কা ক'রে উড়ে যায় দুপুরের রোদ্দুরে, ফেরিওয়ালা হাঁকে 'চাই তপসে মাছ, তপসে মাছ', বাসনওয়ালা ঝমঝমিয়ে চলে যায়,—গলির মোড়ে মোড়ে হাঁক শোনা যায় 'বেলোয়ারী চুড়ি চাই'। দূরে বেজে যায় দুপুরের ঘণ্টা। বনমালী এসে বলে, 'এইবারে উঠুন, নাইবার জল দিয়েছে, মা ঠাকরুণ ভাতের থালা নিয়ে বসে আছেন যে।' আমি বলি, 'যা বলগে এখন বড় ব্যস্ত আছি!' 'ব্যস্ত কি বাবামশায়, আপনি তো চুপ ক'রে ব'সে আছেন।' 'এ চুপ ক'রে থাকাই তো কাজ, ঐ কাজ না-থাকার কাজেই তো ব্যস্ত আছি, তোর মা ঠাকরুণকে বল গে, বি-এ পাস, তোর চেয়ে বুদ্ধি আছে, বুঝতে পারবেন।' এমন সময় মা-ঠাকরুণের প্রবেশ। 'কি আজ কি আর ওঠা হবে না, সব যে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল!' 'আর একটু থাম না, এই কাজ-না-থাকার কাজে ব্যস্ত আছি যে, বিষম ব্যস্ত।' 'ঐ রকম ক'রেই তো শরীর গেল। সময়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই।' 'নিশ্চয় নিশ্চয়, কাজ না-করার কাজে শরীর একেবারে পাত হ'য়ে যাচ্ছে—কাজ না-করার কাজ কি সোজা কাজ, সে যে বিষম কাজ!' 'না বাপু থাক ব'সে তবে, আমার আবার নেমন্তন্ন আছে, এখুনি যেতে হবে।' 'সে আবার কোথায়?' 'কেন, বীণার ওখানে সুরেশবাবুর গান শোনবার নেমন্তন্ন।' 'ও বাবা, তাহ'লে

তো কাজ-না-করার কাজ ফেলে এখুনি উঠতে হ'ল, সেখানে গেলে কি আর আজ ফিরবে!'"

এই পর্যন্ত এক সঙ্গে ব'লে গিয়ে হেসে তাকালেন, "কেমন শোনালো? একেই বলে স্বগত-উক্তি। কথাবার্তাগুলো ঠিক হয়েছে তো? কিন্তু তোমার তো আর কাজ-না-করার কাজ নেই,—এবার তা হ'লে নেয়ে ফেল!"

আজ ২২শে মে মিঠুর জন্মদিন। সকালে উঠেই বলছেন, "তোমাদের এখানে সানাই পাওয়া যায় না, কি কোনোরকম বাঁশী? সানাই না হ'লে কি উৎসব হয়!"

শেষ পর্যন্ত বাজাতে হোলো গ্রামোফোনের সানাই। খুকুকে দিলেন ইজিপ্সিয়ান কৌটোয় মেঠাই, "এর ভিতরের পদার্থটা তোমার, আর বাইরের আবরণটার মর্যাদা তুমি এখনও বুঝবে না, ওটা তোমার মায়ের জন্যে।"

বিকেল বেলা নিমন্ত্রিতেরা সবাই এলেন। বড় ছাতিমগাছটার নীচের মণ্ডপে সবাই ওঁকে ঘিরে বসলেন। ঐ মণ্ডপটার নাম দিয়েছিলেন 'শিলাতল।' সেদিন Cresent Moon আর 'শিশু' থেকে অনেকগুলো কবিতা পড়েছিলেন। তারপর সকলের অনুরোধে নতুন কবিতাও অনেকগুলো পড়া হ'ল। "খুকু, আজ তোমার জন্মদিনে যত কবিতা পড়া হ'ল এত আমার জন্মদিনে হয়নি।"

সমাগত অতিথিরা তখনও বসবার ঘরে ব'সে ছিলেন। খাওয়া শেষ হ'তেই বললেন, "আজ কোন্ পথে আমার ঘরে যাব? আজ তো তোমাদের ঘরের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে, দেখব ওখানে কি রহস্য গোপনীয় আছে—sanctum sanctorum!..."

স্বস্থানে ফিরে গিয়ে চৌকিতে বসেছেন—মৃদু মৃদু হাসছেন।

"রহস্যটা কি?"

"বাবাঃ, তোমরা মেয়েরা কত রকমে flattery করতে পার! নিজেরা যেমন flattery ভালোবাস অন্যকেও তেমনি দলে টানতে চাও।"

"অর্থাৎ? তার মানে?"

"এই ঘরময় ছবি টাঙিয়ে বই ছড়িয়ে ইত্যাদি।"

"আমি কি জানতুম যে আজ আপনি এ ঘর দিয়ে যাবেন, যে flattery করবার জন্য ছবি টাঙাব, বই সাজাব? কোনো একটা সুযোগে আমার নিন্দে করতে পারলে আপনি ছাড়বেন না।—কি হাসছেন কেন? আমি যাচ্ছি, এখনি সব ছবি খুলব।"

"এই না, কখন না, বস চুপ ক'রে, ছবি খুললে খারাপ লাগবে আমার। flattery কে না পছন্দ করে, সেটাতো তোমাদের একচেটিয়া নয়! ঠাট্টা বোঝোনা কেন, তোমায় নিয়ে এই এক বিপদ! তুমি রয়েছ সামনে, ঠাট্টা করতে কি পাশের বাড়ির লোক ডাকতে যাব? তার চেয়ে শোনো, শান্তিনিকেতনে একজন বাংলার প্রোফেসর দরকার, ছুটির পরই। তোমার বাবার জানাশোনা কেউ আছেন? যেমন তেমন একজন মাস্টারি-বুদ্ধিওয়ালা নয়। যে সত্যি সাহিত্য বোঝে, রসজ্ঞ। ঐ দেখ, অমনি তুমি ভাবছ তুমি যাবে। তা যেতে পার, কিন্তু তোমায় ঠিক জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে তা বলছি, নৈলে চলবে না, আমি তো আর কর্তা নই। তাছাড়া আমি হয়তো ঠিক তোমায় নিয়ে নেব, লোকে বলবে পক্ষপাত, আর এমনি কি মিথ্যে বলবে!···না দেখ, আমি ঠাট্টা করছিলুম, তোমায় আবার সর্বদা সেটা মনে করিয়ে দিতে হয়।"

"শুয়ে পড়ুন এবার, রাত হ'ল।"

"কেন, শোব কেন? বেশ বৃষ্টির শব্দ শুনছি আর ভূতের গল্প পড়ছি, একটু আরামে আছি তোমার অসহ্য হ'য়ে উঠল। ভাবলে যে ক'রে হোক এখুনি একটা কিছু করা চাই। তুমি নিদ্রা দাও গে, আমি এখান থেকে আমার ঘর চিনে দিব্যি যেতে পারব।"

"আচ্ছা তাহ'লে বেঙ্গারস্ ফুডটা খেয়ে নিন।"

"দেখ, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করেছ যেন খোকা দুদু খায় ঢকে ঢক্—অত্যন্ত objectionable ব্যবহার! আবার কথায় কথায় আছে, 'সুধাকান্তবাবুকে ডাকি'। আমাকে তোমরা কি মনে কর? সাবালক হইনি এখনও? এই দেখনা শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা জীবনে কত সহস্রবার যাতায়াত করেছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আজকাল সঙ্গে একজন অভিভাবক থাকা চাই-ই। কি জানি যদি হারিয়ে যাই, যদি ছেলেধরা ভয় দেখায়! সেবার সঙ্গে এলেন এক কর্তা, ভেদিয়াতে গাড়ি থামতেই হাঁপাতে হাঁপাতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে, 'গুরুদেব এটা ভেদিয়া!' কি করি, বলতেই হ'ল, 'ওঃ, তাই নাকি, বড় আশ্চর্য তো, পৃথিবীতে এত স্থান এত নাম আছে, এটা কিন্তু ভেদিয়া ছাড়া আর কিছু নয়!'···যাক্‌গে, এই লও, থিয়োসোফিস্টদের জার্ণেলগুলো পড়ো। দুটো আশ্চর্য গল্প আছে, নিজের নিজের একস্‌পিরিয়েন্স লিখেছেন, ভারি আশ্চর্য!"

"আচ্ছা এগুলো আপনার বিশ্বাস হয়? আমার হয় না।"

"ঐ তো তোমাদের দোষ। বিশ্বাস করবার মত যেমন প্রমাণ নেই, অবিশ্বাস করবার মত একেবারে অপ্রমাণও হ'য়ে যায় নি তো কিছুই। যার উভয় পক্ষই সমান খামখা তা অবিশ্বাস করি কেন? তোমরা সব ভারি মস্ত মস্ত সায়েন্টিস্ট হ'য়ে উঠেছ কি না। যা systematically proved হবে না, তাতেই অবিশ্বাস! ক'টা বিষয় প্রমাণ হয়েছে সংসারে? তাছাড়া এমন কিছু থাকা খুবই সম্ভব, যা প্রমাণ হয়নি, হ'তে পারে না। কারণ তা সব মানুষের জ্ঞানের গম্য নয়। সে গোপনে থাকবার জন্যই meant, দৈবাৎ কোনো কোনো মুহূর্তে কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে তার এতটুকু প্রকাশ হয়, কিন্তু প্রমাণ করবার মত কোনো স্থূল চিহ্ন রেখে যায় না। এই তো—কি রকম ক'রে সব লিখত বলতো? আশ্চর্য নয় তার ব্যাপারটা?"

"তা হোক, আমার তাকে বিশ্বাস হয় না।"

"এ কথা বলা খুব অন্যায়। ও কেন মিছে কথা বলবে? কি লাভ ওর এ ছলনা ক'রে?"

"কেন, মিছে কথা কেউ কি বলে না, নিজেকে অসামান্য ব'লে প্রমাণ করবার জন্যে?"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার তা মনে হয়নি। এমন সব কথা বলেছে যা ওর বিদ্যাবুদ্ধিতে কখনো সম্ভব নয়—যদি স্বীকার কর যে একটুও সময় না নিয়ে আমি প্রশ্ন করা মাত্র তার ভাল ভাল উত্তর, উপযুক্ত উত্তর, ও ফস্ ফস্ ক'রে লিখে যেতে পারে তাহ'লেও ওকে অসামান্য ব'লে মানতে হয়। আমি কি প্রশ্ন করব তা তো আর ও আগে থেকে জানত না, যে প্রস্তুত হ'য়ে আসবে? এই ধর না নতুন বৌঠান আমার সঙ্গে কী রকম ভাবে কথা বলতে পারেন তা ওর পক্ষে বোঝা শক্ত—তিনি বললেন, 'বোকা ছেলে, এখনও তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।' এ কথা এমনি ক'রে তিনিই আমায় বলতে পারতেন—ওর পক্ষে আন্দাজ ক'রে বলা কি সম্ভব? তাছাড়া আরো অনেক কথা লিখেছিল যা ও জানতে পারে না বা তেমন ক'রে প্রকাশ করতে পারে না। একবার একটা খাঁটি কথা লিখলে, 'তোমরা আমাদের কাছে এত রকম প্রশ্ন কর কেন? মৃত্যু হয়েছে বলেই তো আমরা সবজান্তা হ'য়ে উঠিনি। তোমাদেরও যেমন জ্ঞানের একটা সীমা আছে আমাদেরও তেমনি।' কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা যে লিখেছিল, অনেক বোঝাও গেল না। শমী বলছে, 'আমি বৃক্ষলোকে আছি সেখানে, এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করছি।' কে জানে কি তার মানে। যে রকম দ্রুতগতিতে লিখে যেত আশ্চর্য লাগত! একটা কথা শুনে তার অর্থ বুঝে উত্তর লিখে যাওয়া, এক মুহূর্ত বিরাম না ক'রে, আমি তো মনে করি না যে সহজে সম্ভব। তাছাড়া এত মিথ্যে ব'লেই বা লাভ কি?"

"আপনার কথা শুনে মনে হয়, যেন পৃথিবীতে কেউ কখনো মিথ্যে বলে না বা ছলনা করে না। আর তাই যদি হবে তাহ'লে

হিষ্টিরিক্ টেম্পারামেন্টের মেয়েরাই এ সব বেশি টের পায় কি ক'রে? আপনি নিজে কোনো দিন কিছু দেখলেন না কেন?"

"তা অবশ্য ঠিক, খুব শক্ত সবল জোরালো মানুষরা বোধ হয় ভাল 'মিডিয়াম' হয় না। কিন্তু তারও বোধহয় কারণ থাকতে পারে। কোনো এক শ্রেণীর মনের পক্ষে হয়তো এর গ্রহণ সহজ হয়। আমি আবার দেখব! স্বপ্নই দেখিনে মোটে। এত কম স্বপ্ন দেখি। মাত্র একবার নতুন বৌঠানকে স্বপ্ন দেখেছিলুম, যেন তিনি নীরবে এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে, আমি বললুম, 'তুমি কেন এলে, এখানে তো তোমাকে আর কেউ চায় না।'"

"আমিও কখনো কিছু দেখতে পাই না, কত চাই, সেই জন্যই আমার বিশ্বাস হয় না।"

"এ কথা বলা ভুল মৈত্রেয়ী, অত্যন্ত ভুল, পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলেই সে সব নেই? কতটুকু জানো? জানাটা এতটুকু, না-জানাটাই অসীম—সেই এতটুকুর উপর নির্ভর ক'রে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তা ছাড়া এত লোক দল বেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলে, এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বৈকি। কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে কোনো এক দিকে ঝুঁকে পড়াটা গোঁড়ামি। আমার তাই এই রকম নানা বকম লোকের experience পড়তে ভারি ভালো লাগে। অপমৃত্যু সম্বন্ধে একটা কথা কি মনে হয় জানো, হঠাৎ যে বন্ধন ছিন্ন হয়, হয়তো তা সুসমঞ্জস ভাবে ছিন্ন হয় না। যদি আত্মা ব'লে কিছু থাকে তাহ'লে তার পুরোনো বন্ধন মুক্ত হ'য়ে নতুন অস্তিত্বে প্রবেশ করবার জন্যে হয়তো একটা পথ পার হবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু হঠাৎ যদি যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়ে যায়, সে ছেদ হয়তো ভালো ভাবে হয় না। এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবেশ তাই বিলম্বিত আর অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়ে। জানিনে অবশ্য এ সব কি হ'তে পারে বা না পারে, সমস্তই

অনিশ্চিত, তবে মনে হয় অপমৃত্যু অস্বাভাবিক ব'লেই তার মধ্যে একটা যন্ত্রণা থাকা সম্ভব, তার যে ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল না। সে জন্যে আরো একটা কথা মনে হয়, যদি কারও মৃত্যু আসন্ন হ'য়ে আসে তখন আসক্ত হ'য়ে শোকাকুল হ'য়ে তাকে বদ্ধ করবার চেষ্টা করা উচিত নয়—আমার জীবনে যতবার মৃত্যু এসেছে, যখন দেখেছি কোনো আশাই নেই, তখন আমি প্রাণপণে সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে মনে করেছি, 'তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম, যাও তুমি তোমার নির্দিষ্ট পথে।' নিজের সন্তানকেও আঁকড়ে রাখতে চাই নি। যেতে যখন হবেই তখন যেন আমার আসক্তি, আমার বেদনা, তাকে মর্ত্যের সঙ্গে বেঁধে না রাখে। তাকে বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে যেন না কষ্ট পেতে হয়, যেন সুগম হয় তার পথ—যেখানে ত্যাগেই মঙ্গল সেখানে নিরাসক্ত হ'য়ে ত্যাগ করাই উচিত। ঘটনা প্রবাহ আমার হাতে নেই, কিন্তু আমি তো আমার হাতে আছি। Inevitableএর সঙ্গে কখনো তর্ক করিনে। যত অপ্রিয়ই হোক যত বেদনাদায়কই হোক, যা নিশ্চিত ঘটবে তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত হওয়া কিছু নয়। সেখানে নম্র হ'য়ে মেনে নিতে হয়, তাতেই কল্যাণ। আমার মৃত্যু সময়ে যদি উপস্থিত থাকো—তাহ'লে কান্নাকাটি ক'রে আকুল হ'য়ে পিছনে ডেকোনা। একান্ত মনে ত্যাগ কোরো আমাকে—মনে হয় মুমূর্ষুর প্রতি সেই সব চেয়ে বড় কর্তব্য।"

"এই মাত্র তোমার কর্তা এই বইখানা দিয়ে গেলেন—এই সব বই-ই আমার ভালো লাগে,—সায়েন্সের বই। তোমাদের বইএর কালেকসন দেখলুম, বেশ ভালো হয়েছে, অনেক ভালো ভালো সায়েন্সের বই আছে। কিন্তু কস্মিন্‌কালেও পড়না তো? পড় ঐ যে ছ' পেনি সিরিজের নভেলগুলো যোগাড় করেছ ঐগুলো, বালিশের উপর চুল মেলে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে ঐ সব খুনের গল্প পড়া, কি যে তোমার বুদ্ধি! তার চেয়ে লোকশিক্ষার জন্য একটা

বই লেখ, এই বইগুলো থেকে। আমি কিন্তু তোমার জিওলজির বইটা নিয়ে যাব—সেনকে দেব। লোকশিক্ষার বই যা লিখছে এর থেকে অনেক তথ্য পাবে। কোনো ভয় নেই তোমার, আমি ঠিক ফেরত দেব বই। পৃথিবীতে যত সরণশীল পদার্থ আছে বই তার মধ্যে প্রধান। এ বিষয়ে আমাদের—অগ্রগণ্য, কিন্তু আমার সেরকম স্বভাব নয়।···কী আশ্চর্য রহস্যময় এই জগৎ, আরো আশ্চর্য তার এতটুকু এতটুকু উদ্ঘাটন! কে মনে করতে পারে এই যে হাতখানা, এ খালি নৃত্যশীল অণুপরমাণুর সমষ্টি। এই সব বই আমার আরো ভালো লাগে এজন্য যে মনকে একটা ইম্পার্সনাল অস্তিত্বে, একটা মুক্তির মধ্যে নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে। তুমি আমি কিছু নয়, শুধু আছে নিয়ম আর সংখ্যা।"

"বসে বসে রেডিওর গান শুনলুম। দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে—আবার থেকে থেকে বলে, 'উঁহু আপনাদের ঠিক হচ্ছে না'—আমি বলি আমার তো ঠিকই হচ্ছে, এখন তোমার ঠিক হ'লে যে বাঁচি! দেখো রবিঠাকুর গান মন্দ লেখে না, একরকম চলনসই তা বলতেই হবে। চলিতে পাবে রজনীগন্ধার গন্ধ মিশেছে সমীরে, ধীরে ধীরে—কম গান লিখেছি? হাজার হাজার গান, গানের সমুদ্র—সে দিকটা বিশেষ কেউ লক্ষ্য করে না গো, বাংলা দেশকে গানে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাকে ভুলতে পার, আমার গান ভুলবে কি ক'রে?···তাও যেন হোলো, কিন্তু এ পদার্থটা কি?"

"ওভালটিন।"

"মহামান্য ওভালটিন। কিন্তু চিনিই যে দাওনি, একটু না হয় মিষ্টি ছাড়লে তাতে ক্ষতি কি? না হয় একটু মাধুর্য বিস্তার করলে, কী রকম কঠোর তোমার স্বভাব! তোমাদের কত সুবিধে, ওগো, ধীর মধুরভাষিণী বোলো ধীর মধুর ভাষে,—তোমাদের তাতেই চলে যায়, একটু মিষ্টি হাসি, মোলায়েম কণ্ঠস্বরে এটা খাও ওটা খাও ক'রেই জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতে পার। আর পুরুষদের?

বাবাঃ, কত কী কাণ্ড,—বি, এ, পাস কর, কাগজের পর কাগজ লেখ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, হাঙ্গামার কি অন্ত আছে!”

“আজকাল তো মেয়েদেরও এ সবই জুটছে। আবার তার সঙ্গে নাচ আছে গান আছে তরকারী কোটাও আছে। আগেকার মত শুধু আহা বাবা বাছা এটা খাও ওটা খাও ক’রে চলে আজকাল?”

“তা সত্যি, অনর্থক হাঙ্গামা কি কম শুরু হয়েছে মনে কর, সেদিন যে মেয়েটির গান শোনা গেল, তারো তো বিয়ে হবে, ভাবো একবার তার স্বামীর অবস্থা! ওরকম গান না শিখলে কোনো ক্ষতি হ’ত না! কী করবে বল, যুগধর্ম—তার চেয়ে চল এবার বারান্দায় বসা যাক্।”

“আচ্ছা আমরা যখন ছিলুম না, একা একা তুমি কি করতে এখানে? এই নির্জনতায় কাটাও কি ক’রে দিন? তোমার নিত্যকর্মপদ্ধতিটা একবার বলত? ওই তো সকালে উঠে একটুখানি ঘরকন্না, ওভালটিন বানানো, একজন আর আধজনের ব্যাপার, অবশ্য আধজনটি নেহাত কম নন!”

“প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হোতো বৈ কি, তা ছাড়া জানেন তো আমার স্বভাব”—

“তা জানি বৈ কি, সেটা তো বেশ একটু মুখর রকমের, লোকের সঙ্গে ভাব করতে রাজ্যের বন্ধু জোটাতে”—

“প্রথম যখন এসেছিলুম তখন তো কেউই ছিলেন না। এখন তবু অনেকে এসেছেন, তবে একেবারে কেউ না থাকা বরং ভালো একরকমে।”

“তা ঠিক, এ যেন থাকা, অথচ না থাকা, নির্জন অথচ পুরোপুরি নয়, এ ভালো না।”

“এখন আমার ভালই লাগে,—পড়ি, সেলাই করি”—

“জানি জানি আরো একটা কাজ কর, চিঠি লেখ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা—ওটা একটা কাজের মত কাজ, ওইত তোমাদের সাহিত্য!

আর আমাদের? দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে।…এ পথে যখন যাবে আঁধারে, চলিতে পাবে রজনীগন্ধার গন্ধ মিশেছে সমীরে, ধীরে ধীরে—আমারও এই ভালো লাগে এই জনশূন্য দিন। এক এক দিন যখন রোদ ঝলমল্ ক'রে ওঠে, কিংবা যেদিন ঘন কুয়াশায় আবৃত হ'য়ে যায় চারিদিক, আমি চুপ ক'রে বসে বসে অনুভব করি এই স্তব্ধ গভীর নির্জনতা। তার একটা স্পর্শ আছে, হৃদয়ের মর্ম পর্যন্ত পৌঁছয়। তোমার বদলে যদি আমার এখানে বিয়ে হোতো আমি দিব্যি থাকতুম। আমার স্বামীকে বলতুম, যাও তুমি কুইনিন বানাও গে, আমি চুপচাপ ক'রে থাকি। আমাকে এখানে একটা কাজ দাও না, একটা কুঁড়ে বেঁধে থাকি। আর উনি নিশ্চয় আমার শরীরের অবস্থা বুঝে হাল্কা রকম কাজ দেবেন দয়া ক'রে? বেশ থাকব চুপচাপ স্তব্ধ হ'য়ে, ফরওয়ার্ড ব্লক নেই, আশীর্বাদ নেই, বক্তৃতা নেই, নামকরণ নেই, ঈশ্বর দয়াময় কিনা আমার কাছে তার সার্টিফিকেট চাওয়া নেই।"

মিঠু এসে উপস্থিত খানিকটা ছেঁড়া ফুল পাতা নিয়ে। "কি গো, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হয় নি? গাছের পাতা ছিঁড়লে যে ওদের ব্যথা লাগে তা জানো?"

"সত্যি লাগে নাকি দাদু?"

"আমি যখন ছোটো ছিলুম, এই ধর ১০।১২ বছর বয়স, তখন কাউকে গাছের পাতা ছিঁড়তে দেখলে ভারি কষ্ট পেতুম। অনেকের অভ্যাস আছে চলতে চলতে হঠাৎ একমুঠা পাতা ছিঁড়ে নিল, আমার ভারি খারাপ লাগত দেখতে। মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত। আরো খারাপ লাগত যদি কেউ পোকা কি কুকুর বেরালকে বিরক্ত করত, কষ্ট দিত। অসহায় প্রাণী, ওদের নির্বাক বেদনা মনে লাগে বড়। একবার দ্বিপু অনর্থক একটা কুকুরকে মেরেছিল, আমি জোর ক'রে তার হাত ছাড়িয়ে দিলুম—সে ছিল বাড়ির নাতি, বড় আদরের, নালিশ করল বড়দার কাছে, 'আমায় মেরেছে।' 'কেন মেরেছ? কোণে দাঁড়াও।' রইলুম দাঁড়িয়ে। এই রকম

ছোটদের উপর প্রায়ই অবিচার হয়, তার বেদনা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকে, কথা বলবার উপায় নেই, ভাষা নেই প্রতিবাদের।"

"জন ছুঁয়ো মোরি বৈঁয়া নগরওয়া
নগর লোক সব আত যাত হৈ,
কাহে করত লড় কাঁইয়া।
হামারে তুমারে সম্প্রীত লাগি হৈ
শুন মনমোহন প্যারে,
বাট ঘাট মে অ্যায়সে ন করিয়ো
পড়হুঁ তোরি পঁইয়া।"

"পথের মাঝে আমার হাত ধ'রো না, নগরলোক কত আসছে যাচ্ছে তারা কি ভাববে?—যখন বিদেশে ছিলুম এ সব গান খুব গাইতুম—এ সব গানের মধ্যে দেশের ছবি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত, বিদেশে থাকলে যেন এই সুরের পথে দেশে ফিরে যাওয়া যায়, যেন রোদ্দুর ঝলমল করছে পথের উপর, কত লোক চলেছে সে পথে, তার মাঝখানে বিপদে পড়েছে কলসী মাথায় একটি মেয়ে, খুব যে অবাঞ্ছনীয় বিপদ তা নয়···জন ছুঁয়ো মোরি-বৈঁয়া···

···আর ঐ গানটা শুনেছ? কী যাতনা যতনে মনে মনে··· কী যাতনা যতনে মনই জানে···

কী যাতনা যতনে মনে মনে মনই জানে
পাছে লোকে হাসে শুনে
আমি লাজে প্রকাশিতে পারিনে।
প্রথম মিলনাবধি যেন কত অপরাধী
নিরবধি সাধি প্রাণ-পণে
তবুত সে নাহি তোষে, আরো দোষে অকারণে।
কী যাতনা যতনে মনই জানে।

এই গানগুলোর কথা simple, সুর simple, কিন্তু এর সহজ স্বাভাবিক সুরের ধারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা মনকে গভীর

ভাবে স্পর্শ করে। এর সুরের pathos আকুল ক'রে তোলে মন। এ সব আমাদের সময়ের গান, কে লিখেছে তাও জানিনে—এ সব ভেসে যাওয়া সাহিত্য। আর একটা গান ছিল—

কত কেঁদেছে ও কাঁদায়ে গেছে
যাবার বেলায় হাতে ধ'রে কেঁদেছে।
ও যার বঁধু বিদেশে যায়, সে কি কান্না সয়
কাঁদতে শ্যামের কান্নামুখ মনে পড়েছে
কত কেঁদেছে ও কাঁদায়ে গেছে, কেঁদেছে···

এই গানটির কথা কিছু সাহিত্য সম্পদে ভরা নয়, কিন্তু কি এর সুরের pathos! আর কত সহজ করে বলা, এমন বলা যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায় তার কান্না। বিদেশে এ গানগুলো খুব গাইতুম। ওখানকার atmosphere অন্যরকম, গল্পের বই পড়লেই তো দেখতে পাও সে আমাদের মত দেশ নয়। সেখানে এই সব গানের সুর এমন একটা ছবি সৃষ্টি করত যেন স্পষ্ট দেখতে পেতুম বাঙালী ঘরের মেয়েকে, দেশের ছবিকে। আজকালকার আমার গানে খুব কারুকলা, চারুশিল্প, এ আমার মনে থাকে না—আগেকার সহজ কথা সহজ মিঠে সুরের গানগুলোই মনে আছে আমার···

মনে র'য়ে গেল মনের কথা
চোখের জল আর প্রাণের ব্যথা
মনে করি দুটো কথা বলে যাই
কেন মুখপানে চেয়ে চলে যাই
সে যদি চাহে মরি যে তাহে
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
মনে র'য়ে গেল মনের কথা···
ম্লান মুখে সখী সে যে চলে যায়
তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল
ধূলায় লুটাইল হৃদয় লতা—

এই সব হোলো আমার আগেকার গান—এ গান তোমরা কখনো শোননি, এখনকার গানের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ।"

সমস্ত তুপুর একটা লেখা লিখছিলেন—পাঁচ ছ'বার সে লেখা হোলো। তারপরে আরও পরিবর্তিত হ'য়ে 'পরিচয়' নামে সানাইতে প্রকাশিত হয়েছে। "স্থির হ'য়ে বসে পড়ো।" পড়ে দেখি পূর্বের চেহারা সম্পূর্ণ বদল হ'য়ে গেছে—। একবার একটা লেখা লিখে কখনো ছেড়ে দিতেন না, ঘষা মাজা ছাঁটা কাটা চলতই নিরন্তর। প্রত্যেকবার কপি করতেন আর একটি একটি ক'রে শব্দ বদলাতেন, সে যেন একটা কারুকার্য আলপনার মত সজ্জিত হ'য়ে উঠত। তাই বলতেন, "অন্যকে কপি করতে দিলে এই বড় মুশকিল হয়—প্রত্যেকবার লেখার সময় মনে পড়ে কোনটা কেন ঠিক শোনাচ্ছে না, অন্য কেউ লিখে দিলে তাই সে সুযোগ পাওয়া যায় না।...এই কবিতাটার মধ্যে একটি বলবার কথা আছে, জানি না সেটা লোকের চোখে পড়বে কি না, লক্ষ্য হবে কি না...সে হচ্ছে কোন্‌খানে রোম্যান্সের শুরু, আর কোথায় অবসান। যেখানে সে প্রতিদিনের আলোতে প্রকাশিত ধুলোতে মলিন, যেখানে সে সুলভ, সেখানেই অবসান রোম্যান্সের।"

ডাক এলো—অনেক চিঠিপত্র কাগজ দেশ বিদেশের......ডাক পড়তে পড়তে হঠাৎ বল্লেন, "ওগো গৃহিণী, এ মাসের প্রবাসীটা খুঁজে আনতে পারো? সেটা আছে না গেছে?"

এলো প্রবাসী—নিজে নিজে অনেকক্ষণ পড়লেন—কিছুক্ষণ বাদে ঘরে এসে দেখি স্থির বসে আছেন প্রবাসীটা নিয়ে। "এসো তো—বোসো দেখি এখানে, পড় এই কবিতাটি। তুমি ত একজন রসিকা, শুনি কি তোমার মত, এর মানে বুঝতে কোথাও বাধে?" কবিতাটার নাম 'অদেয়' (পরে সানাইতে প্রকাশিত হয়েছে)। "দাও আমার হাতে আমি পড়ে দিই।" স্নিগ্ধ করুণ হ'য়ে আসে ছন্দের সুর—

"তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে
তাই কেবলি বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা
এমন দৈন্য এমন কৃপণতা
যৌবন ঐশ্বর্যে আমার এমন অসম্মান
সেই বেদনা নিয়ে আমি পাইনে কোথাও স্থান
এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে।

খেয়ান মগ্নক্ষণে
নৃত্যহারা শান্তনদী সুপ্ততটের অরণ্য ছায়ায়
অবসন্ন পল্লী চেতনায়
মেশায় যখন স্বপ্নে বলা মৃদু ভাষার ধারা
প্রথম রাতের তারা
অবাক চেয়ে থাকে
অন্ধকারের পরে যেন কানাকানির
মানুষ পেল কাকে।

হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে
দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে
কে দেয় দুয়ার রুধে
একলা ঘরের শুব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।

কী সংশয়ে, কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে
সময় হলে রাজার মত এসে
জানিয়ে কেন দাওনি আমায় প্রবল তোমার দাবী
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবি
ধুলার পরে মাথা আমার দিতাম লুটায়ে
গর্ব আমার অর্ঘ্য হোতো পায়ে।

দুঃখের সংঘাতে আজি
সুধার পাত্র উঠেছে এই ভ'রে

তোমার পানে উদ্দেশেতে
উর্ধে আছি ধ'রে
চরম আত্মদান
তোমার অভিমান
আঁধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ
পাইনে খুঁজে সার্থকতার পথ।"

আজ একজন লিখেছেন, "এই কবিতাটি প'ড়ে তাঁর মন খুব ব্যাকুল হয়েছে, খুব গভীর ক'রে বেজেছে এ কথাটা। আমার মনে ছিল না কি লিখেছি, তাই বোঝবার চেষ্টা করছিলুম কী এর কথাটা। জানিনে কোনটা কার কী মনে হয়, কী ভাবে লাগে, কী মনে ক'রে লিখি নিজেও অনেক সময় ভুলে যাই। অনেক সময় দেখেছি নিজেরই বুঝতে অসুবিধা হয়। অথচ যখন লিখেছিলুম তখন নিশ্চয় বুঝেছিলুম, নৈলে লিখলুম কি ক'রে? যেমন ধর ঐ 'শাহজাহান' (তাজমহল) কবিতাটা, ওর মধ্যে কয়েকটা লাইন অনেকের কাছে দুর্বোধ্য লেগেছিল। এসেছিল আমার কাছে, তখন আমিও দেখি, মনে পড়ে না কি মনে ক'রে লিখেছি। এইবার তুমি বুঝি শাহজাহানএর জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে? সে এখন থাক—আপাতত এইটে দেখ আগে। তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ, তখন সেই বাইরের দেওয়ার সঙ্গে দিইনি আমার প্রেম—তাই সত্য আমার দিইনি তাহার সাথে—সেই প্রেমকেই বলি সত্য। সন্দেহ করেছিলে সে প্রবঞ্চনা। সে বঞ্চনা যে ঘোর অসম্মান। আমার স্বভাবের সে কৃপণতা আমার যৌবনের অপমান। সেই অন্যায়, সেই অপরাধ, আজ আমাকে সমস্ত বিশ্বের কাছ থেকে, প্রকৃতির আনন্দ উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আমি এই বসন্তের ফুলের নিমন্ত্রণে যোগ দেবার অধিকার হারিয়েছি। হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে, দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে, কিন্তু সে তো তার অযোগ্য, তাই—কে দেয় দুয়ার রুধে, একলা ঘরের স্তব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে। কিন্তু

না হয় আমিই অন্ধ হয়েছিলুম, তুমি কেন জোর ক'রে কেড়ে নিলে না যা তোমার সত্যকার প্রাপ্য—সময় হ'লে রাজার মত এসে জানিয়ে কেন দাওনি আমায় প্রবল তোমার দাবী—ভেঙে কেন ফেললে না ঘরের চাবি? টেনে নিয়ে এলে না আমার হৃদয়ের মধ্য থেকে সেই সত্য তোমার দাবীর অধিকারে? আজ যে সেই মিথ্যার বোঝা আমার সার্থকতার পথ বন্ধ ক'রে দিল। অন্ধকার ক'রে দিল জীবন, ছিন্ন ক'রে দিল যোগ প্রকৃতির সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক আনন্দের। তাই তোমার অভিমান আঁধার ক'রে আছে আমার সমস্ত জগৎ।—এখন বুঝতে পারো কবিতাটা? আগে একটু অস্পষ্ট ছিল নিশ্চয়। তাইত হয়, জানো আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, বাংলা লেখায় কেমন যেন একটু অস্পষ্টতা থেকে যায়ই, ইংরেজীতে অনেক direct হয় লেখা।·· তাহলে এখন ঘরে যাওয়া যাক। বন্ধ করিয়া কাব্য কূজন, এসো ঘরে যাই আমরা দুজন। আজ যে কোথাও সাড়া শব্দ নেই, এঁরা সব গেলেন কোথায়, বড় কর্তা, ছোট কর্তা আর গৃহকর্তা?"

"ওঁরা টেনিসে গেছেন।"

"তুমি কেন গেলে না তবে? এই তো অন্যায় কর। তোমার নাম হোলো শৈলশ্রী অর্থাৎ শৈললক্ষ্মী, এখানকার সকলের মনে আনন্দ দেবে, তা নয় তুমি চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকবে, একি ভালো?"

"আর আনন্দ দিয়ে কাজ নেই এখন। সেজন্য সারা বছর প'ড়ে রয়েছে, এখন আমি কোথাও যাবোনা।"

"ওই তো, ওইখানেই একটু বাঁকা আছে। জানো না সেই বাউল আমায় বলেছিল? আমি বাউলকে বল্লুম, আচ্ছা তোরা যে বলিস সবাই সমান, সবাইকে তোরা ভালবাসবি, তবে যাদের সঙ্গে তোদের বনেনা তাদের ঘরে কেন ভিক্ষে নিস না? এটা কি উচিত করিস? সে বল্লে, হ্যাহেন কত্তা, বুঝি তো সব, তবে ঐখানটায় একটু বাঁকা আছে। তা তোমারও হয়েছে তাই, বোঝ সব, যে

পাঁচ জনের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করা, যাতায়াত, এসব কর্তব্য কর্ম, কিন্তু বুঝলে কী হয়, ঐখানটায় একটু বাঁকা আছে।"

টেনিস্ শেষ ক'রে সবাই এলেন। সেদিন আবার সম্পূর্ণ গীতাঞ্জলিটা পড়েছিলেন।

একজন খাদ্যবিজ্ঞান বলে একটা বই পাঠিয়েছেন, সকাল থেকেই বইটা পড়ছেন। "দেখ সায়েন্স আমার খুব ভালো লাগে, আর তোমাদের খালি ভালো লাগে রোম্যান্টিক জিনিস। এই যে সবুজ পাতা ঝির ঝির করছে হাওয়ায়, এর প্রত্যেক নড়ার সঙ্গে সূর্যালোক নিচ্ছে ভিতরে, আর তা থেকে তৈরি হয়ে উঠেছে নানা রকমের জিনিস—কি আশ্চর্য অদৃশ্য ব্যাপার চলেছে সমস্ত প্রকৃতির শিরায় শিরায়। ভাবতে গেলে মন বিস্মিত স্তব্ধ হ'য়ে যায়। বড় বিস্ময় মানি হেরি তোমারে—বড় বিস্ময় মানি।"

সেদিন সারাদিন খাদ্যবিজ্ঞান নিয়ে চল্ল—থেকে থেকেই একটা না একটা কথা শোনাচ্ছেন—"ওগো সীমন্তিনী, শুনে যাও, বইতে না লিখে দিলে তোমরা তো আবার মানতে চাও না। এই দেখ লিখেছে বিস্কুটের চাইতে মুড়ির উপকারিতা বেশি—মুড়ির যেটা প্রধান উপকারিতা সেটা লেখেনি যদিও, সে হচ্ছে, অর্থের দিকে। সেই জন্যেই তো আমি মুড়ি খাই। দিশি খাবারের দিকে আমার একটা ঝোঁক আছে, খৈ মুড়ি নারকোল এই আমার ভালো লাগে, আর তোমাদের চাই চীস্, বিস্কুট, এগ্‌স্ অ্যাণ্ড বেকন, সারডিন আর সামন্, আর কত বলব—আমাদের বড় কর্তার বিশেষ ক'রে এই সবই পছন্দ। উঁচু দরের পছন্দ। তিনি অক্সোনিয়ান কিনা, আমাদের বলডুইনের ও সব বালাই নেই, হ'লেই হ'লো, সাম্যবাদী পছন্দ তার, আমার মত অনেকটা। দেখ একটা জিনিস আনিয়ে দেবে? এই বইতে লিখেছে তার উপকারিতার কথা। কত আর বলব, লজ্জায় মরে যাই।"

"আহা বলুন না কি জিনিস—"

"ওই যে তোমার দুগ্ধ-শর্করা না কি বলে?"

"ও, sugar of milk, তার জন্য এত ভাবনা কি, বাড়িতেই রয়েছে।"

"ও বাবা ভাবনা নয়? ভয়ঙ্কর ভাবনা—ভাবতে ভাবতে দুর্বল হ'য়ে পড়ছি। এখন দুগ্ধ আর শর্করা নয়, দুগ্ধ-শর্করা খেয়ে গায়ে জোর করতে হবে।"

খুকু এলো—"মা তুমি কোথায়, আমি খুঁজে বেড়াই।"

"দেখ মিঠুয়া, তোমার মা যদি আত্মগোপন ক'রে থাকেন সে তিনি স্বেচ্ছায়, সানন্দে করেছেন, আমি তার জন্যে দায়ী নই।"

"দাদু একটা গান কর না, কি তুমি বাজে বক্‌চই বক্‌চই।"

হেসে উঠলেন। "এইবার একটা কথার মত কথা বলেছ মিঠুয়া, দাদু এত বাজে বকতেও পারে—চিরজীবন ধরে বকেই চলেছে বকেই চলেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি হয়েছে জমা। এখন তার ভার সামলানো দায় হয়েছে, বিশ্বভার—ওই দেখ আবার বুঝি বকুনি শুরু হয়—তার চেয়ে গানই ভাল।"

সেদিন একটা হিন্দুস্থানি গান করেছিলেন—তোমার ওই পাগড়ির রংএ রাঙিয়ে দাও আমার ওড়না।

'বল্‌মারে চুনরিয়া মুহ্‌কা লাল রঙ্গাদে
য্যায়সে তেরি পগ্নিয়া…
অ্যায়সে মোরিরে চুনরিয়া…'

এই গানটি আরো বহুবার তাঁর কাছে শুনেছিলুম, মনে পড়ে তার সুন্দর সুরের রেশ।

একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ কথায় কথায় গল্পগুচ্ছের গল্পের কথা উঠল। "যদি কিছু না মনে করো তবে সন্ধ্যেবেলা তোমাদের গল্প প'ড়ে শোনাব। আমার নিজেরই মনে নেই বিশেষ, পড়তে গেলে আবার মনে পড়বে।" সেদিন পড়লেন 'অপরিচিতা'—সেই গল্পের মধ্যে যেখানে আছে—"এমন সময় সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে

কে বলিয়া উঠিল—শীগ্‌গির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে। মনে হইল যেন গান শুনিলাম। বাঙালী মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর, এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়।…আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম…ওগো সুর, ওগো অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি আমার চির পরিচয়ের আসনটির উপর বসিয়াছ।"

…"বাবাঃ, নিজের জাতকে কি ঠোকনই দিয়েছি, আর তোমাদের কী স্তুতি! ঐ জন্যই তো বাঙালী মেয়েরা আমায় পছন্দ করে, আর তাই নিয়ে তাদের কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়! কণ্ঠস্বরের যে বর্ণনা করলুম এগুলো কি অত্যুক্তি নয় বলবে? কৈ শুনতে তো পাইনে এরকম অনির্বচনীয় মধুর স্বর! যে সব স্বর শুনি তা…থাক্‌গে আর বলে কাজ নেই, কে আবার কি ভাবে নেবে।"

সকাল সাড়ে ন'টা দশটার সময় খাওয়া হ'য়ে গেলে বসবার ঘরে এসে বসতেন একটা চৌকিতে, হাতে থাকত একটা বই বা কোনো মাসিকপত্র—রেডিওতে বাজত সুশ্রাব্য অশ্রাব্য মেশান প্রোগ্রাম, কিছু শুনতেন, কিছু শুনতেন না। "ইয়োরোপের সঙ্গীত শুনছিলুম গো আর্যে, কী আশ্চর্য এই যন্ত্রটা। কোন সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হ'য়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। সে দেশে এখন কত কাণ্ডই চলেছে, মারামারি হানাহানি, সব পার হ'য়ে আসছে একখানি সুর, তার মধ্যে একটুও ছায়া পড়েনি সেখানকার জীবনের। যেখানে এই গান গাওয়া হচ্ছে সেখানেও তো নানা রকম ব্যাপার চলেছে, নানারকম ঘটনা প্রবাহ। কত লোক আসছে যাচ্ছে—যে গান গাইছে তারও একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে সমস্তকে বাদ দিয়ে একটি সকল-সম্পর্ক রহিত নিরাসক্ত সুরের ধারা প্রবাহিত হ'য়ে আসছে। মনে পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম, চারিদিকে জল ব'য়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা

যায় বালির চর ধূ ধূ করছে, আমি লিখেই চলেছি লিখেই চলেছি "মানসী" (মানস সুন্দরী)। যখন শুরু করেছিলুম তখন ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, তার পর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল আলো, আকাশ রঙীন ক'রে অস্ত গেল সূর্য। একটি মাত্র চাকর বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী, সে কখন নীরবে মিটমিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি—মানসী। আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে ছন্দ-বন্ধ-গ্রন্থ-গীত এসো তুমি প্রিয়ে। কোথায় গেল সেই দিন। সেই পদ্মার চর, ধূ ধূ করে সোনালী বালি, সেই মিটমিটে শিখার ম্লান আলো, সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে, শুধু আছে মানসী, তার যে পরিবেশ ছিল সে তো লুপ্ত হ'য়ে গেল—এমন কি তার থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে তার কবিও। চারিদিকেও সমস্ত সূত্র তার ছিন্ন, সে শুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী।···তোমার এই রেডিওর গান শুনছি আর এই সব ভাবছি।"

সেই দিন একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখেছিলেন এ বিষয় নিয়ে। তারপর পরিবর্তন করতে করতে একটা কবিতা থেকে দুটো কবিতা হয়। তার একটি "সাড়ে ন'টা" নামে 'নবজাতকে' আর একটি "মানসী" নামে 'সানাইতে' প্রকাশিত হয়েছে। সাড়ে ন'টায় আছে :—

"বৈঠকখানা ঘরে রেডিয়োতে
সমুদ্র পারের দেশ হ'তে
আকাশে প্লাবন আনে সুরের প্রবাহে
বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে।
দেহহীন পরিবেশ হীন
গীত স্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে···
একাকিনী বহি রাগিণীর দীপশিখা
আসিছে অভিসারিকা
সর্বভারহীনা
অরূপা সে অলক্ষিত আলোকে আসীনা।

গিরি নদী সমুদ্রের মানেনি নিষেধ
করিয়াছে ভেদ
পথে পথে বিচিত্র ভাষার কলরব
পদে পদে জন্ম মৃত্যু বিলাপ উৎসব।
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সঙ্গীতের ধারা।
… … … যক্ষের বিরহ গাঁথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি-অদ্ভুত
বাণীমূর্তি সেও একা—
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ… …"

"যখন মেঘদূত রচনা হয়েছিল তখনও তো চলেছিল সংসারচক্র, কত লোকের যাওয়া-আসা, সে সব চিহ্ন লুপ্ত হ'য়ে গেছে। এই আজ এই লেখাটা লিখলুম, কিছুদিনের জন্য এও কালের সমুদ্রে সাঁতার দেবে, কিন্তু এই আজকের নীলাকাশ ওই রেডিওর গুঞ্জনধ্বনি তোমাদের যাওয়া আসা এবং আমারও সব চিহ্ন লুপ্ত হ'য়ে যাবে। ইতিহাস তাদের গ্রহণ করবে না। সেই পদ্মার দিনগুলো মনে পড়ে, তারা শূন্যে মিলিয়ে গেল। তাই লিখেছি…

কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষ স্পন্দে কম্পমান সেই স্তব্ধরাতে
সেই সন্ধ্যাতারা
জন্ম সাথী হারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছু দিন তরে
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী

সেদিনের দিনান্তের মগ্ন স্মৃতি হোতে
ভেসে যায় স্রোতে।

বেশ স্পষ্ট হয়েছে তো কথাটা? আমার আবার ওই ভয় করে যা বলতে চাইলুম বলা হোলো কিনা। খামকা দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠলে রচনার অর্থই থাকে না।"

"তোমার সিঁড়ির টবের এগুলো কি ফুল? আমি রোজ ভাবি জিজ্ঞাসা করব, মনে থাকে না, এদের কথা লিখতে হবে।"

"ও লাল জিরেনিয়াম।"

"এই বুঝি জিরেনিয়াম? তাইতো, গল্পে পড়েছি এ ফুল ওরা জানালার সীলের উপর রাখে, আর তার আড়াল থেকে নায়িকা নায়ককে রাস্তায় দেখতে পায়!"

এই টবগুলির কথা ওঁর অনেক দিন মনে ছিল। দুটো কবিতায় এদের কথা আছে। একটা সানাইতে প্রকাশিত "স্মৃতির ভূমিকা," আর "মনে পড়ে তোমাদের নিভৃত কুটীর" ব'লে একটা কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন, তাতে।

"এ পদার্থটা কি?"

"আপেলের রস।"

"আহা শুনে কান একেবারে জুড়িয়ে গেল, কবিত্ব জাগ্রত হ'য়ে উঠছে,—দ্রাক্ষারসের কাছাকাছি, আপেলের রস, আমাদের নীলরতনবাবুর আবিষ্কার,—মোটেই সুখাদ্য নয় তা বলে রাখছি। তোমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে তো? তোমাদের যে দিনটা কখন কী রকম ভাবে চলেছে কিছুই বুঝতে পারি নে। আমার সঙ্গে তার এত তফাত। আমার যখন মঙ্গলবারের দুপুর বেলা তোমাদের সবে তখন সোমবারের সকাল হয়েছে—আমার যখন চায়ের আয়োজন চলেছে, ফস্ ক'রে শুনলুম তোমাদের তখনও খাওয়াই হয় নি। এখন কার্তারা সব কোথায়? নিদ্রা দিচ্ছেন?"

"না আড্ডা দিচ্ছেন।"

"সে তো অতি উপাদেয় ব্যাপার, এখানে এসে আড্ডা দিলেই পারতেন। আমিও যোগ দিতুম। না না সে হবে না, তাঁদের আবার আর একটা ব্যাপার আছে, সে আমার সামনে চলবে না। আর তুমি কি করছিলে, আড্ডা দিচ্ছিলে, না চিঠি লিখছিলে মাসীর কাছে?"

"মোটেই নয়, আমি আপনার কথা লিখছিলুম। আপনি সব সময় যা বলেন, সময় পেলেই লিখে রাখি।"

"বল কি, তোমার সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করব তাহ'লে। তুমি বার্গেগুির কথা সুদ্ধ লিখে ফেলবে, তখন পস্‌টেরিটি কি বলবে? তোমার মনে যে এ আছে কে জানত? এবার থেকে তো তাহ'লে তোমার সঙ্গে সর্বদা কাব্য রচনা ক'রে কথা বলতে হবে, কি সাংঘাতিক অবস্থা হবে তাহ'লে।"

"মোটেই নয়—কাব্য তো ঢের রচনা হয়েছে—আপনি আমাদের সঙ্গে যা কথা বলেন সর্বদা, তাই লিখে রাখি আমার নিজের জন্য, যখন শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন তখন পড়ব।"

"কিংবা যখন আরো দূরে চলে যাব আর মোটেই কথা বলব না, তখন তুমি এই বারান্দায় ব'সে ব'সে পড়বে আর ভাববে লোকটা ছিল মন্দ নয়, গালমন্দ যাই দিক, মোটের উপর ব্যবহারটা ছিল চলনসই।"

"আচ্ছা সে থাক, এখন দিন, copy করব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, এ সব অলক্ষুনে কথা ব'লে কাজ নেই, বালাই ষাট, আমার মাথার যত চুল তত বছর আপনার পরমায়ু হোক্। কেমন ঠিক হচ্ছে না? এক এক সময় আমার মনে হয় যে, অনেক কথা হারিয়ে গেছে যা থাকলে ভালো হোতো। বিশেষ ক'রে ইয়োরোপে, কত বড় বড় মনীষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, কত বিষয়ে কত আলোচনা হয়েছে, সে সব যদি লিখে রাখত কেউ ভালো হোতো, কিন্তু তক্ষুনি না লিখলে সে হয় না—পরে যারা বানিয়ে বানিয়ে লেখেন, আমি দেখি সে আমার কথা নয়—আমার ভাষাই নয়—বিদেশে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে যা রাখবার যোগ্য ছিল।

যাক এখন আর সে ভেবে কি হবে—যা যাবার তা যাবেই—যা হারিয়ে যায় তা আগলে ব'সে রইব কত আর! বোঝা যে কত জমেছে, পুঞ্জীভূত বোঝা! তাহ'লে এই কবিতাটা copy ক'রে ফেল, তোমার মংপুর সকাল বেলার একটা ছবি। আজ সকালে হঠাৎ একটা প্রজাপতি আমার চুলে এসে বসল। চুপচাপ ক'রে রইলুম পাছে ওকে চমকে দিই—পড়ি শোন—

আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্ন ছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্র পুঞ্জ আছে ভরি
সারা বেলা ধরি
কোন পাখী আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলী,

হঠাৎ কি হলো মতি
সোনালী রঙের প্রজাপতি
আমার রূপালী চুলে
বসিয়া রয়েছে পথ ভুলে
সাবধানে থাকি লাগে ভয়
পাছে ওর জাগাই সংশয়
ধরা প'ড়ে যায় পাছে আমি নই গাছের দলের,
আমার বাণী সে নয় ফুলের ফলের,
চেয়ে দেখি ঘন হ'য়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড়
সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা অবেলায়
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।

হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইসারা
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষায়। নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি

নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক
নিঝ'রিণী সর্পিনীর দেহচ্যুত ত্বক্।
এখনি এ আমার লেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি। বাড়ির সিঁড়ির পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জিরেনিয়ামের গন্ধ
শ্বসিয়া নিয়াছে মোর ছন্দ।
এ চারিদিকের এই সব নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে,
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে ক'দিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকাব।"

"আজ শোবার আগে বেঞ্জারস্ ফুড আনব?"

"আহা আনবে বৈকি! যখন এত মধুর ক'রে বলবার চেষ্টা করলে তখন বেঞ্জারস্ ফুড্ কেন, বার্গেণ্ডি দিলেও চলবে। স্পার্কলিং বার্গেণ্ডি!"

"আর তো বাঁচিনে!"

"আমি বা বাঁচি কি করে···এমনিতেই তো তোমার এখানে চারিদিক শুকনো, এতদিন ধ'রে এত hint দিচ্ছি কোন ফলই হয় না, ও Radox bath salt আসছে, sugar of milk আসছে, কিন্তু আসল জিনিসের বেলা একেবারে চুপ!" কীর্তনের সুর করে গেয়ে উঠলেন—"না খেলে মদ, না খেলে মুর্গী, না দিলে ছুটো ইয়ারকি, ভবে এসে করলে কি, জয় যদুনন্দন?"

"এখন বারান্দায় যাবেন? রেডিওতে আপনার গান গাইবে, এ ভদ্রলোক ভাল্লো গায়।"

"কি গান বল?"

"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই। আজ ভারি সুন্দর জ্যোৎস্না বাইরে।"

"চল চল, কেন তবে আমাকে ঘরে পুরে রেখেছ? অত্যন্ত বিশ্রী objectionable ব্যবহার তোমার। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই

যে রয় মনে আমার মনে! সে আছে···সে আছে ব'লে···আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে···প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে, আমার বনে।···সে আছে ব'লে চোখের তারায় আলোয়, এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়,···চলগো তোমার জ্যোৎস্না দেখিগে, অসীম সাদায় কালোয়।"

বারান্দায় চৌকিতে এসে বসলেন। এক টুকরো কালো মেঘ হঠাৎ আচ্ছন্ন ক'রে দিল আলো। "কৈ তোমার অপূর্ব জ্যোৎস্না কৈ? ওগো গৃহস্বামী, একবার এসতো এদিকে, এর একটা বিচার কর। তোমার গৃহিণীর ব্যবহার যে ক্রমেই দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠছে। ইনি বললেন বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখি চমৎকার অন্ধকার! ভালো বিপদে পড়েছি। এমন লোককে নিয়ে তোমার চলে কি ক'রে?"

"কি গো আজ সারা সকাল যে পদচারণাই চলেছে। মাসী আসবার আগে তো ভগ্নীকে কখনো ব'লে ব'লে ঘর থেকে নড়ান যেত না। একি স্বাস্থ্যচর্চা না মনশ্চর্চা?"

"মনের চর্চাই বেশি।"

"তাই বল, কাল কত রাত্রি অবধি চলল তোমাদের?"

"না সে বলব না, আপনি ঠাট্টা করবেন।"

"ঠাট্টা? অসম্ভব! সে আমি শপথ ক'রে ছেড়ে দিয়েছি— তোমার কাছে থেকে আমার অসম্ভব রকম নৈতিক উন্নতি হচ্ছে, এবার থেকে মাষ্টার মশাইএর মত ধমক দিয়ে ছাড়া কথাই কইব না।"

"আড়াইটে অবধি গল্প করেছি কাল।"

"ও বাবা বল কী—কী এত গল্প হয় তোমাদের? উনি ওঁর কথা বলেন আর তুমি তোমার কথা বল, এই তো? তোমরা মেয়েরা পারো বটে গল্প করতে, অকারণ হাসি অকারণ গল্প, আর

একটা আছে অকারণ কান্না। আড়াইটে অবধি গল্প করলে, আমায় ডাকলে না কেন? আমিও গল্প করতুম।"

"তাহলে আর আজ গল্প করতে হোতো না।"

"তা বটে, সেই গল্পই শেষ গল্প হোতো। যেমন শেষ গল্প করেছিলুম সুধাকান্তর সঙ্গে, গল্প করতে করতে অতলে ডুব দিয়েছিলুম।* তবে করেছি, আমরাও একদিন গল্প করেছি যখন সুদিন ছিল, এক এক দিন রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেছে গল্প শেষ হয়নি। সেই যে কি কথাটা, অবিদিত গত যামা..."

"কার সঙ্গে বলুন?"

"ওই দেখ, একবার রোম্যান্সের গন্ধ পেলে হয়।"

"আপনার ছোটবেলার গল্প বলুন।"

"সে তো সব লিখেছি, জীবনস্মৃতি পড়গে।"

"সে শুনতে চাইনে।"

"কি শুনবে তবে, আমার রোম্যান্টিক লাইফ? আমাদের কি আর এ যুগের মত এত সৌভাগ্য ছিল গো—সমস্ত দেশে স্ত্রী জাতিই ছিলনা। এখন যে দলে দলে বেণী দোলান মূর্তি দেখা যায় আমাদের দিনে সব অদৃশ্য ছিল, সমস্ত দেশ ছিল ঘোরতর রকম আদর্শবাদী। তোমাদের মত এ রকম রোম্যান্স ক'রে বেড়াবার সুযোগ পাব কোথায়?"

"বেশত আপনি! আমরা রোম্যান্স ক'রে বেড়াই? শেষটায় একটা অপবাদ রটবে।"

"এই দেখ ফস্ ক'রে কখন কি বলে ফেলি। সত্যি কথাই বুঝি বা বলে বসি! যাক্‌গে, তুমি কিছু ভেবোনা, ডাক্তারের সামনে এসব কথা তুলবই না, একেবারে চুপ।...এই যে মাসী, এসো এসো—মাসীকে দেখলে মনে হয় উনি গুহাহিত হ'য়ে তপস্যা

---

* প্রথম ইরিসিপ্লাস অসুখের দিন রাত্রে গল্প করছিলেন সুধাকান্ত প্রভৃতির সঙ্গে। তাঁরা চলে যাওয়ার পর উনি সেই ভাবে চেয়ারে বসে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

করছিলেন, এই মাত্র উঠে এলেন—তুমি রাত দিন ওই ঘরটার মধ্যে বসে কি কর? তাইত তোমাকে দেখলেই গাইতে ইচ্ছে করে—আকুল কেশে কে আসে চায় ম্লান নয়নে ও কে চির বিরহিণী—"

"এ কি আপনি এখনো রস খাননি?"

"আরে রাখো তোমার রস। আমি বলে মনে মনে সাহিত্য আলোচনা ক'রে চলেছি, প্রশ্নোত্তর যাকে বলে···। মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্‌টেরিটির পথে, স্বপ্ন মনোরথে। যে কাল এখন দূরবর্তী ভবিষ্যৎ সেই কাল তো একদিন বর্তমান হ'য়ে আসবে, বসে বসে তাই ভাবছি, আজ যে চিন্তাকে, যে রূপকে, যে expression-কে এত মূল্য দিচ্ছি, সব মূল্য তখন চুকে যাবে? এই যে আজকাল এক তর্ক উঠেছে আধুনিক আর পুরোনো নিয়ে, এর যথার্থ কোনো অর্থ আছে কিনা ভাবি। যা নতুন তাই জায়গা পাবে আর যা পুরোনো তাকেই স'রে যেতে হবে তা তো বলা যায় না। নতুন বলেই প্রমাণ হয় না তার অসংশয় শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু মানুষের মনের কি এতই পরিবর্তন হয় সত্যি, যে কাল-নিরপেক্ষ হ'য়ে সাহিত্যের কোনো স্থায়ী-মূল্য থাকে না? যারা পূর্ববর্তী তারা পরবর্তীদের বলে, ওরা অর্বাচীন ওরা কিই বা জানে। আর যারা আধুনিক তারা বলবে ওসব পুরোনো কথা, ওতে আর ধার নেই। যেমন ধর আমাদের সময় যখন গান হোতো—আরে রে লক্ষ্মণ একি অলক্ষণ। একি বিলক্ষণ দুর্লক্ষণ জানকীরে দিয়ে এসো বন···আহা ছি ছি একি অগণ্য কাজে জঘন্য সাজে ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম আহা অপার জলধি কেন বাঁধিলাম···বাঃ বাঃ এ গান শুনে আসর মেতে উঠত। ঘন ঘন হাততালি আর বাহবা। "ক্ষণ ক্ষণ ক্ষণ"তে মাতিয়ে দিত একেবারে। তখনকার তাঁদের কাছে, 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' একেবারেই নীরস—অলঙ্কারবর্জিত সাদা কথা ব'লে না ঠেকেই পারে না—এ আবার কি একটা কবিতা হোলো? কি না, গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা। আছ তো আছ, ভরসা নেইত কী আর করা যাবে। আর এর সঙ্গে

একবার তুলনা কর দেখি—ভবে শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে···বাহবা—রস একেবারে উথলে উঠত। কী অলঙ্কার কী ঝঙ্কার! কিন্তু অস্বীকার করতে তো পারিনে যে আমরা একে তেমন জায়গা দিইনে—সাহিত্যের পংক্তিতে এর স্থান নির্দেশ ক'রে দিই ওই নীচের তলায়। এর মধ্যে যে একান্ত কৃত্রিমতা আছে যাকে তোমাদের স্বদেশবাসীরা বলেন 'ক্রিত্রিমতা' (ঋফলা—উচ্চারণ বাঙ্গালীরা ্র ফলার ন্যায় করেন এই তাঁর অনুযোগ ছিল।) সেটা আমাদের খারাপ লাগে। যে রস সৃষ্টি করে তা নেহাতই খেলো। তেমন একদিন হয়তো আসবে যখন আজ যা লিখছি, যা তোমাদের ভাল লাগছে, তা তাদের ভালো লাগবে না। এর মধ্যেও হয়ত অনেক কৃত্রিমতা অনেক নিকৃষ্ট জিনিস মুখোস প'রে বসে আছে যা তোমরা ধরতে পারনি, তারা উদ্‌ঘাটন করবে। এই তোমার খুকু যখন বড় হ'য়ে একজন সমঝদার হ'য়ে উঠবেন, তখন তোমায় বলবেন, মা তোমরা কী যে ছিলে, দাদু এমনই কি লিখতেন যে তোমরা একেবারে গদগদ হ'য়ে উঠতে! ওর চেয়ে আমাদের পঙ্কজাক্ষবাবুর লেখাটা দেখতো কত সহজ স্বাভাবিক—আমাদের তো ওঁর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা ভালোই লাগে না। তবে দাদুর কপালে এ ভালো যে তখন গদগদ হবার জন্য মা ছিলেন, নাতনী ছিলেন না। নগদ বিদায় তো অনেক হলো তবে আবার ভবিষ্যতের ভাবনা কেন? কিন্তু তবুও ভাবি এও কি সত্য হ'তে পারে, সাহিত্যের মধ্যে সময়নিরপেক্ষ চিরন্তন কিছুই নেই? যা ভালো তা চিরকালের ভালো? আজের আগেও আজ ছিল, তখন যা এত ভালো লেগেছিল আজ সে মিথ্যা হ'য়ে গেল? আজ যেটা ভালো লাগছে কাল তা মিথ্যা হয়ে যাবে? তাহ'লে এমন কিছুই নেই যা চিরকালকে সুদূর পস্‌টেরিটিকে উপহার দিতে পারি, যা যথার্থই 'সময়হারা'? এই সব কথা আমি মনে মনে প্রশ্নোত্তর ক'রে চলেছি, এমন সময় তুমি নিয়ে এলে চাল কুমড়োর রস—সংসারে ওর নিত্যতা কতটুকু? সেই যে

অপরাজিতাকে লিখেছিলুম, কি হে বলনা, নিশ্চয় মনে নেই তোমার”—

“কোনখানটার কথা বলছেন? ‘মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ, স্থায়ী যাহা আর যাহা থাকার অযোগ্য, সকলি আহুতিরূপে পড়ে তার শিখাতে, টিকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিকাতে, ছাই হ’য়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে, আপনার কথা সে তো কহিবেই কহিবে।’ এই খানটা কি?”

“হাঁগো, এইটাই সত্যি কথা, জীবনটা মরণেই যজ্ঞ, নম্র হ’য়ে একথা মেনে নেওয়াই উচিত। আর তাই যদি হয়, তাহ’লে রসটা খেয়ে ফেল্লেই তোমার সঙ্গে সব ঝগড়া চুকে যায়।”……

“তোমাদের অত সমারোহ চলেছিল কিসের সন্ধ্যাবেলায়? কিছুতো পড়াই হ’ল না।”

“গাঙ্গুলী হারিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী তাই ব্যস্ত হ’য়ে এসে উপস্থিত।”

“হারিয়ে গিয়েছিলেন অর্থ?”

“ঠিক হারান নয়। দার্জিলিং গিয়ে ফিরতে একদিন দেরি হয়েছিল।”

“যাক এখন Return of the prodigal-এর পালা চুকে গেছেতো?”

“এত গোলমাল হচ্ছিল বুঝতে পারেন নি?”

“বুঝব কি ক’রে? ভাবলুম বন্ধুবান্ধব লোকজন এসেছে, রহস্যালাপ হচ্ছে। তোমাদের কণ্ঠস্বর এত মধুর যে ব্যাপারটা শোচনীয় না বিবাহ-উৎসব তা বুঝতে পারিনি—গলায় যা মাধুর্য ছড়ায় তাতে আলাপ কর কি বিলাপ কর বোঝা কঠিন।”

“আশা করি এটা ঠাট্টা।”

“ঠাট্টা হ’লেও জানি সত্যি ভেবে নেবে, মেয়েরা কখনো স্তুতিবাদকে ঠাট্টা ব’লে হাত ফস্‌কে যেতে দেয় না, যত thick ক’রেই butter মাখাও না কেন, অরুচি নেই। হয়ত একটু

ছলনা ক'রে বলবে 'আহা ঠাট্টা করেন কেন'—আমি বলি অত মিষ্টি ক'রে কিছুতেই বলতে না, যদি না একটু বিশ্বাস থাকত।"

"এবার আমি সত্যি সত্যি রেগে যাচ্ছি কিন্তু।"

"আহাহা চট কেন, individualএর কথাতো হচ্ছে না, এ একটা general ভাবে বলা। তোমার কথা যদি বলো, তুমি কি কখনো···না এখন আর চলবে না—। যাক এখন গাঙ্গুলী-পত্নীর ভাবনা ঘুচেছে তো? তোমরা এত অনাবশ্যক রকম ভাবো, ওতে অপর পক্ষকে বড় বাধাগ্রস্ত করা হয়।"

"আমাদের দেশে মেয়েদের অপর পক্ষের সঙ্গে যে রকম শক্ত বাঁধনে বাঁধা হয়েছে সে বন্ধনের ফল উভয়পক্ষকেই ভুগতে হবে বৈকি!"

"আচ্ছা স্বামী-বিয়োগ হ'লে স্ত্রীর বেশি কষ্ট, না স্ত্রী-বিয়োগ হ'লে স্বামীর?"

"বিধবার দুঃখের সঙ্গে তুলনা কি—স্বামীদের কি বা ক্ষতি?"

"কিন্তু আমি তো দেখি বিধবারা দীর্ঘায়ু হয়।"

"সে সত্যি। বোধ হয় শুদ্ধাচারে থাকে ব'লে, একবার বিধবা হ'তে পারলে মরা শক্ত হয়।"

"শুধু তাই কি? আমার তো মনে হয় স্বামীর যে একটা প্রকাণ্ড বোঝা তাকে বহন করতে হোতো, সেটা নেমে যাওয়ায় অনেক ভার লাঘব হয়। তখনকার মুক্তি শরীর মনের একটা বিশ্রাম আনে বৈকি। সত্যি জানো, সেন্‌সাসে দেখা গেছে যে widowerরা মরে বেশি। বোধ হয় তাদের যে ভারটা স্ত্রীরা বহন করত সেটা নিজেদের করতে হয়। নিজের বোঝা, বড় দুর্বহ বোঝা। স্ত্রীর অভ্যাস, বড় বিশ্রী অভ্যাস, একবার হ'লে আর রক্ষে নেই। সেই জন্যেই তো স্ত্রী মরতে না মরতে আবার সব বিয়ে করতে ছোটে। বিশেষ ক'রে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে সে এক ভীষণ বিপদ। কে দেখবে, কে খাওয়াবে, কে মানুষ করবে, সে কি পুরুষের কাজ? বিশেষত যারা নিজেদের

সংসারের সঙ্গে খুব জড়িয়ে রাখে, তাদের বিপদ আরো বেশি।”

কিছুক্ষণ চুপ ক’রে রইলেন। মহাদেব চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো। বুঝলুম কিছু ভাবছেন অন্যমনস্ক ভাবে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, “অবশ্য আমার নিজের কথা একেবারে অন্যরকম ছিল, আমি কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলিনি সংসারে। কোনো কিছুতেই আবদ্ধ হ’য়ে পড়া আমার স্বভাব নয়।”

“কিন্তু আপনাকে তো সংসারের ভার একলাই বহন করতে হয়েছে?”

“তা তো হয়েছেই। এদের প্রত্যেকের সমস্ত ব্যবস্থা, পড়ান, বিবাহ, এমন কি তিনটি সন্তানের মৃত্যুর দুঃখও একলাই বহন করতে হয়েছে। ঠিক মনে নেই, বেলার বিবাহ বোধ হয় তাঁর মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল। সবই করেছি কিন্তু জালে জড়াইনি। দূরের থেকে করেছি। ছেলেদের মানুষ করা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সে করেছি, কিন্তু সে যেন একটা intellectual task, সেটা বুদ্ধির বিচার বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মত ভাবেই। রথীদের পড়াতে গিয়েই তো শান্তিনিকেতনের শুরু হোলো। তখন অবশ্য তিনি ছিলেন এবং যোগও দিয়েছিলেন আমার কাজে। এখনকার ছেলেমেয়েদের মত আমরা অত খুঁতখুঁতে ছিলুম না। আধুনিকভাবে আমাদের বিবাহ হয়নি তো, তাতে কিছুই এসে যায়নি। একটা গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তিনি তো চেয়েছিলেন আমার শান্তিনিকেতনের কাজে সঙ্গিনী হবার। বিশেষ ক’রে ইদানীং, অর্থাৎ শেষের দিকে তাঁর একটা একান্ত আগ্রহ হয়েছিল কাজ করবার। কিন্তু সে তো হোলো না, অল্প পরেই তাঁর সেই ভয়ানক অসুখ হোলো।”

“আপনার খুব অভাব বোধ হয় নি?”

“ঐ যে বললুম চিরদিন আমি একটা জায়গায় উদাসীন নিরাসক্ত ছিলুম। সেইটেই আমার স্বভাব। ভিতরে ভিতরে দূরে থাকবার

একটা অভ্যাস ছিল সব কিছু থেকেই। তা ছাড়া যখন তিনি চলে গেলেন তখন আমার এক মুহূর্ত অবসর ছিল না। শান্তিনিকেতন শুরু হয়েছে, হাতে পয়সা নেই, ঋণের পরে ঋণ বোঝার মত চেপে রয়েছে, কাজের অন্ত নেই। তখন নিজের সুখদুঃখকে কেন্দ্র ক'রে মনকে আবদ্ধ করবার অবসরই বা কোথায়। মেজো মেয়ে মৃত্যুশয্যায় আলমোড়ায়। তাকে ফেলেও বারে বারে আসতে হোতো শান্তিনিকেতনের কাজে। যাওয়া আসা ছুটোছুটি চলছেই। তবে সবচেয়ে কি কষ্ট হোতো জানো, যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। সংসারে কথার পুঞ্জ অনবরত জমে উঠতে থাকে—ঠিক পরামর্শ নেবার জন্য নয়, শুধু বলা, বলার জন্যই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায়,—সেতো আর যাকে তাকে হয় না। যখন জীবনের এই যুদ্ধ চলেছে, কাজের বোঝা জমে উঠছে, মেয়ে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সেইটেই সব চেয়ে কষ্ট হোতো যে এমন কেউ নেই যাকে সব বলা· ·এই যে পটেটো, কি তোমার উদ্দেশ্য কি ? রেডিওটা ভাঙতে চাও ?"

এ সব কথা তাঁর মুখে খুব বেশিবার শুনিনি···অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে দু' একবার মাত্র বলেছেন। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে, নিজের দুঃখ বেদনা সম্বন্ধে, এমন কি শারীরিক কষ্ট সম্বন্ধেও একটা আশ্চর্য রকম নীরবতা ছিল। সেদিন হয়ত আরো কিছু বলতেন, আমি স্তব্ধ হ'য়ে শুনছিলুম। কিন্তু হঠাৎ আর একজনের প্রবেশমাত্র এক নিমেষে সজাগ হ'য়ে উঠলেন। "ওগো কন্যে, তোমার ও যন্ত্রটা গেল···যদি বাঁচাতে চাও তবে এই বেলা আলুর হাত থেকে ওকে রক্ষা কর।"

"ওকি হচ্ছে, আমার সঙ্গে লুকোচুরি ? ফস্ ক'রে মাছ তুলে দিলে থালার উপর ? খাবনাতো আমি।"

"আপনার একি ব্যবহার বলুনতো ? আপনি ওটা নিশ্চয় খেতেন, আমি দিলুম বলেই খাবেন না।"

"নিশ্চয় ভাই,—আমার একটা স্বাধীন ইচ্ছে নেই? তোমরা যা বলবে, আমি তাই করব না, সর্বদা এরকম strongly resist না করলে আমার স্বাধীন মতামত একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে। এমনিতেই তো যা হয়েছে—এখন এটা খান, এখন ওটা খাবেন না, এখন চশমা পরুন, এখন ও জামাটা পরবেন না,—কেন এত অধীনতা আমি সহ্য করব, কেন?"

"আচ্ছা তবে এখন নিন যা আপনার ইচ্ছে।"

"না, কখনও নয়। যখন বল্লে নিজে নিন তখন বলব দাও তুলে দাও।" মহাদেব একটু একটু হাসতে লাগল মুখ টিপে। "এসব আমার বনমালী ভালো বোঝে।"

"চল এইবার স্থির হ'য়ে বসবে, তোমার ছবি আঁকব। অবশ্য আশাও কোরো না যে সে ছবি তোমার মত হবে, কিংবা আশঙ্কা!"

"একটা গল্প শুনেছিলুম, একজন খুব বিশ্রী দেখতে লোক এক বড় আর্টিষ্টকে দিয়ে অনেক খরচ ক'রে ছবি আঁকাল। পরে ছবি আনতে গিয়ে সে চেহারা দেখে চটে অস্থির, বলে এও কি একটা ছবি? তুমি যত বড় আর্টিষ্টই হও I must say it is a very bad work of art! আর্টিষ্ট বল্লে, তা কি করব, you must admit that you are a bad work of nature।"

"দেখ, আমি কখনই তোমাকে একথা বলব না, কিছুতেই না, সত্যি হ'লেও না, মনে হ'লেও চেপে যাব!"

"রজনী শাঙন ঘন
ঘন দেয়া বরিষণ
রিম ঝিম শবদে বরিষে।
রজনী শাঙন ঘন........"

"কাঁচের ঘরে চলে এলুম তোমরা উঠে যেতেই, ভাবলুম বৃষ্টির শব্দ শুনব বসে বসে। কী ঘোর বর্ষাই নেমেছে। কিন্তু বিধাতা তো পথ বন্ধ করেছেন;*—তুমিও এমন এঁটে দরজা বন্ধ করেছ। তাই বসে

---

* ইদানীং কানে কম শুনতেন সে কথার ইঙ্গিত করেছেন।

কুঁড়েমি করছি আর ভাবছি—রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া বরিষণ। ওকি ও, ছেঁড়া কাগজগুলো সংগ্রহ করছ কি জন্য?"

"ছেঁড়া কাগজ কেন, ওতো আপনার লেখা কবিতার টুক্‌রো।"

"ও বুঝি তোমার মিউজিয়ামে উঠবে? তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না। কোথায় ছেঁড়া কাগজ ছেঁড়া জুতা একটুক্‌রা কাপড়, সব জড়ো করছ। তোমার বাড়ি যে শেষটায় বেলুড় মঠ হ'য়ে উঠবে। তারপর আবার এক ডায়েরি আছে তাতে সব ছেঁড়া কথা জমা হচ্ছে। বাড়িটাকে মিউজিয়াম কর ক্ষতি নেই। কিন্তু জীবনটাও মিউজিয়াম ক'রে তুলো না যেন, তোমার কাছে আমার এই মিনতি। সেই যে ক্ষণিকাতে লিখেছি, ফুরায় যা দাও ফুরাতে।"

"তা হোক, ক্ষতি কি, না হয় মিউজিয়ামই হবে আমার জীবন।"

"বিশেষ ক্ষতি, সমূহ ক্ষতি, আমি সেই মিউজিয়ামের মামি হতে চাইনে যে। যে ক'টা দিন থেকে গেলুম তোমাদের সকলকে খুশি ক'রে গেলুম, এইত ভালো, স্মৃতির বোঝা চাপিয়ে কেন ভারাক্রান্ত করব তোমাদের জীবন? এই কয়েকদিনের আনন্দস্মৃতি যদি খুশি হ'য়ে মনে কর সে ভালো, যদি মনে ক'রে খুশি হও সে আরো ভালো, কিন্তু ভার নয়, বোঝা নয়, আমি তোমার জীবনে সমাধি-মন্দির হ'য়ে উঠতে চাইনে এ স্পষ্টই বলে দিচ্ছি, ভীষণ ঝগড়া হ'য়ে যাবে তাহ'লে।"···

"সেই লেখাটাকে ভাগ করলুম।—এখন মন দিয়ে পড়, তারপর যদি খুব কষ্ট না হয় তাহ'লে কপি কর। না না, থাক, তোমায় বড্ড খাটাচ্ছি। তোমরা হ'লে সুকুমারী, তোমাদের দিয়ে কি এই সব দেড়গজ লম্বা কবিতা নকল করান উচিত? আচ্ছা দাও এক বার পড়ে দিই। জানো, এখানে এসে অনেক দিন পর আবার আমি এমন ক'রে পড়ে শোনাই, এক টুক্‌রো লেখা হ'লেও ডাকি তোমাদের, শোনাই। ওখানে আজকাল আর এ হয় না। আসেন সন্ধ্যেবেলা পাঁচজন ভদ্রলোক, কথাবার্তা হয়, পোলিটিক্যাল তর্ক,

সাহিত্য আলোচনাও হয়, আরও নানা রকম গল্প হয় না যে তা নয়—কিন্তু সে অন্যরকম। সেখানে দিনগুলো এ রকম ছুটিতে-পাওয়া-দিন নয়। যখন লিখি আজকাল, ডেকে পাঠাই বাঙালকে, দিই কপি করতে, কিন্তু লিখেই আজকাল ডেকে শোনান, সে আর তো হয় না আজকাল। যাক, লেখা তো লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের, সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুষ।”

“আজ সন্ধ্যেবেলা কি পড়বেন?”

“যা তোমরা অনুমতি করবে।”

“বাঃ, আপনার স্বাধীন ইচ্ছা যা বলবে তাইত?”

“না, এ বিষয়ে আমার স্বাধীন ইচ্ছা নয়। সে কেবল কতটুকু খাব, ঘরে বসব না বারান্দায় বসব, সে সম্বন্ধে। এখানে তোমরা শ্রোতা, স্বাধীন ইচ্ছা তোমাদের পক্ষে।”

“আজ তাহ’লে কবিতা পড়তে হবে।”

“পড়ব, আর তোমাকে ঠকাব, জিজ্ঞাসা করব কোথা থেকে কোনটা বলছি।”

“কখনই পারবেন না। আপনাকে বরং ঠকাতে পারি। আচ্ছা বলুন ‘চাহে নারী তব রথ-সঙ্গিনী হবে, তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে’—কোথায় আছে?”

“এ আবার কোথা থেকে জোটালে, এ তো স্বপ্নেও মনে পড়ে না যে আমি লিখেছি, নিশ্চয় তোমার অতিপ্রিয় কোনো আধুনিক কবির লেখা।”

“আহা তাহ’লে তো আর কথাই ছিল না। আধুনিক কবিদের মাথায় ক’রে নাচতুম।”

“দেখো অতটা করে কাজ নেই। সেটা আবার আমার সহ্য হবে না।”

“আপনার ‘বিচিত্রিতা’ মনে নেই? ওতেই তো আছে—কুমার তোমার প্রতীক্ষা করে নারী, অভিষেক তরে এনেছে তীর্থবারি।”

"এই বইটা একটু আড়ালে র'য়ে গেছে তা জানি। লোকে একে বেশি চেনেনা—আমারও ভালো ক'রে মনে নেই। তোমাকে আর আমার বড় কর্তাকে ঠকান শক্ত।"

"দাহু গান কর"—

"এই দেখ কাণ্ড, এসেই বলে, গান কর। তোমার কন্যার ভাষার পরিধি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত···হয় চকোলেট দাও, নয় গান কর। কি গান করব তোমার মনের মত? কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে নয়ন—না এ গানের এখনও তোমার সময় হয়নি, একটু দেরি আছে, এ এখন তোমার মায়ের অবস্থা।"

গেয়ে চল্লেন—

"যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে···
চারি দিকে সব, মধুর নীরব
কেন আমার পরাণ কেঁদে মরে
কেন মন কেন এমন করে
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়···"

"কী, অত মুহ্যমান হ'য়ে ভাবছ কি?"

"আশ্চর্য লাগছে—আপনি যে আমাদের এই ঘরে আসবেন, এই চৌকিতে বসে গান করবেন, এ কখনো স্বপ্নেও আশা করিনি, কল্পনা করতুম, সে কল্পনা সার্থক হবে কে জানত? আশ্চর্য লাগছে।"

"কী আর করবে বল দুঃখ ক'রে। আগে যা মনেও করা যায় না এমন অনেক শোচনীয় ঘটনা ঘটে যায় জীবনে।"

"আমি কী তাই বল্লুম?"

"কী করে বুঝব বল তোমার মনের কথা, সে সব যে দেবা ন জানন্তি—কত খরচ করাচ্ছি—আজ একটা ছবি এঁকে দিয়ে তোমার আজকের ঋণ শোধ করব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

"ছবি পেলে তো ভালই, কিন্তু ঋণ শোধের ইচ্ছে কেন? না হয় একটু ঋণীই রইলেন।"

"সে হয় না, জানোনা সবাই বলে কবিরা বড় অহঙ্কারী।"

"যারা বলে তারা কি আর কবি কখনো দেখেছে?"

"কেন, তুমি যে কবিকে দেখছ তার অহঙ্কার নেই মনে কর? জানোনা, এক সময়ে আমার স্বদেশবাসীরা আমায় খুবই অহঙ্কারী বলত এবং তার মধ্যে একটু সত্যতাও আছে, আমি কোনদিনই কারও সঙ্গে একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারতুম না। ভদ্রলোকেরা এলেন, আলাপ আলোচনা, গল্প সল্প—এ সবই ভালো লাগে, কিন্তু একটু দূরত্ব আছে আমার স্বভাবের ভিতর চিরকাল। আমাদের বাঙালীদের যে স্বভাব, এই যে দাদা আসুন আসুন, একটু তামাক ইচ্ছে হোক,—এ কোনো দিন করিনি। ফস্ ক'রে দাদা দাদা ক'রে যে গায়ে প'ড়ে আত্মীয় হ'য়ে ওঠা, আমার সে বিশ্রী লাগত। বিশেষ ক'রে আমাদের সময়ে এই রকমই গদগদ ভাবে আলাপের প্রথা ছিল। আমি চিরদিন দূরেই রইলুম, ঠিক মনে প্রাণে স্বদেশী হতে পারিনি, ইচ্ছেও করিনি।"

একটুক্ষণ চুপ ক'রে অন্যমনস্ক হ'য়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—"মনে আছে সেই প্রথম স্বদেশী যুগে নেমেছিলুম তো কাজে, কিন্তু টি কতে পারলুম না, গদ গদ sentimentalism-এ ভারাক্রান্ত সে আবহাওয়া ক্রমে আবিল হ'য়ে উঠল, ধিক্কার এলো মনে। সব বক্তৃতা দিতে উঠতেন—মাটি তো নয়, যেন মা'টি, কেঁদে ভাসায় আর কি। অসহ্য হ'য়ে উঠত আমার। কিছুতেই মিলতে পারলুম না। একটা সত্য আদর্শের দ্বারা চালিত, সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠ, সবল চরিত্র আমাদের দেশে একেবারে বিরল। সে সময়ে আমার শিক্ষা হ'য়ে গিয়েছিল, যখন দেখলুম কত মৌখিক কত ব্যর্থ এসব গদগদ বক্তৃতা! * * * জানো, সেই জালিওয়ানাবাগের ব্যাপারের সময়, তখনও এদেশে ভাল ক'রে খবর পৌঁছয়নি। আমি বোধ হয় চৌধুরীদের ওখান

থেকে খবর পাই, ভাল করে মনে নেই। শুনে যে একটা প্রবল অসহ্য কষ্ট হয়েছিল সে আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হ'তে লাগল—এর কোনো উপায় নেই, কোনো প্রতিকার নেই, কোনো উত্তর দিতে পারব না, কিছুই করতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তাহলে জীবনধারণ যে অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। সেই রাত্রেই ওই চিঠি লিখলুম, রাত চারটের সময় চিঠি শেষ ক'রে তবে আমি শুতে যেতে পেরেছিলুম। কাউকে বলিনি এ বিষয়ে, রথীদেরও না, জানি এসব ব্যাপারে বেশি পরামর্শ কিছু নয়। পাছে কেউ বাধা দেয় এই ছিল ভয়। মনের এমন অবস্থা হয়েছিল যে যাহোক একটা কিছু তার এখুনি করা চাই। সেই সময়ে আমি —কে বল্লুম যে এ ব্যাপার নিয়ে আপনি একটা দেশব্যাপী আন্দোলন এখনই শুরু করুন, কিন্তু তিনি তখন রাজী হলেন না। তখন তাঁর —সঙ্গে কোনো একটা সুবিধের পরামর্শ চলছিল সেটা নষ্ট করতে চাইলেন না, পরে অবশ্য এই ব্যাপারকেই প্রধান প্ল্যাটফর্ম ক'রে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার কী যে আশ্চর্য লেগেছিল বলতে পারিনে। তারপর—কে বল্লুম যে একটা প্রটেষ্ট মিটিংএর ব্যবস্থা কর, আমিও বলব তোমরাও বলবে। সে বল্লে, আপনিই করুন, আমরা না হয় সভায় উপস্থিত থাকব। একে কি বলতে চাও? এই সব হোলো পোলিটিসিয়ানদের পলিটিক্স। সুবিধে বুঝে বুঝে চলতে হবে, এর সঙ্গে কখনো মন মেলাতে পারিনি। অবশ্য এ সব প্রটেষ্ট মিটিংএ যে বিশেষ কিছু ফল ছিল তা নয়, তবু অন্যায়ের প্রতিবাদ যথাসময়ে না করলে সেটা নিজের প্রতিও অন্যায়। যখন প্রতিবাদ মনের মধ্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠছে তখন চুপ ক'রে থাকব, কারণ সেইটেই সুবিধের, তারপর দরকার-মত সুযোগমত প্রতিবাদ করব, এ আমার দ্বারা হবার নয়। সে জন্যে সেই রাত্রেই ওই চিঠি না লিখে আমার পরিত্রাণ ছিল না—নিষ্ফল বেদনা আমার মনকে চেপে ধ'রে ছিল, তার হাত থেকে উদ্ধারের আর কোনো উপায়ই ছিল না। ওদের ওটা খুব অপমান

লেগেছিল। ইংল্যাণ্ডেও দেখলুম তারপরে ওরা সে কথা ভুলতে পারছে না। রাজাকে অপমান কি না, ইংরেজ রাজভক্ত জাত, রাজাকে প্রত্যাখ্যান তাই অত আঘাত দিয়েছিল ওদের। আমি তা আগেই জানতুম এবং সেই জন্যই লিখেছিলুম,—কিছুই তো করতে পারব না, কত ব্যর্থ কত সামান্য আমাদের এ সব নিষ্ফল প্রটেষ্ট, তাই ভেবেছিলুম আমার সাধ্য যতটুকু আছে, যা করাতে সব চেয়ে বেশি আঘাত লাগাতে পারি তাই করব। দেখলুম অনেকদিন পর্যন্ত ওদেশেও ওরা ভুলতে পারে···ওকে ও, অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়ালে? তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি, কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী?"

"অত কবিত্বময় কেউ নয়, আমি।"

"ও তাই বল মাসী, তাহলে তো বলা উচিত ছিল, আকুল কেশে কে আসে চায় ম্লান নয়নে ও কে চিরবিরহিণী।"

"বাঃ, আজ আলো জ্বালা হয়নি কেন? কেউ আসেনি এখনো, আজ পড়া হবে না বুঝি?"

"নিশ্চয় হবে, তোমার ধ্যানভঙ্গ হবে, মৃগচর্ম ছেড়ে এই মরলোকের অভাজনদের কথা মনে পড়বে তবে তো? তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি যে।" সেদিন পড়া হোলো ঝুলন, সুপ্রভাত, আর তপোভঙ্গ।

আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে চেয়ারের পিছনে, শুভ্র চুলের উপর আলো প'ড়ে ফিরে আসে তার আভা। কাব্যগ্রন্থটা হাতে নিয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে একটু একটু হাসছেন। "আজ যদি তোমায় জব্দ না করি! আচ্ছা বল, উদয় শিখরে সূর্যের মত সমস্ত প্রাণ মম, চাহিয়া রয়েছে নিমেষ নিহত একটি নয়ন সম—"

"আহা—

অগাধ অপার উদার দৃষ্টি নাহিক তাহার সীমা
তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা।

এতো 'মানসীর', এ সবাই বলতে পারে।"

মাসীর ততক্ষণ ভয় ঢুকে গেছে—"আমি এ সব পরীক্ষার মধ্যে নেই।"

"না, 'মানসী' চলবে না, ওটা আমারই ভুল হয়েছিল, এ সোজা। আচ্ছা শীগ্‌গির বল—

দেখিতে দেখিতে মোর লাগিল নেশার ঘোর
কোথা হতে মন চোর পশিল আমার বক্ষে
যেমনি সম্মুখে চাওয়া অমনি সে ভূতে পাওয়া
লাগিল হাসির হাওয়া আর বুঝি নাই রক্ষে!"

"এ আবার কোথায় আছে? এ কি মন চোর টোর সেকেলে কথা সব, এ নিশ্চয় আপনার লেখা নয়।"

"হাঁ তাতো বলবেই, হেরে গিয়ে এখন লেখার দোষ, মনচোর একেবারে সেকেলে ব্যাপার হ'য়ে গেল, এ যুগে আর ওসব উৎপাত নেই বলতে চাও? যাক্‌ হোলোতো এবার দর্পচূর্ণ। দেখ এমন কিছু অখ্যাত বই নয়, চিত্রা।" বলতে বলতে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন, কথা না শেষ ক'রেই হঠাৎ গম্ভীর গর্জনে পড়ে উঠলেন—

"আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভাসাই ভেলা
বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা—

এ নিজের মনের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধতে দ্বন্দ্বেতে আছে আনন্দ। জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে প্রাণ, সহস্র চিন্তায় কর্মে সে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠতে চায়। আর স্বপ্নশয়ন নয়। বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা। প্রাণকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা নয়। Emotional, intellectual দ্বন্দ্বর মধ্যে জীবনকে

পাওয়া, নিজের সঙ্গে নিজের সে লীলাতেই আত্মপরিচয়ের আনন্দ, জীবনের সার্থক জাগরণ—

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে…
এতকাল আমি রেখেছিনু তারে যতন ভরে
শয়ন পরে,
ব্যথা পাছে লাগে দুখ পাছে জাগে
নিশি দিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে…
শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ
আলস রসে
আবেশ বশে
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুসুমের হার লাগে গুরুভার
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশ বশে!

অধিকাংশ জীবনই তো এই, কি বল? বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ! নিত্য অভ্যাসে বাঁধা একঘেয়ে জীবন! তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা”—

একবার এমনি ক'রে প'ড়ে গিয়ে শেষে সম্পূর্ণটা পড়লেন। পড়তে পড়তে উত্তেজিত ভাবে চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসলেন, পায়ের উপর থেকে চাদর স্খলিত হ'য়ে প'ড়ে গেল,—এক হাতে বই ধরে আছেন আর এক শুভ্র দীর্ঘ বাহু ছন্দের তালে তালে উত্তেজিত ভাবে নাড়ছেন—ঘরের অল্প আলোতে দেয়ালের উপর সে হাতের ছায়া দীর্ঘতর হ'য়ে ওঠানামা করছিল, সে ছবি এখনও দেখতে পাই—গম্ভীর গর্জনধ্বনি ছিল সে কণ্ঠস্বরে—

"দে দোল্ দোল্
দে দোল্ দোল্
এ মহাসাগরে তুফান তোল্
বঁধুরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল্
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল
কি হিল্লোল্।"

পড়া শেষ হ'য়ে গেলে ফেলে দিলেন বই মাটিতে, 'এই লও।' সবাই চুপ হ'য়ে বসে রইলুম। পাশের টেবিল থেকে 'পূরবী' তুলে নিয়ে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন, তারপর হঠাৎ পড়তে শুরু করলেন—

"রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি
অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রা জড়িমা মাজিয়া।"

সেই গম্ভীর স্বর আজো কানে আসে—

"বাজে রে গরজি বাজেরে
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীপ্ত গগন মাঝেরে
চমকি' জাগিয়া পূর্ব ভুবন
রক্ত বদন লাজে রে।"

আর মনে পড়ে মন্ত্রের মত উচ্চারিত সেই বাণী—যে বাণী একদিন উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রাণ, উত্তেজিত করেছিল রক্ত, শত শত আত্মত্যাগী বীর দেশপ্রেমিকের ধমনীতে—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

সেই বই থেকেই একটু পরে পড়েছিলেন 'তপোভঙ্গ'।

"যাই বল কুমারসম্ভবের ওই তৃতীয় সর্গটি ছাড়া আর কোনোটা সাহিত্য নামের যোগ্য নয়। ওই একটি সর্গই ভালো, খুব ভালো—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসোবসানা তরুণার্করাগং
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

কিন্তু ভালো নয় ঐ হিমালয়ের বর্ণনা, তা বলতেই হবে। এত আর্টিফিসিয়াল ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি করেই বা মহাকবি লিখলেন, কি করেই বা লোকের ভালো লাগত এত, বিশেষ ক'রে যাঁরা কাব্য রসিক। কি, না, 'ভিন্নশিখণ্ডীবর্হৈঃ' কী কবিত্ব—ময়ূরের পুচ্ছ চেরার মতই অতি সূক্ষ্ম কবিত্ব। যত ধনরত্ন, কিন্নর কিন্নরী, এই কি হিমালয়ের বর্ণনা! সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যই বড় বেশি রকম আর্টিফিসিয়াল, ইনিয়ে বিনিয়ে বানিয়ে লেখা। এক শকুন্তলা বাদ দিলে বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যিকারের ভালো জিনিস খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। ওই আর একটা বই আমার ভালো লাগত, বসন্তসেনার গল্প, বেশ স্বাভাবিক সহজ ভাব আছে ওটাতে। ধর না, এই রতিবিলাপ, সে কি সাংঘাতিক বিলাপ, এত বানিয়ে বানিয়ে কান্না কি ক'রে লোকের ভালো লাগত? একটা ছোট কবিতা মনে পড়ে, কার লেখা জানিনে, তার বক্তব্য হচ্ছে যে নায়িকা আয়নায় মুখ দেখে না, কারণ মুখ দেখলেই তো চাঁদ দেখা হয়, আর চাঁদ বিরহিণীদের পক্ষে একেবারে মারাত্মক কি না! চাঁদ আর মলয় সমীরণ একেবারে চলবে না। বিরহিণীদের একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হবে তাহ'লে। এ সবও কবিতা, হায় রে!"

"কাল কিন্তু আপনাকে শকুন্তলা পড়তেই হবে। আমরা মোটেই আপনার কাছে সংস্কৃত পড়া শুনিনি।"

"ও বাবা! তোমার বাবা টের পেলে কি হবে, তিনি বলবেন, অনধিকার প্রবেশ। আমাদের দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয় মোটেই। আমার পিতৃদেবের এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাঙালীর সংস্কৃত পড়া অস্তুত্তরসাং দিশি দেবতাত্তা, হিমালয়ো নাম্ নগাধিরাজ অঃ, এইত? আর একটা দেখি ঋ ফলা কেউ উচ্চারণ করতে পারে না বিশেষত বাঙালরা, অমৃতকে বলে 'অম্রিত' 'পিত্রি-মাত্রি', আর একটা আছে 'আব্রিত্তি', কখনো শুনিনে কেউ বলে আবৃত্তি, সবাই বলবে আব্রিত্তি। তুমি কি বল, নিশ্চয় অম্রিত বল?"

"কখনই নয়, দেখবেন পরীক্ষা করে।"

"এখন আর হবে না, সাবধান হ'য়ে যাবে। আচ্ছা এবার তাহলে উচ্চারণ বৃত্তান্ত ছেড়ে কাঁচের ঘরে গেলে হয়, হোলো তো তোমাদের আশ মিটিয়ে কবিতা পড়া?"

"তাহ'লে এর পর থেকে একদিন গল্প একদিন কবিতা পড়া হবে।"

"আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা, যা বলবে তাতেই প্রস্তুত, রয়েছি তোমাদের অধীনস্থ। এখন তাহ'লে চল যাই স্বস্থানে।"

"আর এখন কাঁচের ঘরে গিয়ে কি হবে, এইবারে শুয়ে পড়ুন।"

"উঁহু সে চলবে না, এ সব বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে আমাদের এই বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে কী ক'রে তাঁর কাছে লেখা শুনতে চাইতুম, সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতুম কী সাহসে। আর উনিও যে অত খুশি হ'য়ে শোনাতেন সেও আশ্চর্য! একদিন কথায় কথায় সে কথা বলেছিলুম। হেসে বল্লেন, "জানোনা শ্রোতা যত অর্বাচীন হয় আমার তত সুবিধে; তত কম ধরা পড়ে ফাঁকি!. আসল কথা কি জানো, কবিতার প্রধান কাজই হচ্ছে খুশি করা, প'ড়ে যদি আনন্দ পাও সেইত যথেষ্ট। কবিতাকে প্রধান বোঝা উপভোগের দ্বারা, কারও সেটা

হয়, কারও বা হয়না, তার উপরে আর তর্ক চলে না। যে কবিতা পারে গ্রহণ করতে, যার মন রসসিক্ত হয় তার হয়, যার হয় না তাকে তর্ক ক'রে বোঝান চলে না, আর বুঝিয়েই বা লাভ কি? তাই বলছি প'ড়ে যদি আনন্দ পেয়ে থাক সেই তো যথেষ্ট। তারও চেয়ে বেশি একটা কিছু প্রত্যাশা ক'রে হা হুতাশ করবার দরকার কি?"

"কিন্তু অনেকে যে বলেন আমাদের এই ভালো লাগা—যে ভালো লাগায় আমরা রাতের পর রাত কবিতা পড়ে কাটাতে পারি, যে ভালো লাগা সকল রকম অবস্থাতেই মনের প্রধান আশ্রয়, সে নির্বোধের উপভোগ, মূল্যহীন, যদি না কবির বক্তব্যই বুঝতে পারি।"

"যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতভেদ। কবির বক্তব্য চুলোয় যাক্, পাঠকের মনের উপর সে অনায়াসে নতুন রূপ নিতে পারে। বোঝা অনেক রকম আছে, যাঁরা খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে বোঝেন তাঁদের বোঝা কবিতা বোঝা নয়— কবিতাকে সত্যি সত্যি বুঝতে হলে তার সমগ্র রূপকে গ্রহণ করবার, ভাল লাগার বিশুদ্ধ উপভোগের ক্ষমতা থাকা চাই। মর্মব্যবচ্ছেদ যত প্রবল হয়ে ওঠে কবিতা তত ব্যর্থ হ'য়ে যায়। যত মাটি করে এই অধ্যাপকের দল, যারা কবিতার নোট লেখে আর ক্লাশে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে। 'কবি বলিয়াছেন'...আহা, কবি যা বলিয়াছেন তাতো কবিতাতেই আছে, আর যদি না বলিয়া থাকেন তবে সেটা জুড়ে দিয়ে লাভ কি? প্রত্যেকটি কথা তারা খুঁটিয়ে দেখে, কোনটি কেন বলিয়াছেন, তার গূঢ় তাৎপর্য কি, যে তাৎপর্য একমাত্র তাঁর ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোনো রকমেই মনে আসত না, কি দরকার সে ব্যাখ্যা দিয়ে আমার? আমার কাছে আমার ব্যাখ্যা আছে। টীকা লেখবার কোনো দরকার হয় না। কবিতা যদি ভালো কবিতা হয়, তাহ'লে সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তার মধ্যেই আছে তার ব্যাখ্যা, রসের ব্যাখ্যা, আনন্দের ব্যাখ্যা।

তাকে গ্রহণ করবার জন্যে scan করবার কিছুমাত্র দরকার নেই। তবে যদি কেউ বলেন সমালোচনার কি কোনো মূল্য নেই? নিশ্চয় আছে, সমালোচনার মূল্য খুবই আছে, কিন্তু নোটের বা explanationএর কোনো মূল্য নেই। যথার্থ সমালোচনা, সেও এক পৃথক সাহিত্য, সেও সৃষ্টিকার্য, তার মূল্য কম নয়, কিন্তু তাই বলে যে, কবিতার রস পেতে হ'লে পণ্ডিতের কাছ থেকে'পাঠ নিতে হবে তার কোনো মানে নেই, সে একেবারে ভুল কথা। আমি তো দেখি তোমরা যারা unsophisticated তারা যেমন করে রস পাও, যারা বিচারবিশ্লেষণ করতে থাকে সে মন নষ্ট হ'য়ে যায়, কিংবা কোনো কালে ছিল না। আসল কথাই হচ্ছে মনের দরদ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, একে গ্রহণ করতে হয়—কবিতা কোমল বনিতা যদি সা দুর্জনহস্তে পতিতা প্রতিপদ ভগ্না সংশয় মগ্না।"

সে সময়ে এখানে বর্ষাকাল এগিয়ে আসছে। জুন মাস, নানা রকম কীট পতঙ্গের উপদ্রব শুরু হয়েছে, সন্ধ্যে হলেই বড় বড় গুবরে পোকা বহ্নিমুখংবিবিক্ষু হ'য়ে এসে পড়ত দমাদম ক'রে আলোর নীচে। মাসী আবার সেগুলোকে বড় ভয় পেতেন। একদিন সকালবেলা রস নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মাসীও প্রণাম করতে এসেছেন।

"দেখ মাতৃস্বসা, এক সময়ে আমি একটু জ্যোতিষচর্চা করতুম, স্পষ্ট দেখছি আজ তোমার কপালে কিছু বিপদ আছে।"

"কি বিপদ বলুন?"

"তাও কি বলা যায়, তবে ঘটবে একটা দুর্ঘটনা।"

মাসী তো সারাদিন প্রশ্ন ক'রে ফিরতে লাগলেন "কি হবে?"

তখন সন্ধ্যে রাত্রি, আমাদের আহারের সময় হ'য়ে এলো, আমি ওঁর ওষুধ দেব ব'লে বসে আছি, হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ ও জিনিসপত্রের লণ্ডভণ্ড শব্দ শুনে খাবার ঘরে এসে দেখি, মাসী একটা চৌকির উপর দণ্ডায়মান, খাবার টেবিল তোলপাড়, আর

কবি যাঁদের বলতেন 'তিন কর্তা'—বড়কর্তা, ছোটকর্তা আর গৃহকর্তা, তাঁরা একটা প্রকাণ্ড গুবরে পোকা নিয়ে হৈ হৈ ক'রে খেতে শুরু করেছেন। তখন প্রকাশ হোলো ওটা চকোলেটের গুবরে পোকা। দার্জিলিং থেকে বড়কর্তা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, তারপর পূর্ব পরামর্শমত মাসীর প্লেটে ন্যাপকিনাবৃত হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। এ ঘরে এসে দেখি কবি খুব হাসছেন আপন মনে।

"মাতৃস্বসা, বলেই ছিলাম আজ তোমার বিপদ আছে।"

"কি আশ্চর্য আপনিও এ পরামর্শে ছিলেন?"

"তাইত আমিও এর মধ্যে? এটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে, তোমরা যেন আবার এসোসিয়েটেড প্রেসে খবর দিও না, তাহ'লে কবি-সম্রাটের গুরুত্বটা একেবারে কমে যাবে, বিশেষ ক'রে আমাদের এই গুরুতে পাওয়া দেশে। আচ্ছা আমি যদি তোমাদের গুরু হ'য়ে খুব উচ্চাসনে বসে তুটি একটি উপদেশ দিতুম তাহ'লে কে বঞ্চিত হত তাই ভাবি। যারা নিজেদের একটা মই-এর উপর তোলে, কতটা যে বঞ্চিত হয় জানে না।"

তিনি সমস্ত দেশের যথার্থ গুরু ছিলেন, সমস্ত দেশকে তিনি জাগ্রত করেছিলেন নির্মল পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির মধ্যে, রসের আনন্দানুভূতির মধ্যে। তাঁর শিক্ষায় তাঁর কথায় তাঁর চিন্তায় লালিত হ'য়ে আমরা অনেক বেশি মানুষ হয়ে উঠেছি, কিন্তু তিনি কখনো নিজেকে উঁচু মঞ্চে তুলে উপদেশ বর্ষণ করেননি। মানুষের হৃদয়ে সখা হ'য়ে তিনি প্রবেশ করেছেন, সখা হ'য়ে তিনি গড়ে তুলেছেন আমাদের, তাই তিনি যথার্থ শিক্ষক, যথার্থ গুরু। এমন অনায়াসে শিশুর মত খুশি হতেন—যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, লিখেছেন গভীরতম তত্ত্ব তখনও মুহূর্তে মুহূর্তে কত সহজে ফিরে আসতেন আমাদের মধ্যে। কিছু তিনি সরিয়ে রাখতেন না, কিছু বাদ দিতেন না, যা তাঁর সম্পূর্ণ অযোগ্য তাও হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। এমন ব্যবহার করতেন যে আমরা অনায়াসে সব বিষয়ে তর্ক বাদ-প্রতিবাদ করতুম, যেন উনি আমাদের

একজন, এই ঘটনা দূর থেকে মনে করলে তখনও আশ্চর্য লাগত, এখনও লাগে। তাই আজ মনে হয় উনি শুধু পরমপূজনীয় গুরুদেব নন, মহা প্রতিভাশালী লেখক নন, উনি মানুষের হৃদয়ের সখা।

একটা বিষয় আমার অপটু ভাষায় লিখে বোঝান সম্ভব নয় কিন্তু সে আমাদের প্রত্যহের অনুভবের গোচর ছিল। তিনি সর্বদাই সকলের সঙ্গে সকল বিষয় আলাপ করতে প্রস্তুত ছিলেন, নিজেকে কোন পৃথক গণ্ডির মধ্যে নিয়ে যেতেন না, আমাদের প্রত্যহের ছোট খাটো সুখ দুঃখ সংসারের দৈনন্দিন তুচ্ছতম ঘটনাপ্রবাহ সবই তাঁর পরিচিত ছিল, কিন্তু তবু তিনি যে মুহূর্তে মুহূর্তে দূরে চলে যেতেন সেটা অনুভব করেছি। এখনি কোন বিষয়ে কথা বললেন সহজ কৌতুক হাস্য পরিহাস, পরমুহূর্তে যখনি স্তব্ধ হলেন তখনি সে যেন অন্য মানুষ। যেন একটা দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল, তার ওপারে গভীর অজানা রহস্যকে আড়াল ক'রে। আমাদের এমন স্নেহের স্থান ছিল যে আমরা সকল সময়ই তাঁর সঙ্গে সকল বিষয়ে কথা বলতাম, কিন্তু তবু আমার অন্তত এমন বহুবার ঘটেছে যে কিছুতেই কোন কথাই বলতে পারিনি বহুক্ষণ, প্রয়োজনীয় কিছু থাকলেও নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হ'য়ে বসে অনুভব করেছি সেই প্রশান্ত গম্ভীর হৃদয়ের দূরত্ব। এখন বুঝতে পারি এ সব কথা লিখে বোঝান কত অসম্ভব, কত অসম্পূর্ণ এবং ব্যর্থ এ রকম লেখবার চেষ্টা। তাঁর কথা যে কিছুই লেখা হোল না শুধু তাই নয়। কারণ তাঁর কথা লেখা সম্ভব নয়, তিনি আমাদের অত্যন্ত অজানা। কিন্তু তবু তাঁকে আমরাই যতটুকু দেখেছিলুম, কেমন ক'রে দেখেছিলুম, তাও বলা হোল না। মুখের দু'একটা কথা লিখে রাখা যায়, কিন্তু কতটুকু সে। নীরবতায় যে এক প্রকাণ্ড প্রকাশ সে কেবল অনুভূতির মধ্যে। তাই তাঁর কাছে এসে তাঁকে জীবনে লাভ করার যে উপলব্ধি সে প্রকাশ্য নয়, অতি গভীর তার অনির্বচনীয়তা। তিনি যে কবি, প্রত্যেকটি দিনের তাঁর যে গভীর কবিত্ব, যে রসস্নিগ্ধ

অভিব্যক্তি, যে নিস্তব্ধ শান্তি আমরা অনুভব করেছিলুম, ভেবেছিলুম তা ধ'রে রাখব, কিন্তু তা সম্ভব হল না।

চাকরদের সঙ্গে অধিকাংশ কথাই ইসারায় বলতেন, সেই জন্য কোন সম্পূর্ণ নূতন লোকের তাঁর কাছে কাজ করবার অসুবিধা ছিল। ইসারায় কথা অর্থাৎ খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কথা বলতেন। অথচ অনাবশ্যক কথাবার্তা বা ঠাট্টাও কম করতেন না। কিন্তু কোন সামান্য কাজের কথা, যেমন, কলমটা চাই কিংবা চাদরটা এনে দিতে হবে এই জাতীয় একটা কিছু, কখনই পুরোপুরি বলতেন না। হাঁ, না, বা একটু হাত নেড়েই চুপ করতেন। বুঝে ক'রে দিলে হবে, না হয় হবে না। হয়ত খেতে বসেছেন, একটা পাত্র দূরে আছে, না খেয়ে চলে যাবেন কিন্তু বলবেন না যে ওটা এগিয়ে দাও। আমাদের সঙ্গেও এমনি করতেন অনেক সময়, খুব সামান্য একটু ইসারা, বুঝতে পার ভাল, নয়ত হবে না—এবং বুঝতেই পারা যাবে না যে কোন অসুবিধা হয়েছে। শুনেছি পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও ওই রকম অভ্যাস ছিল আরো বেশি! তাঁর এক পুরানো ভৃত্য ছাড়া আর কারও তাঁর কাজ বোঝা শক্ত হোতো। কেন যে এমন করতেন তা জানি না। বোধ হয় সর্বদা একটা চিন্তার ধারার মধ্যে ডুবে থাকতেন মনের ভিতরে। যখন ইচ্ছে করে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন পরিপূর্ণভাবেই করতেন, অন্য সময় অনর্থক ছোটোখাটো বাজে কথায় সে স্রোতধারাকে ব্যাহত করতে চাইতেন না। সেটা ইচ্ছাকৃত নয়, মানসিক অভ্যাস। অন্তত আমার তো তাই মনে হোতো।

একটা ঘটনা বলি। একদিন খেতে বসছেন, আলুবাবু হন্তদন্ত হ'য়ে এলেন, "সামনের পাহাড়ে আলোর সিগন্যাল শুরু হয়েছে, কোডের খাতা পাওয়া যাচ্ছে না, শীঘ্র দিন।" আমি বল্লুম, "অপেক্ষা করুন, হবে পরে।"

"না না তুমি যাও। ওরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তোমার অনুপস্থিতিতে আমি বেশ আরামে খাব। তুমি থাকলে কি

আহার্যের আস্বাদ কিছু বাড়ে? অত অহঙ্কার কেন?" অগত্যা উঠতে হোলো। মিনিট দুই পরেই দেখি বারান্দায় এসে বসলেন। "ও কি, না খেয়ে চলে এলেন যে?" চুপ ক'রে আছেন। তিন চার বার জিজ্ঞাসা করার পর—"আরে খাব কি—মহাদেব এসে লুচির পাত্রটা রাখলে, ভাবছি মধুর কৌটোটা খুলব, ও মা, হঠাৎ হরিপদ, বৌমার সাধের হরিপদ তীরবেগে এসে ফস্ করে তুলে নিলে।"

"সে কি! কি আশ্চর্য! কেন?"

"কেন তা কি ক'রে জানব! আমি তো ওর মনোবিকলন করি নি, সাইকোঅ্যানালিসিস্এর বাংলা প্রতিশব্দ মনোবিকলন তা জান তো?" অন্য যে কেউ হ'লে সাধারণত বলতেন কেন নিয়ে যাচ্ছিস্, বা ঐ জাতীয় একটা কিছু, কিন্তু অনর্থক কথার হাঙ্গামার মধ্যে উনি তো যাবেন না।

আর একটা ঘটনা। সেও প্রায় এই রকম। স্নানের জল ঠিক ক'রে এসে খবর দিলাম—"দেখ মহাদেব আর বনমালীতে কত তফাৎ তাই ভাবি। এরও বুদ্ধি ছিল, কিন্তু ক্রমেই কমছে। আজ প্রায় পাঁচ দিন হ'ল আমি তোয়ালে রাখছি স্নানের জায়গায় চৌকির উপরে, ও সেটাকে নিয়ে আল্‌নায় তুলে রাখবে। তাতে ভারি মুশকিল হয়, ভাবছি স্নান করা ছেড়ে দেব।"

"তা বলেন না কেন? বল্লেই তো হয়।"

"কেন, বলব কেন, রোজ যখন স্নানের পরই ঘর পরিষ্কার করতে যায় তখন তা দেখতে পায়, দেখে বুঝবে না কেন? দেখি কত দিনে বোঝে—আর হবে না, তোমায় বলা হ'য়ে গেল। এমনি ক'রেই তো ওদের বুদ্ধির পরীক্ষা করি, বেশ বোঝা যায় সেটার গতি কোন্ দিকে।"

"আচ্ছা এরকম কেন করেন? যা দরকার বা যা অসুবিধা, স্পষ্ট ক'রে না ব'লে নিজেই কষ্ট পান?"

"আরে তুমিও যেমন, কতই বা বলব আর কতই বা ভাবব, 'আর ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা লো সই,' সেই যে বই বাজিয়ে গাইত তার নাম যেন কি? বিপিন বাবু—একদিন বৈকুণ্ঠের খাতা পড়তে হবে, তোমার কাছে আছে তো এখানে?"

"তুমি মনে করেছিলে আমায় ঘুম পাড়াবে, না? বেশ ক'রে তোমার সেই পশমী চাদর দিয়ে ঢেকে চলে গেলে। কেন ঘুমোব? আমি তার পাঁচ মিনিট পরেই পালিয়েছি।"

"কি ক্ষতি হ'ত ঘুমোলে একটুক্ষণ?"

"বিশেষ ক্ষতি, আত্মার অবনতিও বলা চলে। আমি তো বলেছি, যখন তুমি বলবে ঘুমোন, আমি বলব কখনো নয়—সর্বদা নিজেকে assert না করলে আমি ক্রমশই তোমার অধীন হ'য়ে পড়ব।"

"আচ্ছা কী করবো তাহলে, চশমা দেব, পড়বেন?"

"উঁহু সে তো হবে না, তুমি যদি বল পড়ুন, আমি বলব কখনো না, এখনি ঘুমিয়ে পড়ব। তার চেয়ে কিছু না ব'লে ঐ পেটমোটা বইটা দাও। আমার এই travelএর বই পড়তে ভালো লাগে। কত দেশ আছে দেখিনি, কত রকম মানুষ, অন্য রকম তাদের চেহারা, অন্য রকম আচার ব্যবহার, নানা রকম রীতিনীতি। কি বৃহৎ পরিধি সেই জগতের, যে জগৎ অজানা। আর জানার জগৎটা এই এতটুকু! ক্রমেই তো এঘর থেকে ওঘর আমার বিদেশ হ'য়ে উঠছে, তাই এখন মনে মনে ভ্রমণ! বসে বসে ট্রাভেলএর বই পড়ি, কর্তারা দয়া ক'রে দেয়, পড়তে পড়তে চলে যাই অপরিচিত জগতের সীমানায়, লাগে ভালো।"...

"এক্ষুনি তোমার কর্তৃপক্ষ এসেছিলেন, তাঁকে কয়েকটা কথা বেশ বুঝিয়ে বল্লুম, তা সে এমন নীরবে থাকে যে রাজী হ'ল কি না বোঝা গেলনা। তাকে বল্লুম কিছুদিন ছুটি নিয়ে সবাই মিলে চল

শান্তিনিকেতনে—শান্তিনিকেতনে এইবারে শুরু হবে ঘনঘটা তা জানো— ? সে দেখবার মত, যখন অন্ধকার ক'রে ছুটে আসে ঘন কালো মেঘ, চারিদিকের তৃষিত মাটি শ্যামল হ'য়ে ওঠে, সে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। আর আমরাও কিছু কিছু আতিথ্য করতে পারি। নিশ্চয় বলছি বৌমার তত্ত্বাবধানে আরামেই থাকবে।"

"এ সব কথা উঠছে কেন ? কোনো খবর এলো, যাবার সময় হ'য়ে এলো নাকি ?"

"না না এখনও জানিনে, তবে যেতে তো হবেই একদিন। এসেছি যখন তখন যেতেও হবে, নইলে কুইনিন বানানো শুরু করতে হয়। কাগজে বড় বড় অক্ষরে বেরুবে, ভারত সরকারের অসামান্য চাতুরী, মংপুতে concentration campএ রবীন্দ্রনাথ বন্দী, হায় রবীন্দ্র কবীন্দ্র ব'লে কত লোক কবিতা লিখবে, রামানন্দ বাবুকে আবার সেগুলো ছাপাতে হবে, সে কি ভালো হবে, এত হাঙ্গামা ? কি ভাবছ কি ?"

"আমরা যদি আপনার কোনো রকম আত্মীয় হতুম কত ভালো হোতো তাই ভাবছি।"

"কেন ? কি জন্যে ? আত্মীয় না হওয়ায় কি ক্ষতি হয়েছে ? এত কবিতা পড়ে এই তোমার বুদ্ধি ? 'আত্মীয়' হ'লেই কি আত্মীয় হওয়া যায় ? তার চেয়ে এই যা হয়েছ সে ঢের ভালো। কাছে থাকলেই যদি সব চেয়ে বেশি পাওয়া হোতো তাহলে তো মহাদেব আমাকে সব চেয়ে বেশি পায়। প্রথম যাদের মধ্যে জীবন শুরু করেছিলুম তাদের থেকে ভেসে চলে এসেছি, আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনই তো অনাত্মীয়ে ভরা, কিন্তু তারা তো অনাত্মীয় নয়। যাদের মধ্যে জন্মেছিলুম, দূরে চলে এসেছি তাদের থেকে। তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা আমার কথা মনেও করে না, আমিও করিনে। আজ আমার পর আপন হয়েছে, তাতে লোকসান হয়নি। তোমরা যারা পর তারা যখন নিকটে আস, এত অকারণ অহেতুক স্নেহ আনো সে তো আমি অবহেলা করিনে।

খুব বড় জায়গা দিই তাকে—সে স্নেহ, সে গভীর শ্রদ্ধা আমি বিশ্বমানবের দান বলে গ্রহণ করি, বিগলিত হ'য়ে যায় হৃদয়, বুঝতে পারিনে কেন পাই। তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক, নালিশ করবার কিছু নেই আমার। সেইজন্য দেখ তো কত অনাবশ্যক চিঠি লিখি, কেউ যদি আমার এক লাইন লেখা পেয়ে খুশি হয়, তাকে ফেরাই কি ক'রে বল? আমার কর্তারা তা বোঝে না। অবশ্য ক্লান্ত শরীরে অনেক সময় নষ্ট করতে হয় এ সব কাজে তা জানি, কিন্তু আমি ফেরাতে পারিনে। কেউ যদি দেখা করতে আসে, ফস্ ক'রে বলা যায় না যে সময় নেই। যে গভীর স্নেহ তোমরা উপহার দাও আমি সত্যিই জানিনে সে কেন—সে কি আমি বড় কবি বলে? আমি যদি ভালো কবিতা লিখি তাতে তোমাদের কি? জীবনে অনেক পেয়েছি দেশে বিদেশে। প্রশংসাপত্র অভিনন্দন এ সব অনেক কবির ভাগ্যে জোটে, নোবেল প্রাইজের মূল্যও নির্দিষ্ট, কিন্তু এই অহেতুক গভীর স্নেহ—এ অমূল্য, এ দুর্লভ, কখনো মনে কোরো না যে আমি তা বুঝিনে।"

"অনেক দিন আগে আপনাকে একটি মেয়ে কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন, আপনি চিনতেন না তাঁকে। আপনার উত্তরের সঙ্গে সে লেখাটাও 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত হয়েছিল। ভালো হয়েছিল সে লেখাটা, যদিও আমার মনে নেই, কিন্তু আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা মনে আছে—

> সুন্দর ভক্তির ফুল নিভৃতে অলক্ষ্যে তব মনে
> যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে
> হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল গন্ধ তার
> দিয়েছ দক্ষিণা মোরে কবির গভীর পুরস্কার,
> লহ আশীর্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপুরে
> ছন্দের নন্দনবন সৃষ্টি কর সুধাস্নিগ্ধ সুরে,
> বঙ্গের নন্দিনী তুমি প্রিয়জনে কর আনন্দিত,
> প্রেমের অমৃত তব মনে ঢেলে দিক গানের অমৃত।

মনে পড়ে আপনার?"

"একটু অস্পষ্ট মনে হয়—ভালো তো লেখাটা। তোমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় তো মন্দ নয়।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পড়া হোলো "নামঞ্জুর গল্প" আর "পয়লা নম্বর"।

"এই সবুজ পত্রের গল্পগুলো আমার আরো কম মনে আছে, গল্পগুচ্ছের গল্পের সঙ্গে এর প্রভেদ খুব। ভাষা একেবারে বদলে গেছে। আবার এখনকার গল্পগুলোর দেখি ভাষা আরো অন্যরকম হয়, কেন হয় কী জানি। ভিতর থেকে আপনিই বদলে বদলে ভাষা গড়ে ওঠে এক এক বইতে এক এক রকম। 'নামঞ্জুর গল্প' নামে গল্পটার মধ্যে যেখানে হরিমতির পা টেপার করুণ বৃত্তান্ত আছে—'ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হ'য়ে উঠল। তার দেশবিশ্রুত দাদা যদি একটু ইসারা মাত্র করত তাহ'লে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল?...বললে, দাদা হরিমতিকে কি তুমি—ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্‌লাম, পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।...আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্য মিথ্যে কথা ব'লে ফেললাম। এবারেও শাস্তি শুরু হোলো। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বসল।...হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলো। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। কেমন ক'রে বলি দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে স্বায়ত্ত-শাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলাম সে আর টেঁকে না বুঝি!'—এই ঘটনা একবার আমারই ভাগ্যে ঘটেছিল—বিপদে পড়েছিলুম! মেয়েদের ঈর্ষা ক্ষুরের ধার!"

"তোমাদের এই মেদিনীপুরের বাবুর্চিরা কি আর সুক্তু রাঁধতে জানে? ওসব এদের কর্ম নয়। আজকাল তোমাদের উপকরণ অনেক বেশি, আয়োজনও সৌখীন রকমের, কিন্তু আগে যেমন

হোতো এখন আর হয় না। ওই তো সেদিন কচুর মুড়কি করল, কিন্তু আমাদের আগে যেমন হোতো তেমন হোলো কি ?"

"তার কারণ আপনার ভিতরে,—সে মুড়কিও বোধ হয় এই রকমই ছিল, কিন্তু দূরের দিনগুলোর স্মৃতি ভালো কিনা, তাই মনে হয় সুক্তও বোধ হয় ছিল ভালো।"

"তা হ'তে পারে, অসম্ভব নয়, 'কারণ ভিতরে'। সেই যে তেতালার ছাদে নতুন বৌঠানের হাতের রান্না, সে মনে হোতো একেবারে অমৃত। তিনি সর্বদাই আমাকে খোঁচাতেন, সেটা যে স্নেহ তাতো বুঝতুম না তখন, লজ্জা পেতুম, দুঃখ হোতো। মনে হোতো কি ক'রে এমন হবো যে আর কোনো দোষ তিনি খুঁজে পাবেন না। সবাই খেতে বসেছি হঠাৎ তিনি বলতেন—'দেখ দেখ রবি কি রকম ক'রে খায়, ঠিক ওনার মত ক'রে।' কি লজ্জা পেতুম তখন। অথচ সেটা কম্‌প্লিমেন্ট, ওনার মত ক'রে খাওয়া খুবই বড় কম্‌প্লিমেন্ট! 'রবি সব চেয়ে কালো, দেখতে একেবারেই ভালো নয়, গলা যেন কী রকম। ও কোনদিন গাইতে পারবে না, ওর চেয়ে সত্য ঢের ভালো গায়,'—অথচ এ সবই ছলনা, মনে মনে বলতেন তার উল্টো। তিনি তো কখনো স্বীকার করতেন না যে আমি লিখতে পারি, বা কোনো কালে পারব। বিহারীলাল ছিল তাঁর আদর্শ। শুধু একটি মাত্র গুণ আমার স্বীকার করতেন যে আমি ভাল সুপুরি কাটতে পারি। 'রবি কি চমৎকার সুপুরি কাটে'—ওটা অবশ্য কাজ আদায়ের ফন্দি। আচ্ছা, আজকাল তোমাদের সুপুরি কাটা উঠে গেছে? এখন যেমন দেখি পশম আর কাঠি নিয়ে তোমার হাত চলছেই, তখন তেমনি জাঁতি আর সুপুরি হাতে হাতে ঘুরত। যাক্‌, আমি তাঁর ইচ্ছে মত সুপুরি কাটায় যথেষ্ট উন্নতি করতে পারলুম না! ইস্কুল থেকে ফিরে যদি দেখতুম তিনি বাড়ি নেই, ভারি দুঃখ হোত। তিনি বলতেন, বাঃ তোমার জন্য কি আমি আত্মীয়তা লৌকিকতা ছেড়ে দেব নাকি?... খুব আবদার করেছি তাঁর কাছে। তার পরে শেষ হ'য়ে গেল সেই

তেতালার ছাদের পালা। একটার পর একটা পালা চলেছে জীবনের, নতুন নতুন পর্ব,—এখন দূরের থেকে দেখতে আশ্চর্য লাগে। বারে বারে দৃশ্য পরিবর্তন। এখন সামনে এগিয়ে আসছে চরম যবনিকা,—আর তাই যদি হয় তাহ'লে শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিপদর হাতের অমৃত এই বেলা খেয়ে নাওগে।"

সেবারে আমরা মাঝে মাঝে ওঁকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যেতুম। বাড়ি থেকে বেরুতে হলেই মাথায় টুপি পরবেন, সে যতটুকুই বেড়ানো হোক না কেন। বলতেন, "সব জাতের মাথায় আবরণ, গায়ে আবরণ, খালি বাঙালীর ছাড়া। আমাদের সময়ে বিশেষত আমাদের বাড়িতে এসব দিকে খুব কড়া নজর ছিল। এলোমেলো পোষাকে যেমন তেমন ভাবে ঘুরে বেড়াবার উপায় ছিল না।" মাথায় কালো টুপি প'রে গায়ের উপর চাদর ঢাকা দিয়ে—মংপুর বন্যপথে যখন ওঁকে নিয়ে বেড়াতুম ভারী আশ্চর্য লাগত। এই এক নির্জন অখ্যাত গ্রাম, এখানে এক ছোট্ট গাড়ীতে ক'রে জনহীন অরণ্যপথ দিয়ে নিয়ে চলেছি সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে! পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষাভাষী যাঁর নাম জানে। বিশ্ববিদিত সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, অপ্রতিম প্রতিভা যাঁর এই পদানত জাতকেও পৃথিবীর দরবারে পরিচিত করেছে, তিনি যে এই গভীর অরণ্যে আমার এই ভাঙা গাড়ীতে ক'রে বেড়াতে চলেছেন, এর বিস্ময় কি কম? এখানে সভা নেই, মেলা নেই, প্রশস্তিপত্র নেই। আছে শুধু শুকনো পাতার মর্মর আর কালো ছায়াময় অন্ধকার। মনে পড়ত কলকাতার রাস্তায় যখন তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়েছি তখনকার কথা—উনি কখনই খোলা গাড়ীতে চড়তে চাইতেন না। লোকের দৃষ্টিতে বিব্রত হ'তে হবে বলে—কিন্তু তবু বন্ধ গাড়ীর মধ্যেও যতটুকু দেখা যেত তাই দেখবার জন্য ট্রাম থেকে বাস থেকে পথ থেকে উদ্‌গ্রীব জনতার কি আগ্রহ দৃষ্টি! তাঁকে আমরা নিকটে পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম তাঁর সঙ্গের অপরিসীম সুখ জানিনা কি

পুণ্যে, কিন্তু যখন তাঁকে নিকটে পেয়েছি তখন বারবার মনে পড়েছে সেই সব আগ্রহভরা দৃষ্টি—কত লোক তাঁকে কাছে পায়নি। শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, প্রত্যহের রবীন্দ্রনাথও যে কত আনন্দময় তা যাঁরা জানবার সুযোগ পাননি অথচ ইচ্ছে করেছেন, মনে হোতো তাঁদের কথা। তিনি তো কারও সম্পত্তি ছিলেন না। সুদূর প্রসারী তাঁর মন সকলকেই স্থান দিত, সে যতই অযোগ্য হোক।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে, বারান্দায় চৌকিতে বসলেন।

"আমাদের সময়ে যাঁরা আধুনিকা ছিলেন, মানে বাড়াবাড়ি রকম আধুনিকা, তাঁরা এক রকম টুপি পরতেন। পিছন দিয়ে লম্বা একটা চাদর ঝুলত! আচ্ছা তুমি আমার ব্রাউন রংএর টুপিটা আনতো, আর তোমার একটা হার আনো।—হাঁ, এইবার টুপির চারদিকে হারটা আটকাও! এইবার পরো। আমি বরাবর বলতুম, গয়না যদি পরতে হয় তবে জামার সঙ্গে লাগাওনা কেন, সে বেশ নতুন রকম দেখতে হয়। বোতামের বদলে গলায়, জামার হাতায় বেশ মুক্তা বসানো চলে।"

"তা যেন হোলো, কিন্তু আমি এই রকম সেজে বসে থাকি, যদি কেউ এসে পড়ে কী হবে?"

"কী আবার হবে, এলে ভালোই হবে, নতুন রকম পোষাক দেখবে তারা।"

বলতে বলতেই দু'জন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত! আমি তো তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি যখন ফিরে এলাম, দেখি তাঁরা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা বলছেন, এবং উনি যদিও কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না তবু আন্দাজে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। শরীরের কোনো অসুস্থতা বা অপটুতার কথা কাউকে জানতে দিতে চাইতেন না। তাই শুনতে না পেলেও কখনো সে কথা প্রকাশ করতেন না। যে-কোনরকম শারীরিক দুঃখকষ্ট প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। নূতন কোনো লোক দেখা করতে এলে

সর্বদা তাই বাড়ির কাউকে উপস্থিত থাকতে হোতো। সবচেয়ে মুশকিল ছিল এই যে, তাঁর কাছে এলে সকলেই স্বাভাবিকের চাইতে নিম্নস্বরে ধীরে ধীরে কথা বলতেন। উনিও আন্দাজে বেশ কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন। বেশির ভাগ সময়ই অপর পক্ষকে কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে নিজেই বলে যেতেন।

"কী যে কর! কোথায় পালালে, ফস্ ক'রে এক দৌড়। আমি তো এ ভদ্রলোকদের নিয়ে মহা মুশকিলে পড়লুম। কি যে বলে কিছুই শুনতে পাইনে, অগত্যা সব কথাতেই সায় দিতে হয়। ওরা মনে ক'রে গেল যে রবীন্দ্রনাথ সব বিষয়েই ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কি কথা বল্লে, সাহিত্য কি সুভাষ বোস, কিছুই শুনতে পাইনি, তবু একটু একটু হাসতে হোলো, ভাবখানা যেন—'হাঁ তাতো বটেই।' আর মনে মনে ভাবছি তোমাকে টুপিটা না পরালেই আর এ কাণ্ড হোতো না। কী হয় জানো, কোনো কোনো লোকের কথা আমি একেবারে শুনতে পাইনে। কেউ কেউ আবার খুব আস্তে বল্লেও বুঝতে পারি। বাড়ির লোকের মধ্যে অনেকের কথা একেবারে শুনতে পাইনে।"

"আমার কথা শুনতে পান?"

"যা পাই সেই যথেষ্ট! আর একটু কম পেলে অনেক আরাম পেতুম।"

"আপনি বড় unsafe, কোনো সময়ে এত আস্তে কথাও শুনে ফেলেন, আশ্চর্য হ'য়ে যাই।"

"আসল কথা কি জানো, যেটি শুনতে দিতে চাওনা সেইটি শুনে ফেলি। মানুষের শ্রবণশক্তির যে একটা সীমা আছে তাতে অনেক বিপদ কমেছে, তা নাহ'লে পরস্পর সম্বন্ধে আড়ালে যে আলোচনা চলে, সেটা যদি প্রকাশ্য হ'য়ে উঠত তাহ'লে সমাজ রক্ষা করা কঠিন হ'ত।"

"………তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম
তুমি কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন—, তাহা

তুমি জান হে তুমিই জান.........

কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে মনমোহন।

চাহিলে মুখপানে কী গাহিলে নীরবে কিসে মোহিলে মনপ্রাণ...

...ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিও না—ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে আসামাত্র মুছে ফেল। এই বিচিত্র সংসারের বৈচিত্র্য হাসিমুখে দূরের থেকে দেখ। ঘটনাস্রোত কিছুই আমার হাতে নেই, শুধু আমিই আমার হাতে আছি। আমাকেই আমার সৃষ্টি করতে হয়,—দুঃখকে মধুর ক'রে তুলে বেদনাকে অমৃত ক'রে নিজেকেই উপহার দিতে হবে। অসীম কালের মধ্যে বুদবুদের মত ফুটে ওঠা ক্ষণিক এই জীবন, কিন্তু তারও গভীর মূল্য আছে। নিজেকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত প্রতিহত ক'রে সে মূল্য হারানো অনুচিত, সে নিজেরই পরাজয়। * * তা ছাড়া যে ছোট ছোট সুখ দুঃখগুলি প্রকাণ্ড মূর্তি ধরে বুকের উপর লাফালাফি শুরু ক'রে দেয়, বিশ্বসংসারের বিরাট পটভূমির উপর একবার তাদের ফেলে দেখো, এক মুহূর্তে ছায়াবাজীর মত সব মিলিয়ে যাবে। এই মাত্র মনমোহন চীনের দুর্দশার কাহিনী শুনিয়ে গেলেন। তাই বসে বসে ভাবছিলুম এই বিরাট দুঃখের হোমানলের পাশে আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ছোট ছোট চিন্তা দুঃখবেদনা কি অকিঞ্চিৎকব, কি তুচ্ছ! তাকে কোনমতেই স্থান দেওয়া চলে না। তবু আমরা পদে পদে তাদেরই বাড়িয়ে তুলি। কুসুমাস্তীর্ণ পথ কোথায় পাওয়া যায়? কিন্তু কণ্টকিত পথেও হাসিমুখে চলতে হবে আপন মহিমায় আপন ভাগ্যকে অতিক্রম ক'রে। মানুষ যা পাবে তা এইটুকু, যা চাইবে তার শেষ নেই। সেই অশেষের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় কিছুই হোল না, কিছুই পেলুম না। কিন্তু সে 'না'টাই বড় হ'য়ে উঠে 'হাঁ' যেটুকু আছে তার মূল্য কমিয়ে দেবে? নিজেকে খুশি করা নিজের হাতে। যা পেয়েছি এই ভাল,—হাসিমুখে আনন্দিত মনে পার হ'য়ে যেতে হবে পথ। মন খুঁতখুঁত ক'রে উঠলেই মনকে দিয়ে বলিয়ে নিও,—আনন্দং পরমানন্দং পরমসুখং পরমাতৃপ্তি।

আমি যে এসব কথা বলছি, এ শুধু উপদেশ দেবার জন্য নয়। আমি ইচ্ছা করি তোমাদের আনন্দিত অনুদ্বিগ্ন দেখতে। যাদের সঙ্গে আমার স্নেহের যোগ আছে তাদের কাছে আশা করি—নিজের বন্ধন থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে তারা। আমি যে প্রভাব বিস্তার করি তার মধ্যে পথ্য আছে আরোগ্য আছে, একথা জানতে পারলে সার্থক মনে হয় নিজেকে” * * *

“একটু আগে শুনতে পেলুম আপনি গাইছেন, আমি আসতে আসতেই শেষ হ’য়ে গেল। আমার ভাগ্য ঐ রকমই, ভাল জিনিসের আভাস পাই কিন্তু অদৃষ্টে স্থায়ী হয় না।”

“মাতৃস্বসা, কথাগুলো বড় বেশি করুণ শোনাচ্ছে। কবির হৃদয়ে আঘাত লাগছে, ইচ্ছে করছে সমস্ত গীতবিতান তোমায় গেয়ে শোনাই, তা ছাড়া তোমার ভাগ্নীকে এতক্ষণ এত বড় বড় তত্ত্বকথা বলেছি যে ওর মুখ দেখে মায়া হচ্ছে। মনে হচ্ছে গান গেয়ে এ compensate করা কর্তব্য। আলো জ্বালো তাহ’লে—

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল
মোর আনন্দ সে যে মণিহার······

নাঃ আমার মনে নেই, আচ্ছা শোন, এ গানটা শুনেছ আগে? আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব নাগো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
রূপে তোমায়······ ”

সেদিন অনেকগুলো গান করেছিলেন। ইদানীং তাঁর মুখে এত গান শোনা কম আশ্চর্য ঘটনা নয়, কারণ পূর্বের গলার সঙ্গে তুলনা ক'রে আজকাল তিনি গান গাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলতেন, "দত্তাপহারক একদিন সুর দিয়েছিলেন ফিরিয়ে নিয়েছেন, এত দেরি না ক'রে সময়মত এলে আর এত অনুরোধ করতে হোতো না"—তবু এখানে প্রায়ই গান হোতো। এক একদিন নিজেই বলতেন,"আজ গলাটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে, আজ গান চলবে।" সেদিন শেষ হোল—

"ওই মধুর মুখ জাগে মনে
ভুলিব না এ জীবনে
কি স্বপনে কি জাগরণে।
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে
হৃদয়ে সদা আছ বলে—"

সেদিনকার উপদেশ আজ বেশি ক'রে মনে পড়ছে। মানুষ কতই চায়, কিন্তু পাওয়াটা সীমাবদ্ধ। আজ এক বৎসর তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন, আর কখনও তাঁকে পাব না। কিন্তু সেই 'না'-এর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ নেই। একদিন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, আশী বছরের প্রত্যেকটি দিন যে এক একটি নূতন ঐশ্বর্যের মত সঞ্চিত হয়ে রইল ভবিষ্যৎ মানুষের জীবনে, সেই দুর্লভ আনন্দময় সত্যই আজ মনে প্রধান হয়ে উঠুক। জীবনে যে মাধুর্য ঢেলেছিলেন বিরহেও তা পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকবে। 'তুমি জান বা না জান মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে—'

"আচ্ছা, গৃহকর্তার জ্বর যে বাড়ছে! এতো ভাবনার কথা হ'য়ে উঠল।"

"এতে আর ভাবনার কি আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে সেরে যাবে।"

"সে তো বটেই, সেরে গেলে তখন আর ভাবনাও থাকবে না। কিন্তু যতক্ষণ না সারছে ততক্ষণ ডাক্তারের ভাবনা হচ্ছে কী ক'রে সারবে। আমি যে ডাক্তার, তাই তোমার চেয়ে আমার দায়িত্ব বেশি। ও তোমাদের ইউনিভার্সিটির ডাক্তার নয়, চিকিৎসক, তা তুমি বিশ্বাস কর না? এক সময়ে সত্যিই অনেক বড় বড় অসুখ সারিয়েছি। হোমিওপ্যাথি নিয়ে কম সময় দিইনি। ভাল-ভাল হোমিওপ্যাথির বই ছিল আমার। তন্ন তন্ন করে পড়েছি। আলমোড়ায় আমার কাছে সব আসতো যে ওষুধ চাইতে, তাই দেখলুম হোমিওপ্যাথিটা জানা থাকলে অনেক কাজে লাগে। কিন্তু ওতে পরিশ্রম আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিম্‌টম মেলানো সে কম হাঙ্গামা নয়, সে জন্যে এখন আর ও হ'য়ে ওঠে না। বাইওকেমিক অনেক সোজা, আর খুব efficient। হয় কি জানো, অ্যালোপ্যাথিতে যত ওষুধ যে পরিমাণে শরীরে ঢোকান হয় তার কোন প্রয়োজন নেই। শরীর সে সব গ্রহণ করে না, করতে পারে না। এই দেখ না ক্যালসিয়াম। অ্যালোপ্যাথিতে যে রকম ভাবে ক্যালসিয়াম খাওয়ায় এই এত্তখানি ক'রে তার কিছুই assimilated হয় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম cell, তাদের গ্রহণ-বর্জন সবই সূক্ষ্ম। এক গাদা ক'রে ওষুধ খেলেই কি কাজ হয়? শরীর ফিরিয়ে দেয়। এক এক সময় আমার মনে হয় আমি যদি ইচ্ছে করতুম তা'হলে ভাল ডাক্তার হ'তে পারতুম। ডাক্তারের একটা ডাক্তারি instinct থাকা চাই। শুধু জানা আর experience নয়, instinct। আমার মনে হোতো আমার সেটা আছে। কারও অসুখ করেছে শুনলে যতক্ষণ না তার একটা ব্যবস্থা হয় আমি তো নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনে। অধিকাংশ লোকই দেখি এ সম্বন্ধে এত উদাসীন।..."

"ওগো সুনয়নি! কমললোচনে! একটু বাড়িয়ে বলছি, অতিরিক্ত রিয়েলিষ্টিক বর্ণনা কিছু নয়, তুমি যে এদিক ওদিক ঘুরে

বেড়াচ্ছ, ওষুধটা ঠিক মত পড়ছে তো? ওর একটা নিয়ম আছে, আধঘণ্টা অন্তর চালিয়ে যেতে হবে! তোমাদের এই বড় দোষ যে একটা নিয়ম মেনে চলবার আবশ্যকতা বোধ কর না।"

"আপনি মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন, সব ঠিক আছে। তার চেয়ে বলুন, আজ কি পড়বেন।"

"আজ আর পড়া হবে না, আজ আমি tissue medicine পড়ব, আর ওই ছোট মেটিরিয়া মেডিকা। অনেকদিন দেখিনি, দরকার হয় মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেওয়া, নৈলে একেবারে মনে থাকে না। তুমি যাও তো, তোমার কর্তব্য করগে। মিছে আমার খাবার কাছে বসে থেকে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, প্রায় সাবালক বললেও চলে।"

"এ ছবি দিয়ে কী হবে, এ কোথা থেকে জোগাড় হোলো? স্বয়ং মানুষটা তো ঘরেই বসে রয়েছে, তবে এত ছবির উপর লোভ কেন?"

"আহা, আসল মানুষ আর ক'দিন বা আমার ঘরে থাকবেন? পালাই পালাই তো শুরু হয়েছে।"

"ও, সে তো শুরু হয়েছে এক যুগ হয়ে গেল, কিন্তু পালাতে পারছে কই। দেশসুদ্ধ লোক ভাবছে, বিশেষ ক'রে কবিরা, যে আর কত দিন? মেয়াদ পার ক'রে দিয়েও এমন জায়গা জুড়ে বসে থাকলে অন্য লোকদের চলে কি ক'রে? এ একেবারে বাড়াবাড়ি, অন্যায়-রকম বেঁচে থাকা।"

"আপনার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করব।"

"উঃ, কি আরাম পাব তাহলে, মনে করতেও আনন্দ হয়।"

হাতে ছবিটা নিয়ে বল্লেন—"বিনা কলমে কি রকম ক'রে লেখা যায় সে শিক্ষা তো আজও আমার হয়নি।" তাড়াতাড়ি কলমটা এনে দিলুম। লিখলেন—

চলে যাবে সত্তারূপ সৃজিত যা প্রাণেতে কায়াতে
রেখে যাবে মায়ারূপ রচিত যা আলোতে ছায়াতে।

"কেমন ঠিক হয়েছে? কি করবে সে মায়ারূপ দিয়ে? আলো আর ছায়া? কত অটোগ্রাফই লিখেছি জীবনে, অটোগ্রাফের হরির-লুট।"

"আমায় কিন্তু কখনো দেননি।"

"বটে, আর যে তিনশো চিঠি লিখলুম, সেগুলো কি?"

"চিঠি? কোথায় চিঠি? খান তিনেক বড় জোর।"

"অয়ি অনৃতবাদিণি, আমি চিঠি লিখতে পারিনে বলতে চাও! এই যে মাসী, কি তুমিও একটা ছবি এনেছ নাকি? তোমার ভাগ্নীর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে, উনি বলতে চান, উনি আমার চেয়ে অনেক ভাল চিঠি লিখতে পারেন। এ সম্বন্ধে তোমার কী বিচার বল।"

"বাঃ, কখন বল্লুম এ কথা?"

"হয়তো বলনি, কিন্তু বলতে তো পারতে। সর্বদা একেবারে খাঁটি সত্য বলব যদি, কবি ব'লে মানবে কেন লোকে? কল্পনাশক্তি নেই আমার? কবি-খ্যাতি বজায় রাখতে হ'লে কত হিসেব ক'রে চলতে হয়। তার চেয়ে মাসী তুমি বোসো, তোমার একটা ছবি আঁকা যাক। ভাগ্যিস শেষ জীবনে এই দেবী আমায় ধরা দিলেন। জীবনে একটা নতুন পর্ব রচনা হোলো। নতুন রকম ক'রে জগৎকে দেখলুম আর্টিষ্টের চোখ দিয়ে। আমার ছবি এদেশকে দেখাই নি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না, প্রথমেই দেখে এর চেহারাটা ভালো দেখতে কি না। দেখতে হয় এটা ছবি হয়েছে কি না, সে দেখা কেমন ক'রে দেখা তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। একটা নিয়ত অভ্যাস আর instinctive দৃষ্টি থাকা চাই, ছবি দেখা সকলের কাজ নয়। সেই জন্যেই আমি এখানে ছবি প্রকাশ করতে চাই নে, প্যারিসে ওরা দেখেছিল আমার ছবি, দেখবার মত ক'রে। আমার ছবি এ দেশের জন্যে নয়।"

"তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণ রূপে দেখিনা তোমায়
মোর রক্ত তরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়—

যাও চলি রণক্ষেত্রে লও শঙ্খ তুলি
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্র ধূলি
নির্দয় সংগ্রাম অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা
জানি যেন সে তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবন জয়লিখা।"

"তোমরা যাই বল, মেয়েদের প্রধান কাজ inspire করা। পুরুষ বা মেয়ে উভয়েই অসম্পূর্ণ, উভয়ে মিলিত হ'লে একটা সম্পূর্ণতা আসে, জীবনে তার গভীর প্রয়োজনীয়তা। ও সাফ্রেজিষ্টদের বুলি নয়, স্বাধীনতা আর ভোটাভুটির কথা নয়,—জোর ক'রে একটা কিছু ঘটিয়ে তোলা বা সমাজের কোনো নিয়মের প্রতিবাদ সে অন্য কথা, সে বলছিনে। পুরুষ তার কর্মক্ষেত্রে সবল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না, যদি না নারী তার অমৃত দিয়ে পূর্ণ করে তাকে। দুজনের মিলনে যেন একটা circle সম্পূর্ণ হ'ল, যদি তা না হোতো তাহ'লে যে একটা বিশেষ ক্ষতি তা হয়ত নয়, কিন্তু সেই হওয়ার দ্বারা একটা বিশেষ পূর্ণতা জীবনের। মেয়েদের সেই কাজ, পুরুষের যথার্থ সঙ্গিনী হওয়া, জীবনের মুক্তক্ষেত্রে। সে অধিকার জাহির করবার জন্য house top থেকে চেঁচিয়ে বলবার কোনো দরকার নেই, ঝগড়ার দরকার নেই সমানাধিকার নিয়ে, অধিকার কেউ কারও কেড়ে নিতে পারে না, যদি না সে নিজেই অনধিকারী হয়। তাই বলছিলুম মেয়েদের প্রধান কাজ যদি inspire করা হয়—inspire করা কর্মীকে তার কর্মের মধ্যে সে কম নয়। সেই শিখা না হ'লে আলো যে জ্বলত না, তাই হৃদয়ে সে শিখা জ্বালানো চাই। বিবেকানন্দ কী বিবেকানন্দ

হতেন যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন। এই সহজ কথাটা কেন লোকে ভোলে তা জানিনে—সামনে যে কে এলো, কে পিছনে রইল সেটা সামান্য। অসামান্য সেইটাই যেটা তার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়,—কি দিল। পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি হবে? আর সত্যিকারের ঝগড়া তো হ'তেই পারে না, উভয়কে মিলিত হ'তে হবে এইটাই বিধান। কিন্তু সে মিলন তখনই যথার্থ বড় মিলন হয়, যখন সে একটা মহত্তর জীবনের মধ্যে প্রেরণা আনে। গণ্ডিবদ্ধ আঁচল-চাপা-দেওয়া জীবনে সে যেন ব্যর্থ না হয়। যেখানে পুরুষ মহৎ, যেখানে সে কর্মের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে তাকে নিয়ত জাগ্রত ক'রে রাখা কম কাজ নয়।"

"আজকে আপনার শরীরটা বিশেষ ভালো নয় দেখছি—।"

"এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। কলটা আজ কিছু বিগ্‌ড়েছে।"

"কি করা যায়?"

"বিশেষ কিছুই নয়, পায়ের কাছে মোড়াটা অনায়াসে এগিয়ে দেওয়া যায় আর যদি খুব কষ্ট না হয় তাহ'লে চাদরটাকেও পায়ের উপর চাপা দেওয়া যায়। এই দেখ, ভদ্রমহিলাকে দিয়ে এ সব কাজ করানো ভারি অন্যায়, হঠাৎ কেউ দেখে ফেল্লে বলবে এর ভদ্রতা জ্ঞান নেই, শিভাল্‌রি নেই। তবে যখন এতটা হ'য়েই গেল তখন ওষুধের ঝুড়িটাও না হয় এগিয়ে দাও।…আসল কথা এখন যন্ত্র বিকল হ'য়ে আসছে, আর কতদিন চলবে বলো? এতদিন যা চলেছে ভালই চলেছে, যদি এখন সত্যাগ্রহ করে দোষ দেব কাকে? তবে শুধু একটি মিনতি, যদি সব নাও, শুধু আমার চোখ নিও না, চোখ নিলে এ রূপ দেখবে কে। দত্তাপহারক একদিন সুর দিয়েছিলেন গলায়, ফিরিয়ে নিয়েছেন, আজ তোমরা গান শুনতে চাও, কে গাইবে? শিথিল জীর্ণ শরীর আজ পড়ে

যেতে চায় পথের মাঝখানে, কান তো প্রায় গেছে, কিন্তু সেও সহ্য হবে, শুধু চোখটা না যায়। তাহ'লে এই আনন্দময় ভুবন তোমায় কে দেখবে ?···আজকে সকালে যে চিঠিটা লিখলুম কপি করেছিলে ? দাও তো দেখি। আচ্ছা একটা জিনিস দেখি, তোমাদের সকলেরই হাতের লেখা একরকম, এটা কি ক'রে হয়, সব সেই গোল গোল অক্ষর ? কিন্তু পুরুষদের বোধ হয় প্রত্যেকেরই আলাদা।"

"তা আর বলবেন না। আপনার লেখা কপি ক'রে ক'রে দেখতে দেখতে এখন প্রায় সমস্ত বাংলা দেশের হাতের লেখা এক হ'য়ে এলো।"

"যা বলেছ, এক-একজনের লেখা আবার এমন হুবহু মিলে যায় যে ভাগ্যে আমার ব্যাঙ্কের খাতা শূন্য, নৈলে ভাবনায় পড়তে হোতো।"

মহাদেব এসে দাঁড়াল।—"এঁর কি অভিপ্রায় ?"

"খাবার দিয়েছে।"

"না দিলেও কোনো ক্ষতি হোতো না, কারণ আজ আমি খাব না,—তার চেয়ে চলো বসবার ঘরে, আমি যখন আজ পড়তে পারব না, তুমি পড়বে।"

কুয়াশায় আচ্ছন্ন চতুর্দিক। ঘোর বর্ষা নেমেছে, অন্ধকার ক'রে ঢেকে গেছে সামনের "ঢালু গিরিমালা"—পাশের ঝরনাটা কলধ্বনি ক'রে ছুটে নেমে যাচ্ছে। কবি বসে আছেন স্তব্ধ হ'য়ে, দূরে প্রসারিত দৃষ্টি। উনি যখন চুপ ক'রে বসে থাকতেন, সে এমন চাঞ্চল্যহীন গভীর চুপ-করা যেন ওঁর চারিদিকে সৃষ্টি হোতো নৈস্তব্ধ্যের পরিমণ্ডল। পা হয়ত ঈষৎ নাড়িয়ে চলতেন একরকম ভাবে, তা ছাড়া সব স্তব্ধ, যেমন বসে আছেন তেমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন, বোধ হয় একটুও নড়বার দরকার হোতো না। পিছনে আমরা দুজনে বসেছিলুম, মাসী আর আমি। রেশমের মত চুলের উপর আলো পড়েছে। কী রকম আশ্চর্য সিল্কের চাইতেও মসৃণ চুল ছিল তাঁর।

"কি গো, তোমরা এত গোপনীয় হ'য়ে উঠলে কেন? সামনে এসে বোসো, বাজাও না কী তোমাদের রেকর্ড আছে?"

সেদিন অনেকগুলো গানের রেকর্ড বাজানো হয়েছিল। উনিও প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে গাইছিলেন—'গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব'—বাইরে এই লীলাই তো এখন চলেছে? 'জটার গভীরে লুকালে রবিরে, ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে।' সেদিন আর একটা গান বাজানো হয়েছিল, 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।'

গ্রামোফোন বন্ধ হবার পর নিজেই সম্পূর্ণ-টা গাইলেন। 'তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে, সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে, ওগো সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে, ওগো সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে বর্ষা-মুখর রাতে ফাগুন সমীরণে'—সুরকে তো ধরে রাখা যায় না, ধরে রাখা যায় না তার অপরূপ মায়া, তাই সেই সন্ধ্যার মাধুরী হারিয়ে গেল। মাসী বল্লে, "সত্যি মনে পড়বে?" উনি ঈষৎ মধুর হেসে ফিরে তাকালেন—স্নেহ-সুগভীর সে দৃষ্টিপাত—"তা পড়বে, সত্যিই পড়বে সামনের পাহাড়ের বুকে সবুজ বন্যা, ওই উদ্ধত গাছ, দূরের পথে পাহাড়িয়াদের যাতায়াত,—সিঁড়ির টবের জিরেনিয়াম, সন্ধ্যেবেলা আলো জ্বেলে ইঙ্গিত, সবই মনে পড়বে।" মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন,—"জানি, মংপু আমার মনে থাকবে—

সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে।
বর্ষা মুখর রাতে ফাগুন সমীরণে।"

"এইমাত্র মনমোহন এসেছিলেন, আলুর সাহায্যে আমায় বুঝিয়ে গেলেন যে সেপ্টেম্বর মাসটা এখানে খুব ভাল, সবচেয়ে ভাল, তার অল্প পরেই না কি চেরি ফুল ফোটে তোমাদের পাহাড়ে? cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe, a full and fair one come and try! চেরী ফুল যখন ফোটে তখন তোমাদের

সুসজ্জিত অরণ্যানী দেখবার মত হয়। তোমার বাড়িতে আছে চেরী গাছ?”

“বাড়িতে আছে, সে বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু রাস্তার দুধারে যে গাছের সারি একসঙ্গে সব ফুটে ওঠে—।”

“হ্যাঁ, এক সঙ্গে অনেক না হ’লে চেরীর রূপ ঠিক ফোটে না। সে সময় ঘরে আগুন জ্বালো? log fire? বেশ লাগে দেখতে আগুন। আসা যাবে সেপ্টেম্বরে, দেখব মংপুর মেঘমুক্ত অবগুণ্ঠনহীন মুখ।”

“কিন্তু আবার আপনার আসার সম্ভাবনা না কি খুবই কম। এ জায়গা পুরোনো হ’য়ে গেছে, আমাদের আর আশা করা চলে না। যেমন বাড়ি ঘর পুরোনো হ’য়ে যায়, আপনি ঘর বদল করতে ভালোবাসেন, তেমনি আপনার চারপাশে যারা থাকে তারাও পুরোনো হয়ে যায়, এ কথা সত্যি?”

“মনোবিকলন কি একেই বলে? এ সব কথারও তুমি উত্তর দিতে পার না? পুরোনো হয়ে যাওয়াটা তো একটা fact, সে তো অস্বীকার করা চলে না। তাই ব’লে পুরোনো হ’লেই মূল্য কমে, এ কথা কে বলবে? মানুষ আর বাড়ি কি এক? মানুষ তো অচল পদার্থ নয়! তার মন নড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সেটা চৌকি টেবিল দরজা জানালার চাইতে অল্প একটু অন্যরকম, একথা বল্লে না কেন? তোমাকে সবাই খ্যাপায় আর তুমি খ্যাপো। শোন কেন ও সব কথা, সেপ্টেম্বরে আমি আসবই!”

বহুবার একথা শুনেছি কবি স্বভাবতই অসহিষ্ণু, দীর্ঘ দিন তাঁর প্রিয় কেউ থাকে না, আজ যাকে পছন্দ করেন কাল তাকে সরিয়ে দেন। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়। অবিশ্বাসের পাত্রকেও তিনি বিশ্বাস করতেন, সেই ছিল তাঁর অভ্যাস, পরে হয়ত ভুল ভাঙত। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে অসহিষ্ণু তিনি ছিলেন না। তিনি যে যথার্থ কবি, তাই তিনি সৃষ্টি করতেন মানুষকে, তাদের মন খুঁজে বের করতে জানতেন। যে রকম অবাঞ্ছিত অযোগ্যদেরও প্রশ্রয় দিতেন

ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। আমরা সাধারণত যতটুকু শিক্ষা বা সংস্কৃতি লাভ করেছি তার চেয়ে সামান্য একটু নিম্নস্তরের মানুষদের কতটুকু সময় সহ্য করতে পারি? আমাদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান ব'লে খ্যাত তাঁরা মূর্খকে দূরে রাখেন,—যাঁর ধারণা তিনি সাহিত্যিক বা কাব্যরসপিপাসু, যারা সে সব বোঝে না, আহার নিদ্রায় দিন কাটায়, তাদের তিনি কি চোখে দেখেন? যার দুশো টাকা আয় সে একশো-টাকাওয়ালার প্রতি উর্ধ্ব থেকে কৃপাদৃষ্টিপাত করে। যার এতটুকু বুদ্ধি আছে সে মনে করে জগৎ সংসারের সকল নির্বোধ লোকের সে মাষ্টার নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি? যদি পার্থিব দিক থেকে দেখা যায় তাহ'লে বাঙ্গলাদেশের এক সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারে আভিজাত্যের উচ্চশিখরে রাজকীয় তাঁর আবির্ভাব। যদি রূপের কথা ভাবা যায়, এত রূপও যে মানুষে সম্ভব তা কে জানত? ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ। অপার্থিব জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য, অপার্থিব মধুময় কণ্ঠস্বর, তবে সে কথাও থাক, কিন্তু বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি প্রতিভার যে সুদূর উচ্চলোকে তিনি ছিলেন সেখান থেকে তাঁর চারপাশের সমতল কত নীচু তা ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। তবু সেই উচ্চশিখর থেকে তিনি তাঁর চারপাশের নিম্নভূমির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নি—যেমন তুষারাবৃত হিমালয়ের হৃদয় ভেদ করে নদী ব'য়ে আসে, তেমনি তাঁর হৃদয়ের উৎস থেকে গভীর করুণা মমতাময় অন্তর্দৃষ্টি, অন্তহীন স্নেহধারা, নিয়ত প্রবাহিত হ'য়ে ব'য়ে যেত। এটা একটা কবিত্বপূর্ণ উচ্ছ্বাসের কথা নয়, সম্পূর্ণ সত্য। বুদ্ধি দিয়ে নিশ্চয়ই তিনি জানতেন অন্য পাঁচজনের সঙ্গে তাঁর নিজের কতখানি এবং কি প্রকারের প্রভেদ, কিন্তু সে প্রভেদ তাঁকে দূরে রাখত না। হৃদয়ে নিয়ত মিলিত হতেন তাঁদের সঙ্গে, যাঁরা সর্বরকমে অনেক নিকৃষ্ট। সেটা তাঁর একটা ইচ্ছাকৃত অবতরণ ব'লে মনে হত না, সেইটাই তাঁর স্বভাব। মানুষকে তিনি গ্রহণ করতে জানতেন। তুচ্ছতম লোকও যে তুচ্ছ নয়—অসম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে যে মানুষ ঘরের কোণে তুচ্ছ হ'য়ে আছে তারও অসামান্যতা

উদ্ঘাটিত করতে জানতেন—সে উদ্ঘাটন শুধু কাব্যের কল্পলোকে নয়, জীবনে প্রত্যহের ব্যবহারে। তা যদি না হোতো, কি ক'রে তিনি আমাদের মত মানুষের নিয়ত সঙ্গ সহ্য করেছেন? সহ্য করেছেন বল্লে মিথ্যে বলা হবে, খুশি হ'য়ে গ্রহণ করেছেন। আমরা চলে গেলে তাঁর খারাপ লাগত। আমরা কাছে এলে তিনি সুখী হতেন। এ যে কত বড় আশ্চর্য ঘটনা, আজ তা মনে হয়। সামান্যতম মানুষের সুখদুঃখও তাঁর জীবনে ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করত। তিনি আমাদের প্রত্যেকের সুখদুঃখের সঙ্গী হয়েছিলেন স্বভাবতই। একথা সত্য নয় যে, মানুষ তাঁর কাছে পুরোনো হ'য়ে যেত, যে মানুষ নিজের কাছেও পুরোনো হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে যার জীবন, তাঁর কাছে এলে সেও রসসিক্ত সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠত।

আজ মনে পড়ে কতদিন কত অন্যায় রকমে আমরা তাঁর সময় নষ্ট করেছি, তাঁকে বিরক্ত করেছি। কিন্তু কখনো অসন্তুষ্ট হন নি। সহস্র লোকের সহস্র রকম আব্দার সহ্য করেও এত কাজ করবার অপর্যাপ্ত সময় তিনি কোথা থেকে পেতেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। একটা ঘটনা এখনই মনে এল। একদিন শান্তিনিকেতনে একটা খুব দরকারী লেখা লিখছেন, আমি তাঁর চেয়ারের পিছনে মাটিতে আমার চিরকালের অভ্যস্ত জায়গায় বসে নিবিষ্ট মনে মাসিক পত্রিকা পড়ছি, হঠাৎ মনে হলো ঘরে কেউ ঢুকলেন। "এই যে বোসো!" তিনি তো বসলেন, তারপর প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে চলল আশ্চর্য রকম বকুনি। কবির কাছ থেকে কিছু শুনতে বা জানতে এসেছেন ব'লে মনে হোল না, নিজের কাজ সম্বন্ধে জানাতে এসেছেন। সে কাজের কী মূল্য তা জানিনা, কিন্তু যতদূর সম্ভব নীরস এবং বিরক্তিকর হ'য়ে উঠেছিল সে বর্ণনা। কিন্তু তাঁর শ্রোতা অবিচলিত ধীরভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর চালিয়ে গেলেন। একটু বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতার চিহ্ন মাত্র অনুভব করিনি। যাবার সময় আগন্তুক বল্লেন,—"ভাগ্যে আপনার সেক্রেটারিদের হাতে পড়িনি, তাহ'লে তো তিন মিনিটের কড়ার ক'রে আনত।" ভদ্রলোকটির

পায়ের শব্দ অপসৃত হ'লে বল্লেন—"ওগো অন্তরালবর্তিনী, লেখাটা তো হোলো না আজ, তুমি আমায় রক্ষা করলে না কেন ?"

"আমি কি ক'রে রক্ষা করব ? যাঁরা রক্ষা করবার অধিকারী তাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য তো শুনলেন! আপনি বল্লেন না কেন যে আপনার কাজ আছে ?"

"কাজ যে আছে সে তো বলাই বাহুল্য, ভদ্রলোক তো স্বচক্ষেই দেখলেন কাজ করছি। তবে কি জানো, আমার বিশেষ ক্ষতি হয় না। যখন দেখি এমন কথা চলেছে যা শোনবার মত নয়, আমি মনকে switch off ক'রে দিই, আমার মনে মনে অন্য কাজ চলতে থাকে, কিছু বাধা হয় না। এই যেমন ধর,—সে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যায়, অর্ধেক শুনতেও পাইনে, কি করি তখন ? মনকে switch off করে দিই, সে চলে যায় নিজের কাজে।"

সব রকম লোকের সঙ্গ থেকেই আনন্দ পেতে পরেতেন তিনি, এইখানেই তাঁর অন্যান্য খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সঙ্গে ছিল আশ্চর্য প্রভেদ।

এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা বলি। একবার কলকাতার বাড়িতে বিচিত্রায় গল্প পড়া হোলো। সভা ভাঙতে বেশ একটু রাত্রি হ'য়ে গেছে। তারপর একে একে সকলের দেখাসাক্ষাৎ শেষ করতে করতে কবির খাবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। যা হোক, সকলে চলে যেতে উনি খেতে বসেছেন—তখনই এক ব্যক্তি এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল যে বাইরের লোকজন উপস্থিত থাকলে তাঁর খাওয়ার অসুবিধা হোতো। সাধারণত আমাদের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও খোলা জায়গায় সব লোকের সামনে বসে অনাবৃত দেহে তৈল-মর্দন করতে পারেন, চাকরের দ্বারা স্নান হ'তে পারেন, সকলের সামনে খেতে তো পারেনই। কিন্তু তাঁর অভ্যাসের আভিজাত্য অন্যরকম ছিল। চাকরের দ্বারা স্নান ইত্যাদি দূরে থাক, অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত

খাব মাছের ঝোল। চৈ দিয়ে কৈ-মাছের ঝোল খাওয়া গেল। আমার চাকর উমাচরণ বাড়িতে এসে বল্লে, বাবামশায়কে আমরা যখন বলি কিছুতেই শোনেন না, আর যেই শাশুড়ী বল্লেন অমনি মাঝের ঝোল দিব্যি খেলেন।"

"একথা বল্লে আপনার চাকর?"

"তা বল্লে বৈ কি, তার বলা বন্ধ করব কি ক'রে? সে রাঁধত ভালো, তবে তার কথাবার্তাও ছিল ভালো।·· নাঃ, আজকের রান্নাটা বিশুদ্ধ স্বদেশী হয়েছে তা মানতেই হয়। আমি এই রকম নিরামিষ তরকারী আর দিশি রান্না পদন্দ করি।"

মা বল্লেন, "তোরা যে কি হয়েছিস্, নিজে রেঁধে খাওয়াসনে কেন ওঁকে? ওই বাবুর্চিগুলোকে দিয়ে রাঁধাস।"

"হাঁ, আমি রেঁধে খাওয়াব, তা হ'লেই হয়েছে। আমি রাঁধলে উনি খাওয়াই ছেড়ে দেবেন। তুলে দিলেই খান না, রেঁধে দিলে আর রক্ষে নেই।"

"ভালই হয়েছে, সে দুর্মতি হয়নি তোমার, কন্যেকে আর সৎশিক্ষে দিওনা গো, আমায় আর রান্নার এক্স্‌পেরিমেণ্টের ভিক্‌টিম্ ক'রে কাজ নেই!"

হরিপদ বল্লে,—"দিদিমণি তো প্রায়ই রাঁধেন, ভয়ে বলেন না।" উনি কাঁটা চামচ রেখে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন,—"এ অন্যায়, এ unfair, অসতর্ক আক্রমণ বলা চলে একে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে খাই, ভালমন্দ সব সমান হ'য়ে যায়, কখন কি ব'লে ফেলি ঠিক নেই। কত সময় হয়ত মনে ব্যথা দিয়ে ফেলেছি। তা ছাড়া আমার কাছ থেকে পরামর্শ নাও না কেন? রান্নার অনেক পরীক্ষা করতুম এক সময়ে, ফল মন্দ হ'ত না। তোমায় অনেক নতুন পন্থা বলতে পারতুম।"

দুপুর বেলা হঠাৎ শান্তিনিকেতন থেকে টেলিগ্রাম এল, শীঘ্র ফেরা প্রয়োজন। টেলিগ্রাম নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম। নিবিষ্ট মনে

পড়ছিলেন, বইটা মুড়ে কোলের উপর রেখে বল্লেন—"কি সংবাদ ?" টেলিগ্রাম পড়া হোলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, "তুমি পড়েছ ?"

"হাঁ।"

"এ খবর শীঘ্রই আসবে জানতুম, তাই তুমি যখন বিবর্ণ মুখে এসে দাঁড়ালে, ভাবলুম যাবার খবর নিশ্চয়ই। মন খারাপ ক'রে কি করবে বল ? কাজ আছে যে, কাজ! বলেছি তো তোমাদের সেপ্টেম্বরে আসব, যাওয়া না হ'লে তো আসা হয় না,—যাওয়াটাও ভালো আসাটাও ভালো, তা মানো না তুমি ? যা হ'তেই হবে তার সঙ্গে তর্ক ক'রে তো লাভ নেই, তার চেয়ে হাসিমুখে অনুমতি কর।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আর পড়া হয় নি। বারান্দার মাঝখানে চৌকি টেনে এনে বসেছিলেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে এল, বৃষ্টি থেমে কুয়াশার বন্ধন মোচন ক'রে পাইন গাছের আড়ালে হোলো চন্দ্রোদয়। মৃদু জ্যোৎস্নায় সামনের পাহাড়ের আঁকা বাঁকা সীমান্ত-রেখা ফুটে উঠেছে। নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝখানে শুধু বিরামহীন ঝিঁঝির ডাক। বহুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলেন, তারপর বল্লেন—"না, মানতেই হয় এ জায়গাটা বড় নির্জন। তোমাদের বয়সের পক্ষে বড় বেশি নির্জন। এই রকম সন্ধ্যায় দিনের পর দিন যদি একা বসে থাকতেই হয়, তবে তার বেদনা, তার ভার মনকে ক্লান্ত করতে পারে।"

"একটা গান করুন।"

"কী গান করব বল ?"

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে ওই গানটা করেছিলেন—'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে।' গানের সুরকে তো ধরে রাখা যায় না, ধরে রাখা যায় না সেই মাধুর্যমণ্ডিত আবেষ্টন যা সুর সৃষ্টি করে, সে যে এক আশ্চর্য সৃষ্টি। নির্জন বনচ্ছায়ায় অস্ফুট চন্দ্রালোক আগেও তো ছিল, কিন্তু সেই

সুরধ্বনিতে যেন নিয়ে গেল অন্যলোকে। ক্রমে ধীরে ধীরে সবাই এসে বসলেন পিছনে—

"ওগো সবার ওগো আমার বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার
অন্তবিহীন লীলা তোমার জনম মরণ হে……
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর
মুক্তি আমার বন্ধন ডোর
দুঃখ সুখের চরম আমার জনম মরণ হে।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে।
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।"

"ডাক্তার, একটা সুপরামর্শ দিই শোনো—আমাদের সঙ্গে সবাই চল, বেশ কয়েক দিন বেড়িয়ে আসবে। একটা গাড়ী নেওয়া যাবে, দিব্যি গল্প করতে করতে সবাই কলকাতা। তা নয়, তোমরা মন খারাপ ক'রে এখানে বসে থাকবে, সে কি ভালো লাগে? কি বল?"

ওঁর কাছে নিতান্ত বিনীতভাবে 'যে আজ্ঞে' বলে, ডাক্তার বাইরে এসে অন্যমূর্ত্তি। "কি করা যায়, উনি বল্লেন, রাজী হ'তে হ'ল কিন্তু কাজ আছে যে, কাজ!" সবাই তখন যাবার উৎসাহে উৎসাহিত, তুমুল আলোচনা চলল। এ ঘরে ফিরতেই গুরুদেব বল্লেন,—"কি, তোমাদের কলধ্বনি তো তিস্তাকে হার মানাল! জানো তো তোমরাও যাচ্ছ! আমি ডাক্তারকে বলে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি।"

"ঠিক হয়নি এখনও, সেই আলোচনাই তো চলছে, কাজ আছে বলছেন।"

"তাইতো, সবাই বলে কাজ আছে, কাজ আছে, মাঝ থেকে তোমার বিপদ। কিন্তু একবার যখন দক্ষিণাচরণ সেন হ'য়ে গেল তখন আবার আলোচনা কেন? দক্ষিণাচরণ সেনকে জানো তো? যাঁর নাম D. C. Sen, অর্থাৎ decision একবার যখন হ'য়েই গেছে তখন আর পরিবর্তন চলে না।

"এবার কি রিয়াং থেকে ট্রেনে যাবেন? নদীর পাশ দিয়ে ট্রেনের পথ অনেক সুন্দর কিন্তু।"

"নিশ্চয়, তা হ'লে সেই পথেই যাব, ডাক আমার কর্তাকে।"

"বিদায়ের দিনে মংপুর আকাশ তো প্রসন্ন হাসি হেসেছে। এতটা আশা করিনি। সিন্‌কোনা কাননের ভিতর দিয়ে মনোরম এই পথটি।"

সাত মাইল দূরে মংপু পাহাড়ের পদপ্রান্তে রিয়াং ষ্টেশন, সে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। একেই তো ট্রেনটি একটি খেলনার গাড়ী, তদুপযুক্ত লাইন এঁকে বেঁকে নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ছোট একটি কাঠের ঘরের মধ্যে তদুপযুক্ত আস্তানা ষ্টেশন মাষ্টারের। সজনে গাছের নীচে পাহাড়ীদের চাএর দোকান, তাদের প্রধান বিপণিসম্পদ। ট্রেন আসতে তখনও কিছুক্ষণ দেরি ছিল, কোনো রকমে একটা ভদ্র গোছের হাতওয়ালা চৌকি যোগাড় ক'রে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর ওঁকে বসানো হোলো। সামনে প্রকাণ্ড উদ্ধত পাহাড় গভীর অরণ্য বুকে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, নীচে স্রোতস্বিনী কলভাষিণী নদী, মাঝখানে বসে আছেন জগতের মহাকবি, মহিমান্বিত স্তব্ধ সমাহিত মূর্তি। ধূসর রংএর জোব্বা পরা, মাথায় কালো টুপি, পথে সংগৃহীত এক গুচ্ছ সিন্‌কোনা ফুল হাতে। দূরের দিকে তাকিয়ে স্থির বসেছিলেন। সর্বদা দেখেছি পথে বা গাড়ীতে উনি খুব কম কথা ধীরে ধীরে বলতেন। হিমালয়ের এক প্রান্তে এই নগণ্য জনবিরল গ্রামের অতি ক্ষুদ্র ষ্টেশনের ধূলিমলিন প্ল্যাটফর্মের উপর জরাজীর্ণ চৌকিতে বিশ্ব আদৃত মনীষী বসে আছেন, এ একটা দেখবার মত ঘটনা। ক্রমে ক্রমে যে কয়েকজন সম্ভব দর্শক জুটে গেল, ষ্টেশন মাষ্টার ও কেরানী প্রভৃতি যে দু'তিন ঘর বাঙালী আছেন তাঁদের অন্তঃপুরচারিণীরা সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃত হ'য়ে এসে প্রণাম করলেন একে একে।

মনে পড়ে সেবার গাড়ীতে আমরা কি আনন্দ কোলাহলে কাটিয়েছিলাম,—ছোট খেলার গাড়ীর একটা কম্পার্টমেণ্ট, চেয়ারে

বসে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। আর আমরা ওঁর পিছনে বসে সবাই মিলে মহাসমারোহে ভোজনপর্ব চালাচ্ছিলুম। তখন বর্ষা শুরু হয়েছে, স্রোতস্বিনী তিস্তার ঘোলা মেটে জল বড় বড় পাথরের চারিদিকে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছে। খুকু বল্লে—"দাদু, জল যায় ভেসে।" দাদু বল্লেন—"এইত বেশ হয়েছে, এখন আর একটা লাইন বল, এতো প্রায় হ'য়ে এল।" কিন্তু খুকুর দৌড় ওই ভেসে যাওয়া পর্যন্তই, আর অগ্রসর হোলো না। অগত্যা দাদুই বল্লেন, "বলনা, জানিনে কোন্ দেশে।" মাসী ব্যাগ খুলে কাগজ পেন্‌সিল বের করলেন। "হাঁ হাঁ, লিখে ফেল তুই কবির ডুয়েট।"

প্রায় সমস্ত পথই বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসেছিলেন। "ঐ যে দেখলে না ফুলগুলো, ওকেই তো বলে Lily of the Valley! না, এ পথটা দর্শনীয় বটে।"

শিলিগুড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতে খবর রাষ্ট্র হ'য়ে গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে প্ল্যাটফর্মে আর জায়গা রইল না। সারি সারি ছেলের দল খাতা পেনসিল নিয়ে তার মধ্যেই অটোগ্রাফের জন্য তৈরি হ'য়ে গেছে,—ইস্কুলের মেয়ের দল, নানা শ্রেণীর, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, এমন কি অর্ধাবগুণ্ঠনবতীরাও ঠেলাঠেলি ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছেন। কোনো মতে গাড়ীতে তোলা গেল। ছোট একটা ফার্ষ্ট ক্লাস 'কুপে', আমাদের কামরা তার পাশেই। কয়েকজন বিজ্ঞ গোছের স্থূলকায় ভদ্রলোক অনাবশ্যক ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন সাহায্য করার জন্য, শ্রীযুক্ত চন্দ বিনম্রভাবে কোনমতে তাঁদের সে সৎ চেষ্টা থেকে বিরত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করতে হোলো। ওঁকে খেতে দিতে হবে তো! কিন্তু ওঁর এটা ভালো লাগছিল না, অত্যন্ত সংক্ষেপে খাওয়া সেরে বল্লেন, "দরজা খুলে আলো জ্বেলে দাও।"

দলে দলে লোক ঘরে ঢুকে প্রণাম ক'রে নেমে যেতে লাগল। দু'একটি ছেলে সই করিয়ে নিলে তাদের খাতায়। নানা শ্রেণীর ছেলে মেয়ে বয়স্ক শিশু সবাই এলো। উনি স্থির স্তব্ধ হ'য়ে নীচের

দিকে চেয়ে বসে আছেন। হাতজোড় ক'রে সকলকে প্রতিনমস্কার করছেন। আমরা এক কোণে দাঁড়িয়ে এদৃশ্য দেখতে লাগলুম। দেখে দেখে মন ভ'রে ওঠে। সব লোক চলে যাবার পরও তেমনি স্থির বসে রইলেন। সেবার কলকাতা পৌঁছে ষ্টেশনে নেমেও কিছু অন্যমনস্ক দেখেছিলুম তাঁকে। পরে জোড়াসাঁকোয় ডেকে পাঠালেন, দুপুর বেলা। একটা পাতলা সাদা পাঞ্জাবী প'রে বসে আছেন পাশে একরাশ রজনীগন্ধা। আমাদের পাহাড়ী পোষাক বদল ক'রে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

"দেখ আজ সকালে ষ্টেশনে তোমাদের কাছে যথোপযুক্ত বিদায় নেওয়া হয়নি, কখন তোমরা চলে গেলে, এত অন্যমনস্ক ছিলুম দেখতেই পাইনি। কাল সন্ধ্যে থেকে ভাবছি। যখন ভীড় ক'রে দাঁড়াল সব গাড়ীর সামনে, আমার কী আশ্চর্য বোধ হল বলতে পারিনে। কেন সবাই এমন ক'রে আমাকে দেখতে চায়! এই দেখতে চাওয়ার মধ্যে একটা অকথিত উপদেশ আছে, সে বলে আমরা তোমাকে যে সম্মান দিচ্ছি, তোমার জন্যে যে ভক্তির উপহার এনেছি তুমি তার যোগ্য হও। মন আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। জীবনে কতবার এমন ঘটেছে, মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন অজস্রধারায় পেয়েছি, ভাবছিলুম বসে বসে সত্যি আমার পাওনা কতটুকু তার মধ্যে। যখন দলে দলে এসে প্রণাম করতে লাগল, বলব কি, মুখে কথা সরে না। এতো প্রণাম নয়, এ আশীর্বাদ। এ বলে তুমি এই প্রণামের যোগ্য হও, যোগ্য হও। তাইতো বল্লুম তোমাদের, দরজা খুলে দাও, যদি আমার ভিতরে এমন কিছু থাকে যা তারা দেখতে চায়, তবে দরজা বন্ধ করবার অধিকার তো নেই আমার।"

হায় হায় এত প্রিয় এতই দুর্লভ যে সঞ্চয়
একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয়,
হে অসীম তব বক্ষমাঝে
তার ব্যথা কিছুই না বাজে।

তৃতীয় পর্ব

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯—তৃতীয়বার মংপু পৌঁছালেন।

সুধাকান্তবাবুর চিঠি এল—গুরুদেব ১০ই সেপ্টেম্বর মংপু পৌঁছবেন, যদি শেষ পর্যন্ত মত না বদলায়। ইতিমধ্যে বার দুই তারিখ বদল হয়েছিল। তাই আশা করছিলুম এবার হয়তো আর বদল হবে না। মংপু থেকে শিলিগুড়ি পঁয়ত্রিশ মাইল দূর এবং এই পথটা একেবারেই সহজ নয়—এই দুর্গম পথে কষ্ট ক'রে বার বার উনি আমাদের কাছে এসেছেন, সে আমাদের কোন্ পুণ্যে তা জানি না।

সকালবেলা express এসে পৌঁছতেই আমরা invalid চেয়ার নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দৌড়লুম। দূর থেকে ধূম উদ্গীরণ করতে করতে বিশাল সরীসৃপ এগিয়ে আসছে। অনেকগুলো কামরা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল, দেখি একটা জানলার ভিতর থেকে সুধাকান্তবাবু মুখ বাড়িয়ে হাত নাড়ছেন, ভাবখানা রীতিমত বিষণ্ণ। গাড়ী না থামতেই আমরা খোঁজা খুঁজি শুরু করেছি—সুধাকান্তবাবু নেমে পড়ে বল্লেন, "আসেন নি!—না না ঠাট্টা নয়, সত্যিই আসেন নি।—কাল যা প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল, সমস্ত পথে জল জমে গিয়েছিল, গাড়ী চলাচল বন্ধ হবার যোগাড়। এমন সময় খবর এলো, কাগজে বেরিয়েছে, এদিকেও প্রচণ্ড বৃষ্টি, স্লিপ্ হ'য়ে রাস্তা ধ্বসে গিয়েছে। এ সময় কখনো ওঁর আসা উচিত হবে না, যদিই পথ না থাকে। গুরুদেব তো বার বার বলছেন যে কখনই কিছু হয় নি, তাহ'লে তারা নিশ্চয় খবর দিত। সে জন্যই তো গুরুদেব বল্লেন, সুধাকান্ত তুই যা, সে বেচারাকে বল্‌গে এই বিপদ। আমি তো স্বাধীন নই আমি জানি এসব কিছুই হয় নি, কিন্তু উপায় কি?"

"আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, এ কি মেঘাচ্ছন্ন?"

"না, নির্মল নীল।"

"মাটির দিকে চেয়ে দেখুন, সব কি ধ্বসে যাচ্ছে?"

"না শুক্‌নো খট্‌খটে।"

"তবে গুরুদেবকে একটা চিঠি দিন, এখনই পোষ্ট ক'রে ফিরে যাই।"

ফিরে এসে ছুদিন ধ'রে আমরা জোর প্রার্থনা শুরু করলুম, আর যাই ঘটুক এর মধ্যে যেন বৃষ্টি না নামে এবং রাস্তা না ধ্বসে। এ ছুদিন একটু মেঘের চিহ্ন দেখলেই আমাদের আতঙ্ক হতো, কী জানি মহৎ লোকেরা যা বলেন ঘটনা নাকি তারই অনুসরণ করে।

ট্রেন থামতেই দেখি আলুবাবু জানালা দিয়ে অর্ধপ্রকাশিত হ'য়ে হাত নাড়ছেন। ডাক্তার বল্লেন, "এবারে আর একজন ভগ্নদূত বোধ হয়।" যাই হোক, দূতের প্রতি দৃকপাত না ক'রে আমরা ট্রেনের সঙ্গে চলেছি, দেখি যথারীতি একটা ফার্ষ্ট ক্লাশ 'কুপে'র মধ্যে জিনিষপত্র চারদিকে ছড়িয়ে বসে আছেন।

ঢুকতেই বল্লেন, "রোসো রোসো, আগে আমার ক্ষমা প্রার্থনাটা হ'য়ে যাক।" আমরা প্রণাম ক'রে বল্লুম, "কী বলেন তার ঠিক নেই।" ব্যস্ত হ'য়ে আমরা জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে লাগলুম।

"দেখ, আমার কোন দোষ নেই।"

"আপনার আবার দোষ কি? আপনি যদি ইচ্ছে ক'রে একশোবার মত বদলাতেন আর আমাকে দৌড়দৌড়ি করতে ও নিরাশ হ'তে হোত, তাহ'লেও আমার একটুও খারাপ লাগত না, বরং মজাই লাগত। কিন্তু আর কেউ যদি আপনার আসা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে দেয়, ভীষণ রাগ হয় আমার।"

"কী দারুণ পক্ষপাত! পক্ষপাতদুষ্ট বলা চলে একে। আমি শুধু শুধু এ পাগলামি করতে যাব কেন? বরং আমার খুব খারাপ লেগেছিল। জানো, রাত্রে আমার ঘুম হয়নি ভাল ক'রে। আমার কেবল মনে হয়েছে—একটু স্বাধীনতা নেই আমার, তোমরা এসে

সারারাত বসে রয়েছ, কত নিরাশ হবে। আমি বল্লুম বারবার ক'রে যে, যদি এমন একটা বিপর্যয় ঘটে, তারা কি খবর দিত না? কিন্তু তার উত্তর তো প্রস্তুতই রয়েছে,—রাস্তাই শুধু ভাঙেনি, রেল লাইন ভেঙেছে হয়তো,—টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে গেছে হয়তো, মংপুটা উড়ে গিয়ে স্বর্গের এক কোণে বাসা নিয়েছে হয়তো,—এসব হয়তো-র কোনো উত্তর নেই, সবই হয়তো,—'হয়তো না'ও যে একটা হতে পারে তা শোনে কে?

সব জিনিষপত্র চারটে গাড়ীতে তোলা হ'ল। আমাদের গাড়ী চলল মাঝখানে। তখন মংপু পাহাড়ে মোড় ঘুরে ঘুরে উঠছি। যে প্রকাণ্ড গাড়ীটাতে আমরা ছিলুম সেটা একটু টাল খেল। আমি ড্রাইভারকে বল্লুম, থামাও, আমরা ছোট গাড়ীতে যাব। সে বল্লে, কিছু হবে না, আস্তে আস্তে উঠতে গেলে এই রকমই হয়। আমি বল্লুম, তাহোক আমরা অন্য গাড়ীতে যাব। তার অল্প দিন পূর্বেই আমাদের একটা সাংঘাতিক মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, সেই থেকে ভয়ে ভয়েই ছিলুম। তাছাড়া ওঁকে নিয়ে চলেছি, তার দায়িত্বও তো কম নয়। ইতিমধ্যে অন্য সব গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, এঁরা সব এসে উপস্থিত। "কী ব্যাপার?"

"আমরা অন্য গাড়ীতে যাব?"

গুরুদেব এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এইবার বল্লেন, "কেন? আমি তো যাব না, শোনো কেন কথা! যত সব অহৈতুক ভয়। ভীতু কোথাকার! নিজেই বলেছেন আস্তে চালাতে, এখন টাল খেতেই ভয়।"

"তা হ'লই বা, অন্য গাড়ীতে গেলে ক্ষতি তো কিছু নেই।"

"ক্ষতি বিশেষ, তোমার না হ'তে পারে, কিন্তু বেচারা ড্রাইভারের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হয়। ওর তো কোনো দোষ নেই, শুধু শুধু নেমে যাব, ওর অপমান হয় না?"

"ও কিছু মনে করবে না।"

"নিশ্চয় মনে করবে। নিশ্চয় খুবই দুঃখ হবে, কিন্তু ও বেচারার উপায় নেই, তাই ওকে চুপ ক'রে মেনে নিতেই হবে।"

বাড়ির বারান্দায় উঠেই বল্লেন, "সুধাকান্ত, বাড়ি গিয়ে বলিস, কি লোকের কাছেই এসেছি—পথে গাড়ী উল্টে যায় যায়, আর ইনি—যিনি আমার অভিভাবিকা, তিনি তো এক লাফ দিয়ে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ ক'রে প্রাণ বাঁচালেন।"

তখন দুপুরের রোদ সামনের পাহাড়ের উপর প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে—বারান্দায় চৌকিটা এগিয়ে নিয়ে বসলেন। সামনে গভীর অরণ্যের পরিব্যাপ্ত নীলিমা, মনে পড়ে কি মধুর হাসি হাসলেন,—"কি ভাবছ কি সীমন্তিনি? আসা তো হলো,—কতবার এলুম বল।"

সুধাকান্তবাবু ফিরে চলে গেছেন। খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে শ্রান্ত চাকররা এবং অন্যান্য সকলেই বিশ্রাম করছেন, আমি ওঁর লেখবার ঘরে এসে দাঁড়ালুম। আরাম চৌকিতে বসে আছেন, যেমন পায়ের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে গিয়েছিলুম তেমনি ঢাকা আছে, কোলের উপর দুই হাত একত্র করা, আঙুলগুলি পরস্পর সন্নদ্ধ। কাঁচের ভিতর দিয়ে পড়ন্ত আলো এসে রেশমের মত সাদা চুলের উপর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ঈষৎ নিমীলিতভাবে চেয়েছিলেন মাটির দিকে, চাদর দিয়ে ঢাকা হাত পা একটু একটু নড়ছিল, তাছাড়া আর সব স্তব্ধ। একটা গভীর নীরবতা যেন ওঁর চারিদিকে বেষ্টন করে ওঁকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যে মানুষ এই কিছুক্ষণ পূর্বে আমাদের সঙ্গে এত গল্প এত রকম হাসি কৌতুক করছিলেন, অজ্ঞাত-কুলশীল নগণ্য ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মান অপমানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সে মানুষ যেন তিনি নন। দূর আকাশের কোণে মেঘাবৃত তুষার-পর্বতের মত স্থির তাঁর মূর্তি আমার সমস্ত

শরীর মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব আশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে এল, হৃদয় বিগলিত হয়ে চোখে জল এল জানি না কেন—মনে হ'ল কে ইনি, আমার ঘরে এসেছেন, ইনি কি আমাদের এত আপনার? এঁকে কি আমি এই একটু আগে পীড়াপীড়ি ক'রে খাওয়ালুম, ঘুমুতে চাননি ব'লে এত তর্ক করলুম, এত গল্প করেছি একটু আগেই, সে কি ইনি? বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি না করে বলা যায়—সেই মুহূর্তে কিন্তু কিছুতেই তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলা চলত না—কেন তা জানি না। তবে এও জানি, তখনই কোনো সামান্য কথা বললেও উনি উত্তর দিতেন এবং ফিরে আসতেন আমাদের মধ্যে এক মুহূর্তে। কিন্তু তবুও বলা চলত না। বহুবার অমন হয়েছে, তাঁর কাছে নীরবে বসে থেকে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আশ্চর্য অনুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সে ভক্তি নয়, ভালোবাসা নয়, সে অন্য কিছু। আমরা সামান্য সাধারণ মানুষ, প্রবলতম প্রতিভার সামনে তাই বোধ হয় সে এক অভিভূত অনুভূতি।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম মনে নেই। হঠাৎ উনি যেন জেগে উঠে আমায় দেখলেন—"কখন এসেছ তুমি? এসো সামনে এসো, বোসো ওই চৌকিটা নিয়ে। কি, ভাবছ কি অত গম্ভীর হয়ে?"

"ভাবছি কি ক'রে এ সম্ভব হয়,—কি ক'রে এ সম্ভব হয় যে আমরা দুঃখিত হয়েছি নিরাশ হয়েছি মনে ক'রে আপনার সারারাত ঘুম হয় না? কোথাকার এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার, সে দুঃখিত হবে মনে ক'রে বিপদ সত্ত্বেও গাড়ী থেকে নামবেন না? আপনি কি আমাদের এত আপনার? তাতো মনে হয় না। আপনি যখন চুপ ক'রে বসেছিলেন, তখন আমি আশ্চর্য হ'য়ে ভাবছিলুম আপনার মনে আমাদের কোনো স্থান থাকা সম্ভব কি না। মনে হয় না আপনি আমাদের কেউ।"

কিছুক্ষণ নীরবে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বল্লেন, "তা যদি বল তাহ'লে সত্যি কথাই বলব, আমি তোমাদের কেউ নই।

যাকে তোমরা ভালবাসা বল, সে রকম ক'রে আমি কাউকে কোনদিন ভালোবাসিনি। আমি বৃহৎ সংসারে বাস করেছি, প্রিয়জনের অন্ত ছিল না, আর আজ তো আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়ে তোমরা যারা পর, তারাই আমার বেশি আপনার হ'য়ে উঠেছ। কিন্তু একথা ঠিক, বন্ধুবান্ধব সংসার স্ত্রীপুত্র কোনো কিছুই কোনোদিনই আমি তেমন ক'রে আঁকড়ে ধরিনি। ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম,—তাই আজ যে জায়গায় এসেছি সেখানে আসা আমার সম্ভব হয়েছে। তা যদি না হ'ত, যদি জড়িয়ে পড়তুম, তাহ'লে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যেত। বহু আগেই ভেঙে পড়ে যেত ধূলোয়, কোন বন্ধনই আমায় শিকল হ'য়ে বাঁধেনি কোনদিন। চিরদিন মনে মনে আমি উদাসী—ছোটবেলা কেন, শিশুকাল থেকেই। যখন দুপুর বেলা একা একা ছাদে বসে থাকতুম, রোদ ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠত, পথ দিয়ে ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত তাদের উচ্চ সুর, আর মাঝে মাঝে উড়ে যাওয়া চিলের ডাক আমার মনকে উধাও ক'রে নিয়ে যেত,—নির্জন দুপুরে সেই চিলের ডাক, যেন সুদূরের ডাক। একা একা তেতলার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতুম, সেই থেকেই শুরু হয়েছে। চিরদিন আমি সংসারের শত সহস্র রকম কাজের মধ্যে রয়েছি,—কিন্তু আমার মন, নৌকো যেমন তীরের বন্ধনের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে ভেসে যায়, তেমনি ভেসে চলেছে। ঘাটের বন্ধন আমার জন্যে নয়। যদি তা হোতো, যদি সংসারের অসংখ্য ছোট বড় বন্ধনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জড়িয়ে পড়তুম, তা'হলে আমার সব নষ্ট হ'য়ে যেত। আমার ভাগ্য-দেবতা তা হ'তে দেবে না, তাহ'লে যে সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। তাই একদিন লিখেছিলুম—আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী—এ কিন্তু একটা কবিত্বের কথা মাত্র নয়। লোকে মনে করে এটা কবির একটা মুড্‌মাত্র। কিন্তু তা ঠিক নয়। এ আমার জীবনের একটা গভীরতম সত্য যে আমি সুদূরের পিয়াসী।"

সুধাকান্তবাবু বলেছিলেন, আজকাল এক কবিরাজী ওষুধ খাওয়া ধরেছেন। মংপু পৌঁছেই দ্বিতীয় দিনই বেরুল সেই ওষুধ।

"এটাতে আমি খুব উপকার পাব, একজন অভিজ্ঞ লোক আমায় বলেছেন। সকলেরই এতে আপত্তি, কিন্তু আমি জানি এ খুব ভালো জিনিস।"

"হ'তে পারে, তবে কিনা এর মধ্যে কি আছে না আছে জানা নেই, লেখাও থাকে না, ডাক্তার আপনাকে যা খেতে বলেছেন সেটা আনিয়ে নিই বরং।"

"ঠিক এই কথাই তোমাদের কাছ থেকে আমি প্রত্যাশা করি, দাসমনোবৃত্তি একেই বলে। যেহেতু ওটা সাহেবদের হাতে বিলেতে তৈরি, ওটা খারাপ হতেই পারে না। আর এটা এই অভাগা দেশে তৈরি হয়েছে কিনা, এ খারাপ না হ'য়েই যায় না। যাঁরা জানেন তাঁরা বলেছেন ভালো। তোমরা কিছুই জানো না, কোনো ধারণাই নেই তোমাদের ও পদার্থটার সম্বন্ধে, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। যেহেতু ওটা দেশে তৈরি—"

"কিন্তু সুধাকান্তবাবু যে বলছিলেন, রথীদারও—"

"জানি আমি, আপত্তি আছে। কিন্তু কেন? তোমার রথীদা কি কবিরাজ? যাচ্ছি, এখুনি সুধাকান্তকে লিখব যে অনুমতি দাও, আজ্ঞা কর, নৈলে তো চলছে না। ভালো এক অভিভাবক হয়েছে আমার।"

"আচ্ছা বেশ তো, খান না আপনি, ভালো ওষুধ বলছেন যখন তখন আর আপত্তি কি।"

"ওকি ও, দুটো পেয়ালায় ঢালছ কেন?—আরে তুমি আবার খাবে কেন? কি বিপদেই পড়েছি! আচ্ছা আলু, একে কি বলা যায়?"

"কেন, ভালো টনিক যখন, খেলে তো আমিও বল পাব।"

"আর বলে কাজ নেই, যা আছে তাই যেন বাড়াবাড়ি ঠেকছে। তোমরা হলে শক্তিরূপিণী, সাধে কি কবি লিখেছেন, অবলা কেন মা এত বলে ?"

পরের দিন খাবার সময় আবার ওষুধ নিয়ে এসেছি।—"কি, আজও তুমি খাবে নাকি ? কালকের ফলাফল কি রকম হলো ?"

"একদিনে কি বোঝা যায় ? ভালো ওষুধ যখন, ভালোই হবে নিশ্চয়।"

"কিন্তু আজ সকালে তুমি দেরিতে এসেছিলে, তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল ?"

"ও সে নিশ্চয় অন্য কারণে, ভালো টনিকে শরীর খারাপ হয় কখনো ?"

"না না, তোমার খাওয়া চলবেই না। আলু, একি বিপদে পড়েছি রে ? একে কি বলে ? সহমরণের প্রবৃত্তি ?"

"মরণের প্রবৃত্তি কেন, ভালো জিনিস যখন, এতো জীবনের প্রবৃত্তি।"

আলুবাবু বল্লেন, "আচ্ছা, তাহ'লে আজ আমি খেয়ে দেখি—"

"তুই থাম আলু, তোর সঙ্গে সহমরণে যেতে কে চায় ? দেখ কন্যে, তুমি যদি একলা হ'তে আমার ভাবনা ছিল না, কিন্তু তুমি যে আড়াই জন, তোমার উপর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চলবে না।"

"ও সে তো নিশ্চয়, অমূল্য আমার জীবন। আর আপনি মাত্র একজন কিনা, আপনার উপর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট অনায়াসে চলবে। যাক্, অন্য দেড়জনের জন্যে চিন্তা করবেন না, সংসারে কেউই indispensable নয় !"

"সে তো জানিই, আর তা ছাড়া আমরা পাঁচজন রয়েছি কি করতে ? যদিই তোমার এমন তেমন একটা কিছু হ'য়েই যায় তা'হলে আমরা সবাই মিলে ডাক্তারের কি একটা ব্যবস্থা করব না ? সে হ'য়ে যাবে, তুমি কিছু ভেবো না। কি বলিস আলু, নৈলে

এখানে আমরা আসব কি ক'রে, কে আমাদের দেখাশোনা করবে—আর থাক থাক, আর ঢালতে হবে না, আমার ওষুধে কাজ নেই,—চাতুরীটা বেশ ভালো রকম আয়ত্ত করেছে। অধ্যাপকের মেয়ে হ'লে কি হবে, সূক্ষ্ম ডিপ্লোম্যাট্ !"

"কাল মাসী আসবে।"

"আসবে ? বাঁচা যাবে তাহ'লে।"

"কেন, মাসী না আসাতে আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে ?"

"হচ্ছে বৈকি, বিশেষ অসুবিধা। বাড়ির যিনি গৃহিণী, অর্থাৎ যাঁকে নৈলে গৃহের কোনো অর্থই থাকে না, তিনি যখন গৃহকর্ম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে অতিথি সৎকার বিস্মৃতি হ'য়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পত্র রচনায় ব্যস্ত থাকেন, তখন এ অভাগাদের কি গতি হয় ? বাবাঃ, কি চিঠি, চিঠিতো নয় মহাকাব্য, অথচ আমাদের বেলায় তো কখনো চার আঙুলের চাইতে বড় চিঠি দেখলুম না। আচ্ছা, আজ সকাল থেকে করছিলে কি ? চিঠির যিনি মুখ্য কারণ, প্রধান উৎস, তিনি তো একটুক্ষণ বাদেই এসে উপস্থিত হবেন কাজেই চিঠিতো নয় ?"

"না চিঠি নয়।"

"চিঠি নয় তবে কি ? ও বুঝেছি, তোমার সেই ডায়েরি। আচ্ছা নিয়ে এসো দেখি কি লিখলে ? কী চুপ কেন, আনোনা দেখি,—এমন কি লিখলে যা আমাকেও দেখাতে পার না ?"

"তা নয়, বোঝেন না কেন, লেখাটা কিছুই গোপনীয় নয়—"

"দেখাতে লজ্জা করে, এই তো ? ওসব বাজে লজ্জা, নিয়ে এস দেখি কি লিখলে।"

"আপনি কখনো ডায়েরি লিখেছেন ?"

"কখনও নয়—ও আমার সাহসই হয় না—তা ছাড়া যা ভেসে চলে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। দিনগুলো কি ধরে রাখা যায় ?"

"কিন্তু অনেক পরে এই দিনগুলো যখন জীবনের আবছায়া স্মৃতি মাত্র হবে, তখন তো আবার ফিরে আসা যায় সেই experience-এর মধ্যে।"

"দেখ, আমি কখনো তা চেষ্টা করিনে, আমি চিরদিন ভেসে চলেছি। যে পথে এসেছি আবার তারি পুনরাবর্তন করতে ইচ্ছা হয় না আর তা ছাড়া ভালবাসার একটা প্রাইভেসি আছে, তা সকলের সামনে চেঁচিয়ে বলবার নয়। ডায়েরি লিখতে গেলেই এমন অনেক কিছু লিখতে হয় যা সকলের জন্য নয়, যা একমাত্র আমারই কথা। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি লিখছ, সে তোমার হাতের বাইরে চলে গেল। কি ক'রে জানা যায় যে কালই মৃত্যু হবে না এবং যা কাউকে জানাতে ইচ্ছে করে না তাই অনেক অবাঞ্ছিত লোকের হাতে পড়বে না? যাক্ এসব বাজে কথা, আজ সারা সকাল কি লিখলে আনো না দেখি, আমি তো কিছু অবাঞ্ছিত লোক নয়।" গান গেয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে—"তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে, তোমার গোপন কথাটি—আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে! যবে আঁধার যামিনী যবে নীরব মেদিনী, যবে সুপ্তিমগন বিহগ গীত কুসুম কাননে! তোমার গোপন কথাটি—"

"তা'লে আর একটু অপেক্ষা করুন, আগে রজনী আঁধার হোক, তারপর না হয় খাতাখানা আপনার ঘরে রেখে যাব। এই সকাল বেলার কট্‌কটে রোদের মধ্যে গোপন কথা বলা যায়?"

"এসো এসো মাতৃষ্বসা, তোমার জন্যে যে চিঠি লিখে লিখে হাঁপিয়ে উঠেছি আমরা।"

"আপনি নিয়ে এলেন না, তবু এসে উপস্থিত হয়েছি।"

"এটা অন্যায় দোষারোপ। আমি কি ক'রে জানব যে আমাদের সঙ্গ তোমার কিছুমাত্র লোভনীয়? তুমি সর্বদা যে ধ্যানে ডুবে

আছ, তাতে পৃথিবীতে আরো যে মানুষ আছে, তারাও যে নেহাৎ মন্দ নয়, তাতো তোমার মনেই থাকে না।"

"আপনার জন্যে একটা সামান্য উপহার আছে, তবে একেবারে নিঃস্বার্থ নয়।" মাসী এক বাক্স রং-তুলি-কাগজ নিয়ে হাজির।

"ও কি ও, oil colour ? এ আমি কখনো আঁকিনি।"

"এইবার আঁকুন, ছবিটা কিন্তু আমার চাই।"

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যেকটি রং দেখতে লাগলেন। "ও বাবা, এসব কি আমার কাজ ? আমার হোলো অশিক্ষিতপটুত্ব।"

অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলে, কাগজ কেটে, বোর্ড দিয়ে রং সাজিয়ে দেওয়া হ'ল, ফস্ করে একটা মুখের outline টেনে তারপর ভাবতে লাগলেন। যেন বিষম বিপদে পড়ে গেছেন। "মাসী ! একি সঙ্কটে ফেললে।"

আমরা খাবার ঘরে আড্ডা দিচ্ছি, আলু বাবু ছুটে এলেন, "শিগগির চলুন, ছবি নিয়ে হৈ চৈ করছেন"—ঘরে ঢুকে দেখি হাতে জামায় রং মেখে ছবিখানা নিয়ে বসে আছেন। একখানা মুখের outline-এর উপর কিছু রং জড়ো হয়েছে—"এসো মাসী, আমার 'মুখ' রক্ষা কর—একি আমার দ্বারা হয় ?"

তারপর ক'দিন ধ'রে চলল সেই ছবি নিয়ে। মাসী একটু ক'রে রং লাগায় আর ওঁর কাছে নিয়ে যায়, উনি আবার একটু বলে দেন কোনখানটা কি রকম হবে একটু তুলি বুলিয়ে দেন। এমনি ক'রে ছবিখানি যখন তৈরি হ'য়ে উঠল ওঁর হাতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে, মাসী রং তুলি নিয়ে এসে উপস্থিত—"আপনার নাম লিখুন !"

"সে কি, আমার নাম লিখব কেন ? তার চেয়ে তোমার নাম লিখে দিই বরং।"

"বাঃ, তা কেন, আপনিই তো এঁকে দিলেন মুখখানা।"

"তা হোক, মুখ-রক্ষা তো তুমিই করলে। কাজেই সে অধিকার না হয় ছেড়েই দিলুম তোমায়।"

"না না, আপনার নাম লিখুন—তার নীচে আমি লিখব।"

উনি সাধারণত জলের রং, রং-এর কালি, রং-এর পেনসিল কলম, এই সব ব্যবহার করতেন—তেলের ছবি ওঁর হাতের আঁকা আর বোধ হয় একেবারেই নেই।

একদিন সুন্দর রোদ উঠেছে, আকাশে অল্প অল্প শরৎ কালের মেঘ—মংপুর পক্ষে দিনটা ঈষৎ গরম বলা যেতে পারে। এখানকার কুয়াশার বন্ধন মোচন ক'রে সেদিন রোদ উঠত, উনি খুব খুশি হয়ে উঠতেন। যথারীতি বারান্দার বড় চৌকিটাতে বসে আছেন। আমরা খাবার ঘর থেকে গুন গুন গান শুনতে পাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে বারান্দায় এলুম আমরা।

"আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে। কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি।" গান গেয়ে যেতে লাগলেন,—"হে তরুণী, তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার।"

"আজ সমস্ত দিনটা যেন ছুটিতে পাওয়া। কাজের দিন নয় এ, তাই বসে বসে গাইছি—হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার। হে তরুণী—"

সে সুর মনে আছে। ইসারায় বল্লেন—কলমটা দাও। প্যাড আর কলম এগিয়ে দিলুম। গান গেয়ে লিখে চল্লেন—

"হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় বাইচো স্বপন তরী
নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার।"

প্যাডটা নিয়ে গুন গুন ক'রে গেয়ে চললেন। বিকেল বেলা যখন এলুম, দেখি লেখাটা প্রায় সবই বদল হ'য়ে গেছে এবং বিচিত্রিত ভাবে আগেকার লেখাটিকে কালির আচ্ছাদনে মণ্ডিত ক'রে আঁকা হয়েছে সুন্দর একটি ছবি, তার ফাঁকে ফাঁকে নতুন লেখাটা পড়া যাচ্ছে—

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
দিগন্তরের কুঞ্জবনে
অশ্রুত কোন গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
নীল নয়নের মৌন খানি
সেই সে দূরের আকাশ বাণী
দিনগুলি মোর ওরই ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার।

প্যাডটা ফেলে দিলেন—"লও, copy কর খাতায়।"

তার পরদিন সকাল বেলায় খাতাটা দিয়ে বল্লেন—"হে তরুণী আর একবার copy করতে হচ্ছে।" তখন দেখি কবিতাটা আরো অনেক বদলে গেছে, তার প্রথম লাইনটা হয়েছে "কে অসীমের লীলার কর্ণধার!" এমনি ক'রে পরিবর্ত্তিত পরিবর্ধিত হ'তে হ'তে বেশ কয়েক দিন পরে সে এক সম্পূর্ণ অন্য কবিতা হ'য়ে দাঁড়াল—

ছুটির কর্ণধার
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার
নীল আকাশের মৌন খানি
আনে দূরের দৈববাণী
মন্থর দিন তারি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
ভাঁটার স্রোতে উদ্দেশহীন
কর্মহীনতার।
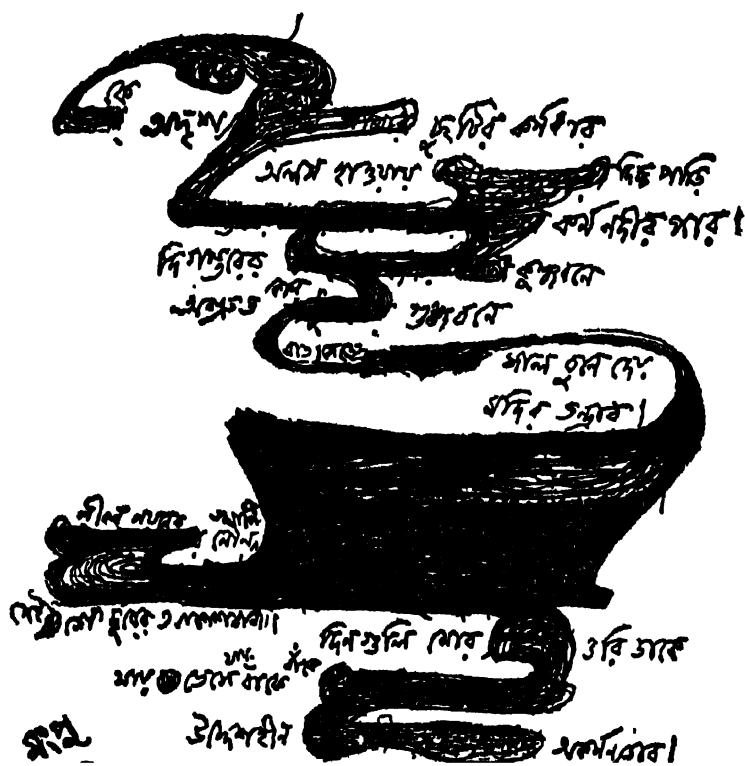
তুমি তখন ছুটির কর্ণধার
শিরায় শিরায় বাজিয়ে তোলো
নীরব ঝঙ্কার—ইত্যাদি।

কয়েক মাস পরে তার যে সংস্করণ 'সানাই'-তে প্রকাশ হ'ল তাকে চেনবার জো নেই।

"ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার
দিকে দিকে ঢেউ জাগাল
লীলার পারাবার।
আলোক ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে ক্ষণেক পিছে
আমার আঁধার ঘাটে ভাসায়
নৌকা পূর্ণিমার।
ওগো কর্ণধার
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার—"ইত্যাদি

এবং তারিখ রয়েছে ২৮।১।৪০। সেই জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় ওঁর অধিকাংশ রচনার তারিখগুলো ঠিক একটি দিনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়।

"আচ্ছা কেন তোমরা বল যে আমি কল্পরাজ্যের কবি, দেশের মাটির দিকে আমার দৃষ্টি নেই। বাংলা দেশের গ্রাম আমি জানিনে, দরিদ্র সাধারণ বাঙালী জীবন জানিনে আমি, সে ছবি আঁকিনি? খালি কবিত্ব করেছি aristocratic মেজাজে, আর সত্যিকারের দরদ দিয়ে বাঙালীর জীবন ফুটিয়েছেন—অমুক বাবু?"

"কে আবার বলে এ কথা?"

"কেন, তুমি এ সব শোনোনি?"

"না, আপনার নিন্দুকদের সঙ্গে আমার গলাগলি বন্ধুত্ব নেই তো।"

"নেই? হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম শুনে, কেবলি সন্দেহ হয় তুমি বুঝি নিন্দে ক'রেই বেড়াচ্ছ। তা নয়, কিন্তু এটা ঠিক যে নিন্দুকরা তাদের সামনেই বেশি ক'রে ক'রে বলে, যারা শুনে বেদনা পায়,— তাতেই বিশেষ আনন্দ।"

"এ কথাটা মানি সত্যি, কারণ অনেক ভুগতে হয়েছে।"

"তবে অস্বীকার করছিলে যে বড়? অনেক গল্পই ঘুরে আমার কানে আসে। কে একজন বলছিল, সে শুনেছে সুন্দরী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে কাছে আসতে দিই নে। আহা, শুনে রোমাঞ্চ হয়। এ ব্যবস্থা করতে পারলে মন্দ হ'ত না! শান্তিনিকেতন তাহ'লে স্ত্রীজাতি-শূন্য হোত। আর নিশ্চয় যারা এ কথা বলে তারা তোমায় দেখেনি। তোমার কি গতি হ'ত তাহ'লে?"

"কী অপমান! কেবল বয়স আর চেহারা নিয়ে এ অপমান আর তো সহ্য হয় না।"

"না না, বয়স নিয়ে তো আমি কিছু বলিনে। আমি তো স্পষ্টই জানি তোমার বয়স পঁয়তাল্লিশের* একটুও বেশি নয়।··· আরো শুনেছি আমার নাকি একটা কাঁচের ঘর আছে, তার সমস্ত ছাদটা কাঁচের ডোম। রাত্রিবেলা সব তারা দেখা যাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। ভোরবেলা সুন্দরী মেয়ের গান শুনে তবে আমার ঘুম ভাঙে। আর স্নানের যা আয়োজন সে আর ব'লে কাজ নেই। সোনার গামলায় জল; তাতে যে আতর ব্যবহার হয় তার এক তোলার দাম ১০০৲ টাকা। সেই বিশেষ আতরটি আমার চাই-ই·· "

"আমি আরো গল্প জানি, ডালিমের রস খেয়েই তো আপনার রং অত ফরসা, রোজ খাবার পর একটু স্প্যানিশ ওয়াইন আপনার চাই-ই।"

"সত্যি নাকি, একেবারে স্প্যানিশ? অন্য কিছু হ'লে হবে না? তা এসব শুনেও তো তোমার আতিথ্যের কিছু উন্নতি

* লেখিকার বয়স তখন পঁচিশ বৎসর।

দেখছিনে, চারিদিক একেবারে শুক্‌নো খট্‌খটে, কোথায় বা স্প্যানিশ ওয়াইন কোথায় বা স্পার্ক্‌লিং বার্গাণ্ডি ? আছে খালি চালকুমড়োর রস,—যাক্‌ যে কথা বলছিলুম। বাংলা দেশের গ্রাম আমি দেখিনি এটা সত্যি নয়—বাংলা দেশের গ্রাম আমি অতি গভীর ক'রে দেখেছি, দেখেছি তার আনন্দ, তার বেদনা। বোটে থাকতে দেখাই তো আমার কাজ ছিল। দেখতুম বসে বসে। গল্পগুচ্ছের মৃণ্ময়ীকে মনে পড়ে তোমার ? না, তোমার বোধ হয় গল্পগুচ্ছ ভাল ক'রে মনে নেই।"

"কী আশ্চর্য, মনে নেই মানে ? আপনিই তো ভুলে গেছেন, গতবার পড়তে গিয়ে দেখা গেল। আচ্ছা বলুন যোগমায়া কে ?"

"যোগমায়া ? দাঁড়াও মনে করি, যোগমায়া আবার পেলে কোথায় ? সে তো মহামায়া !"

"আহা, রাজীবের মহামায়া নয়, জীবিত ও মৃতের যোগমায়া !"

"ও হাঁ মনে পড়েছে। ও একটা অদ্ভুত গল্প। জানো ও গল্পটা লেখার কথা কেমন ক'রে মনে হয় ? অনেক দিন আগে কলকাতার বাড়িতে, ঠিক সময়টা মনে প'ড়ে না তবে ছোট বৌ তখন ছিলেন, একবার আত্মীয় স্বজন হঠাৎ এসে পড়ায় আমার বাইরের বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভিতরে ছিলুম, এক সময়ে যখন আমার নির্দিষ্ট শোবার জায়গায় যাব ব'লে চলেছি—ভিতরবাড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে চারিদিক, আলো অন্ধকারে বড় বড় ছায়ায় মিলে সে এক গভীর রাত্রি। সত্যিকারের রাত বলা যায় তাকে। বারান্দায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে এল একটা কল্পনা, যেন এ-আমি আমি নই। যে-আমি ছিলুম সে আমি নয়, যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হ'য়ে গেছে। সত্যি যদি তাই হয় তা'হলে কেমন হয় ? মনে হ'ল যদি পা টিপে

টিপে ফিরে গিয়ে ছোট বৌকে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে বলি,—দেখ এ-আমি নয়, তোমার স্বামী নয়, তাহ'লে কী হয়।"

"করলেন নাকি তাই?"

"ও বাবা, তাহ'লে কি সে রক্ষে রাখত? চেঁচিয়ে এক কাণ্ড করত। যা হোক তা করিনি। চলে গেলুম শুতে, কিন্তু সেই রাত্রে এই গল্পটা আমার মাথায় এলো, যেন একজন কেউ দিশাহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও মনে করেছে অন্য সকলেও মনে করেছে যে সে সে নয়,—কিন্তু একটা কথা যা বলেছে সে ঠিক, আমার মোটেই মনে নেই লেখাগুলো। যদি তোমাদের খারাপ না লাগে, তাহ'লে সন্ধ্যেবেলা দু'একটা ক'রে পড়া যাবে আবার। যেই তোমাদের অসহ্য হ'য়ে উঠবে একটু ইঙ্গিত করলেই আমি থামব। বেশি কিছু বলতে হবে না, সামান্য একটু ইঙ্গিত।"

"সত্যি রোজ পড়বেন? কী মজা হবে তাহ'লে, এই তো মাসী এসে অবধি বলছে একবার আপনার মুখে 'চিত্রাঙ্গদা' শুনবে, কিন্তু আমি বলিনে, যদি আপনার কষ্ট হয়।

"নিজের লেখা পড়তে আবার কষ্ট কি? তা ছাড়া পড়তে ক্লেশ হবে, লেখাটা কি সে রকম তোমার মনে হয়? চিত্রাঙ্গদা তো তত মন্দ নয়, হ'য়ে যাবে একদিন।"

সন্ধ্যাবেলা রোজই বসবার ঘরে কিছুক্ষণ বসতেন। একটা আরাম চৌকি ছিল, তার পাশে লম্বা বাতিদানে আলো জ্বলত। উনি চেয়ারে এসে বসলেই আলোটা জ্বেলে দিতুম। হাসতেন, বলতেন—"কী এইবার পড়তে হবে বুঝি?—একেই বলে ইসারা।"

সেদিন প্রথমে পড়লেন 'সমাপ্তি'। এই গল্পটা ওঁর খুব বেশি রকম মনে ছিল। বলতেন, দেখতুম কি না বোট থেকে, মেয়েরা ঘাটে আসত, কেউ বা ছেলে কোলে, কেউ বা এক পাঁজা বাসন নিয়ে, কেউ বা কলসী কাঁখে। ও-ই দশ এগার বছরের মেয়েটা ছোট ছোট ক'রে চুল ছাঁটা, কাঁখে একটা ছেলে নিয়ে রোজ আসত। রোগা রোগা দেখতে, শ্যামল রং। বোটের উপরে

আমাকে সবাই দেখত, কিন্তু ওর দেখাটা ছিল অন্যরকম। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে কোলের ছেলেটাকে আমাকে দেখাত আঙুল দিয়ে—'ওই দেখ।' আমার ভারী মজা লাগত। এমন-একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি চঞ্চলতা ছিল তার, যা ও বয়সের জড়সড় বাঙালীর মেয়েদের বেশি দেখা যায় না। তারপর একদিন দেখলুম বধূবেশে শ্বশুরবাড়ী চলল সেই মেয়ে, সেই ঘাটে নৌকো বাঁধা। কী তার কান্না! অন্য মেয়েদের বলাবলি কানে এলো,—'যা দুরন্ত মেয়ে। কী হবে এর শ্বশুরবাড়ীতে?' ভারী দুঃখ হ'ল তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া দেখে। চঞ্চলা হরিণীকে বন্দিনী করবে। ওর কথা মনে ক'রেই এই গল্পটা লিখেছিলুম। ওই বোটে বাংলা দেশের গ্রামের এমন একটা সজীব ছবি দেখেছি যা অনেকে দেখেনি।"

—"নাও এবার কি পড়ব বল,"—বলে বইটা মাটিতে ফেলে দিলেন।—"আচ্ছা দাও, ভূতের গল্পটা পড়া যাক্।"

"মাষ্টার মশাই?"

"হাঁ, ও গল্পটা সত্যিই ভূতের গল্প।"

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে নড়ে চড়ে বসলেন। একটা সত্যি ভূতের গল্প শুনতে পাওয়া তো কম কথা নয়!

"কিন্তু তোমাদের ভয় করবে না তো? একবার নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি, সঙ্গে লোকেন পালিত। ওর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, আমি গরীব মানুষ, উঠলুম গিয়ে একটা ফিটন গাড়ীতে। রাত্রি তখন প্রায় দুপুর পার হ'য়ে গিয়েছে। গাড়ীতে বসে বসে বেশ একটু ঝিমুনি এসেছে, খানিকক্ষণ কাটবার পর হঠাৎ চোখ মেলে মনে হ'ল চিৎপুর রোড নয়। গাড়োয়ানকে যত জিজ্ঞাসা করি, সে কথাটি কয় না। একটা uncanny feeling যাকে বলে। হঠাৎ মনে হ'ল যেন পাশে কে বসে আছে, যেন তার নিঃশ্বাস গায়ে লাগছে। পাশের শূন্য স্থানটা যেন শূন্য নয়, একটা অদৃশ্য উপস্থিতিতে ভরাট।—তারপর হঠাৎ মনে হ'ল সে সামনে এসে

বসল, তার স্থির দুটো চোখ অন্ধকারের মধ্যে একদৃষ্টে আমার দিকে নিবদ্ধ। সেই অশরীরী অস্তিত্ব, অশরীরী দৃষ্টি, গাড়োয়ানও কথা কয়না, গাড়ীও রেড রোড ধরে ঘুরছেই তো ঘুরছেই—বুঝতেই পারছ অবস্থাটা। তারপর কোন্ সময়ে বাড়ি পৌঁছেচি মনে নেই। সকালে খোঁজ নিয়ে জানলুম কিছুদিন আগে ঐ গাড়ীতে একজন লোক উঠেছিল, অনেকক্ষণ রেড্ রোডে ঘোরবার পর গাড়োয়ান অধৈর্য হ'য়ে যখন নেমে এসে বল্লে,—বাবু ভাড়া? তখন দেখে ভাড়া দেবার লোক আর নেই।"

এ গল্প যখন শেষ হ'ল তখন ঘরসুদ্ধ সবাই কিছু আশ্চর্য কিছু কৌতূহলী হ'য়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন,—অর্থাৎ তাঁর মত মানুষের জীবনে এরকম অভিজ্ঞতার একটা গভীর অর্থ আছে তো। এমন গম্ভীর ভাবে গল্পটা বলে গেলেন যে কারও সন্দেহমাত্র হোলো না। আমার কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, আমি বল্লুম—"এ আমি জানি। অনেকদিন আগে শান্তিনিকেতনে আমার পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। তখন উত্তরায়ণে কেউ ছিলেন না, রাত্তিরে খাবার পরে এই গল্পটা বেশ জমিয়ে বাড়িয়ে আপনি বলেছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলুম। দুঃখের বিষয় একা আমাকে নীচের ঘরে থাকতে হয়েছিল সেদিন রাত্রে। সকাল বেলা চায়ের টেবিলে আরো দু একজন ছিলেন, আমি যেই ভূতের গল্পের কথা তুলেছি, আপনি বল্লেন—তুমি বুঝি সেটা সত্যি ভেবে রেখেছ এখনও? ও যে সত্যি গল্প, অর্থাৎ গল্পই সত্যি।"

"তাই নাকি? এই কাণ্ড করেছিলুম? তাহ'লে এবার ঠকে গেছি। দুবার এক ঠাট্টা চলে না। তোমায় নিয়ে তো ওই বিপদ ছিল, যা বলতুম খামখা তাই বিশ্বাস ক'রে বসতে। কুচবিহারের রাণী আমাকে দেখলেই গল্প শুনতে চাইতেন, 'রবিবাবু একটা গল্প বলুন'।—তাঁরই জন্যে এটা বানাতে হয়েছিল।"

"আর একবার আপনি এমনি একটা সত্যি গল্প করেছিলেন। দার্জিলিংএ বাড়ি থেকে বেশ একটু দূরে একটা ঘরে আপনি একা

থাকতেন, তখন একটি চাকর পর্যন্ত কেউ কাছাকাছি থাকত না, তাই নিয়ে সবাই আপত্তি করতেন, আপনি কিছুতেই শুনতেন না। একদিন দুপুর বেলা আপনার কাছে এসেছি, ঘরে ঢোকা মাত্র বলে উঠলেন—'নাঃ তোমরা যা বল, কথাটা ঠিক। বাড়ি থেকে এতটা দূরে একা থাকাটা আমার উচিত নয়। কাল রাতে যা কাণ্ডটা হোলো সেটা অবশ্য তেমন মন্দ হয়নি! কিন্তু অন্যরকমও তো হ'তে পারত।' তার আগের রাত্রে প্রবল শিলাবৃষ্টি হয়েছিল, আপনি বল্লেন—'কাল রাত্তির যখন দুপুর পার হয়েছে, বৃষ্টিটাও বেশ প্রবল হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় দরজায় ধাক্কা। ভাবলুম বাতাস,—না বাতাস তো নয়, ধাক্কা যে বেড়েই চলেছে! উঠে দরজা খোলা মাত্র এক পস্‌লা ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে একটা লোক হুস্‌ ক'রে ঢুকে পড়ল। চোরই হোক, আর ডাকাতই হোক, বাইরে যে দুর্যোগ, দরজা বন্ধ না ক'রে উপায় ছিল না, বন্ধ ক'রে ফিরে দেখি—সর্বাঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে, অল্পবয়সী একটি ছেলে বিলিতি পোষাকে। ইংরেজিতেই বল্লুম তাকে, এ কি তোমার ব্যবহার? সে প্রণাম করে বল্লে—আমি বাঙালী, ক্ষুধার্ত, কিছু খেতে দিন আমায়। জানোই তো ওই আলমারিতে বনমালী কিছু কিছু খাবার রেখে যায়, খুলে দেখি আছে খালি বিস্কুট আর কলা। দিলুম তাই, বিস্কুটের টিনটা প্রায় খালি ক'রে দিয়েছে। যাক তারপর খেয়ে যেন বাঁচল! বল্লুম, তোমার যে সব ভিজে গেছে। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বল্লে—ও আমার অভ্যাস আছে। আমি অনেক দূর থেকে হাঁটা পথে এসেছি শুধু আপনার কাছে আসব বলে, পৌঁছেছি কাল দিনের বেলা। তবে প্রকাশ্য রাস্তায় চলাফেরা আমাদের বিপদজনক, তাই এসেছি অসময়ে। আমার ভাগ্য ভাল যে ঠিক খবর পেয়েছিলুম, ঠিক জায়গায় এসেছি। আমি বল্লুম,—তা এত কষ্ট ক'রে এত বিপদ সত্ত্বেও আমার কাছে কেন এলে, আমি তো তোমায় কোন সাহায্য করতে পারব না। সে বল্লে,—দেখুন সাহায্য অনেক রকম আছে, কিছু সাহায্য

আমাকে করতে পারেন। আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল, আমরা যে পথে চলেছি এতে কোন লাভ হবে কি? আমার নিজেরই আজ একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে পালিয়ে পালিয়ে এই যে বিতাড়িত দুর্ভাগ্য জীবন যাপন করছি এর দাম পাওয়া যাবে তো? আরো অনেক কথা সে বল্লে নিজেদের সম্বন্ধে। আমি বল্লুম—আমার মতামতে তোমার কি সাহায্য হবে? বিশেষত যখন বলছ আর ফেরবার উপায় নেই,—তখন নিজের পথের উপর বিশ্বাস রাখাই ভালো। আর আমাব যা বলবার সে তো আমি বলেই চলেছি, বলেই চলেছি, সে তো তোমরা শুনেছ। সে বল্লে—তা বটে। তখন প্রায় রাত্তির শেষ হ'য়ে এসেছে,—একটুক্ষণ কথাবার্তার পর প্রণাম ক'রে চলে গেল। তার অল্প পরেই আমাদের বনমালী এলেন। এসে তো ঘরের দুর্দশা দেখে অবাক।—কি বলিস্ বনমালী? বনমালীও এমন, সেও একটু একটু হাসছে দূরে দাঁড়িয়ে। আমি বল্লুম—'কি কাণ্ড! সে গেল কোথায়?' 'তা তো আমায় বলেনি, কেন, তুমি সঙ্গে যাবে নাকি?' 'যাই হোক আপনার এরকম একা থাকা উচিত নয়, ওতো ডাকাতও হ'তে পারত।' 'তা পারত বৈকি। তবে ডাকাত কিন্তু আমায় ডাকাতি ক'রে হজম করতে পারত না! বনমালীর দেওয়া বিস্কুটের টিন ছাড়া কিছু জুটত না তার।' সেদিন একটু পরে 'গ্লেন ইডেন'-এ এসে রথীদাকে বল্লুম—'রথীদা কি কাণ্ড!' রথীদা খুব ধীর ভাবে বল্লেন 'কিসের, এনার্কিষ্টের?' 'হাঁ তাইতো, এরকম একা একা থাকেন, আর যত সব বাইরের লোক রাত দুপুরে—'; তেমনি শান্তভাবে রথীদা বল্লেন—'বাবা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।' 'মানে? ঠাট্টা কিসের?' 'হাঁ তাই। এ গল্পটা আজ ভোর থেকে শুরু হয়েছে, অনেককে ঠকানো হ'য়ে গেছে, তুমি বোধ হয় তৃতীয়।' এত অপ্রস্তুত হয়েছিলাম সেদিন!"

"হ্যাঁ, তখনও তুমি আমার এসব পরিচয় ভালো জানতে না, এ গল্পটা পরেও অনেককে বলেছিলুম। এই রকমই আমার

স্বভাব, তোমাদের খুশি করবার জন্যে কত মিথ্যে যে বলে বলেছি। একটি মিথ্যায় যুধিষ্ঠিরের রথ মাটিতে পড়ে গেল। আমার কি দশা হবে, কোন পাতালে, তাই ভাবছি। যাক্ যা থাকে কপালে,— আর তাই যদি হয় তাহ'লে নতুন ওষুধটা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই চুকে যায়।"

সেদিন 'গল্পগুচ্ছ' নিয়ে আমরা সবেমাত্র বসেছি, আলো জ্বালা হয়েছে, উনি বলছেন—কী গল্প পড়ব আজ তোমরাই ঠিক করবে। এমন সময় মহাদেব এসে সংবাদ দিল বেয়ারার পায়ে বিছে কামড়েছে, ওষুধ চাই। ভীষণ ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললেন—"শিগগির যাও আমার মিল্টন নিয়ে।" মিল্টন ব'লে একটা এন্টিসেপ্‌টিক সর্বদা ব্যবহার করতেন! নানারকম ওষুধ লাগিয়ে আমরা তো ফিরে এলুম,—এসে দেখি বায়োকেমিক ওষুধের বইটা নিয়ে দেখছেন, পাশে ওষুধের ঝুড়িটি এসেছে। আমরা ফেরা মাত্র বল্লেন, "নাও, এগুলো দশ মিনিট অন্তর খেতে দাও।" খাইয়ে এলুম ওষুধ, গুর্খার ছেলেকে একটা তেঁতুলেবিছে এমন বেশি কিছু কাবু করেছে বলে মনে হোলো না, তবে যন্ত্রণা তখনও কিছু ছিল তার। আমরা আবার 'গল্পগুচ্ছ' নিয়ে পায়ের কাছে গুছিয়ে বসলুম, কিন্তু বেশ বোঝা গেল উনি মন দিতে পারছেন না। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটা শুরু হচ্ছিল, একপাতা পড়ে বল্লেন—"নাঃ এ হয় না। যাওনা লক্ষ্মীটি, দেখে এসো ওর যন্ত্রণা কমলো কি না। তা না হ'লে অন্য একটা ওষুধ দিতে হবে।"

আলুবাবু দরজার পাশে ছিলেন, বল্লেন—"ও, এইবারে কমে যাবে।"

উনি বিরক্ত হলেন—"আঃ, এইতো তোদের দোষ। সেটা দেখতে হবে তো। না জেনে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।"

বারবার তাঁর এই অতি-সুকুমার গভীর মমতাশীল মনের ছবি আমরা দেখেছি। আমরা প্রত্যেকেই অন্যের সুখদুঃখ সম্বন্ধে কত

উদাসীন। তারপর বড়লোকদের তো কথাই নেই, তাঁরা নিজেদের বড়-কাজ বড়-চিন্তা নিয়ে নেহাৎ আপনজনের দুঃখ কষ্টও ভুলে থাকেন। তিনি কখনো কারও সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তুচ্ছতম মানুষের জন্যও তাঁর দরদের অন্ত ছিল না। বিশেষ ক'রে কেউ কোন রকম কষ্ট পাচ্ছে, শারীরিকই হোক, বা মানসিকই হোক, সে চিন্তা তাঁর অসহ্য হ'য়ে উঠত। কারও অসুখ করেছে খবর পেলে সমস্ত ফেলে রেখে আগে তার ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হতেন,—তারপরও কখনো তার কথা ভুলে থাকতেন না, সমস্ত দিনই চলত বই দেখা আর সিম্‌টম্ মেলানো। সেদিন আর আমাদের গল্প পড়া হোলো না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে,—দুপুর বেলা ডাক এল। ওঁর ঘরে বসে আছি,—চিঠিতে আমার কোনো আত্মীয়ার অসুখের সংবাদ পেয়ে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন—"কী খবর ?" বল্লুম কথাটা।

"দেখ, আমার মনে হয় নিশ্চয় এঁর প্রথম দিকে অবহেলা হয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েদের তো ওই হয়, তারা সকলের সেবা ক'রে ফেরে, অথচ তাদের অসুখ করলে সেটা কেউ গ্রাহ্য করার প্রয়োজনই মনে করে না। এটা আমার যে কী খারাপ লাগে বলতে পারিনে—ভাবলে ধৈর্য রাখা কঠিন হয়···"

তারপর বেরুলো মেটিরিয়া মেডিকা, বেরুলো 'টিস্যু মেডিসিন'—সমস্ত দিন ধরে সেই দূর দেশের স্বল্প-পরিচিত একজনের অসুস্থতার দুঃখ তাঁর সমস্ত দিনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজের চাইতেও বড় হ'য়ে উঠল। এখান থেকে আমাকে দিয়ে চিঠিতে তাঁকে রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা না পাঠিয়ে মন শান্ত হ'ল না। এমন অনায়াসে এত প্রচুর স্নেহরসে তাঁর চারিপাশের সকলকে সিক্ত ক'রে রাখতেন, মনে হ'ত না তিনি এত দূরের মানুষ, মহামানব, চারপাশের তাঁর নগণ্য জন-সাধারণের চাইতে তিনি পৃথক। সকলের সঙ্গে নিজেকে যে এমন ক'রে স্নেহে মিলিত করতেন সে তাঁর ইচ্ছাকৃত

ভালো হওয়া মহৎ-হওয়া নয়, সেইটাই তাঁর একান্ত স্বাভাবিক স্বভাব।

সেদিন বললেন, "আমাকেও একদিন বিছে কামড়েছিল কিনা, আমি ওর দুঃখ জানি।"

"হাঁ, আপনার বিছে কামড়ের গল্প অনেকের কাছে করেছি, সবাই এত আশ্চর্য হ'য়ে যায়।"

"আমিও আশ্চর্য হই। আমারও আর ঘটেনি ওরকম।"

মাসী বল্লে, "কি সে ব্যাপার ?"

একবার কলকাতার বাড়িতে কোনো কারণে একতলার একটা ঘরে ওঁকে রাত্রে থাকতে হয়েছিল, সে ঘরটা সাধারণত ব্যবহার হোতো না। মাটিতে পাতা বিছানায় শুয়েছেন, হঠাৎ পায়ের আঙুলে কাঁকড়া বিছের কামড়ে জেগে উঠলেন। প্রকাণ্ড কাঁকড়া বিছে, অসহ্য তার দংশন যাতনা, বৃশ্চিক-দংশন যাকে বলে,—কিন্তু সেই রাত্রে কোথায় ওষুধ, কে করে ব্যবস্থা,—সমস্ত বাড়ি তখন নিদ্রিত। নিজের কষ্ট হচ্ছে ব'লে সকলের ঘুম ভাঙাবেন, বাড়িসুদ্ধ একটা সাড়া পড়ে যাবে, সে তো কখনই করবেন না। যত কষ্ট যত অসুবিধাই হোক, অন্য কাউকে এতটুকু ব্যস্ত করা কখনো তাঁর স্বভাব ছিল না। কাজেই সে যাতনা বিনা প্রতিকারেই সহ্য করতে হ'ল সেদিন। যখন কষ্ট অসহ্য হয়েছে তখন তিনি ভাবতে লাগলেন,—কাকে বিছে কামড়াল, কার ওই পা, কার ওই আঙুল, সে কি আমি ? কে এই দেহধারী রবীন্দ্রনাথ ? আমি, আর আমার ওই যন্ত্রণাকাতর দেহ, একতো নয়। তিনি একাগ্র হ'য়ে নিজেকে নিজের দেহ থেকে পৃথক ক'রে দেখতে চেষ্টা করলেন। যে দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে সে 'আমি' নয়, এই ভাবনাটা ক্রমে যখন স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল, হঠাৎ তাঁর মনে হোলো যেন কী রকম একটা যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল। বন্ধ হ'য়ে গেল সেই মুহূর্তে যত যাতনা। নিজের সঙ্গে নিজের বেদনার বিচ্ছেদ হ'য়ে গেল। হঠাৎ মনে হোলো যেন কোনো কষ্ট নেই, ছিল না।

পরদিন সকালে উঠে সেই আঙুলটাতে যে ক্ষতচিহ্ন ছিল, তা ছাড়া বেদনার আর কোনো প্রমাণ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, এরকম ঘটনা তাঁর জীবনে আর কখনো ঘটেনি। মানসিক দুঃখ জয় করা যায়, শারীরিক দুঃখ সহ্য করা যায়, কিন্তু শুধু সহ্য করা নয়—সমস্ত বেদনাবোধ লুপ্ত করা কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারা,—এ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি, যদিও আরো, অনেকবার ইচ্ছে করেছেন। সর্বদা বলতেন, "অমর অজেয় আত্মাকে দৈনন্দিন আবিল আবহাওয়া থেকে দূরে, ক্ষণকালীন দুঃখ-সুখের দ্বারা অপ্রতিহত অনুদ্বিগ্ন রাখতে হবে। আমার ভিতরে যে আমিটা বড় সেইটেই প্রধান হয়ে উঠুক।"

"কী, এরকম মুখ ভার করে বসে কেন? চল গো ধনি বিনোদিনী, পথে বসে কাঁদা ভালো নয়—চল গো ধনি···তার চেয়ে চল আমায় রং গুলে দেবে, পেন্‌সিল কেটে দেবে, তুলি মুছে দেবে, আর সে সব কোনো কাজই আমার পছন্দ হবে না! সেজন্যে লক্ষ্মী মেয়ের মত বকুনি শুনবে, আর আমি ছবি আঁকব, যে ছবি দেখে আমাদের নন্দবাবু বলবেন 'বাহবা'। না, নন্দবাবু পর্যন্ত যে ছবি পৌঁছবে না তা জানি। নাও, এবারে একটা টেবিল দাও। হাঁ, এইবারে একটা কাগজ,—না, কাগজটা দেখছি একটু বেশি রকম হাতের কাছে আছে। তা হোক্, তবু আমি হুকুম করব, আর তুমি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে এক আঙুল দূরের জিনিস এগিয়ে দেবে, এ না হলে সুখ কী? এই দেখ না, কাল বল্লুম—চশমা, চশমা, তুমি অমনি এক মাইল দূর থেকে ছুটে এসে আমার পকেট থেকে চশমা বের করে দিলে, এ না হলে মনে হবে কেন যে, আমি রীতিমত বড়মানুষ?"

"আচ্ছা, কী কী রং গুলব?"

"আহা, আগে কাগজটা নাম্বা করে কাটো, তবে তো? বনমালীর কাছ থেকে আমার ভাষার খুব উন্নতি হচ্ছে, আজকাল

আর লম্বা বলতে ইচ্ছেই করে না। আচ্ছা, তুমি তো কৃপণ বড় কম নও; এই রকম জলবৎ তরলং রং দিয়ে কি চান করব?"

"আহা, তা কেন, water colour-এর রং তো এমনই গোলা হয়।"

"ও, উনি এখন আমাকে water colour-এর আইন শেখাবেন! দেখ কন্যে, এ বয়সে আর শিক্ষার কোনো আশাই নেই, অতএব আমাকে যদি একটু মোটা করে রং গুলে দাও তাতে তোমার যা খরচ হবে, এখনও আমার কলমের বাক্সে যে সাড়ে আট আনা পয়সা আছে তা থেকে দিয়ে দেব নিশ্চয়। আমার কী অত ধৈর্য আছে যে একটা রং দিয়ে একঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকব কতক্ষণে শুকোবে?"

"আহাহা, করেন কি, সব রং যে কাপড়ময় হয়ে গেল—"

"তুমি একটু চুপ দাও তো সুমধ্যমে—কথাটা কতকটা correct হোলো জানিনে, তবু বলে তো ফেলা গেল, লাগে তো লেগে যাক।"

এমনি করে ঘণ্টাখানেক পরে একটি সুন্দর অরণ্যের ছবি হল।

"এই লও, তোমাদের সুরেলের বন। তুমি যে ভাবো আমি একেবারে আঁকতে পারিনে, আমার ছবি লোকে দয়া করে ভালো বলে, তোমার সে ধারণাটা ভাঙতে হবে। কী চুপ করে যে? বল্লে না, কী আশ্চর্য কখন তা বল্লুম, বা ঐ জাতীয় একটা কিছু? অন্তত ভদ্রতা করেও তো বলতে হয়!"

"বলা না-বলা সমান তাই না-বলাই ভালো।"

"এটা খাঁটি কথা, না-বলাটাই সর্বদা ভালো, বুদ্ধির কাজ—তুমি রবে নীরবে—আচ্ছা এইবারে খুব নীরবে বলে ফেলো সকালবেলা অত মুখ ভার করে বসেছিলে কেন? ওগো কী ভাবিয়া মনে ও দুটি নয়ানে উথলে নয়ন বারি—ওগো কি ভাবিয়া মনে······।"

"আমাকে একটা কোনো কাজ দিন।"

"দেব। তোমার যেখানে কর্তব্যের ক্ষেত্র সে আমার পরিধি থেকে এত দূর, নৈলে প্রচুর তোমাদের অবসর, কষ্টকর অবসর। আমার কোনো কাজে যদি লাগতে, ভালো লাগতো আমার। আমার মৃত্যুর পর যখন তোমার সুবিধে হবে, এসো আমার ওখানে কোনো কাজে নিযুক্ত হ'য়ো। আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন ক'রে কাজে লাগতে জানে না। আজকাল অধিকাংশ মেয়েরই সংসারের কাজে যথেষ্ট অবসর থাকে, তাদের শিক্ষাও মোটামুটি হয়, কিন্তু মন কি নিষ্ক্রিয়! দেশের অর্ধেক শক্তি যদি এরকম আবদ্ধ হয়ে না থাকত, ভালো হোতো কত। অবশ্য একথা বলতে পার তারা কর্মের ক্ষেত্র পায় না। যে যার নিজের নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ হ'য়ে আছে। নিজের কর্মক্ষেত্র নিজেই সৃষ্টি ক'রে আপনাকে বিকাশ ক'রে তোলা সহজ নয়, এবং সম্ভবও নয় অধিকাংশ মানুষের পক্ষে। কিন্তু তাও বলি, যেখানে সে সুবিধে আছে সেখানেও তো তাঁদের এগিয়ে আসতে দেখিনে? এই শান্তিনিকেতনে যত মেয়ে আছেন তার মধ্যে ক'জন কাজে নেমেছেন? অথচ অত বড় কর্মক্ষেত্র আমি তো এনে দিয়েছি তাঁদের সামনে। এতখানি সুযোগ, কাজ করবার সুযোগ পাওয়া কি কম কথা! তবে বৌমা এসেছেন আমার কাজে, তাঁর দুর্বল অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি দূরে থাকেন নি, কাজের মধ্যে নিজেকে সার্থক করেচেন, এ আমার খুব আনন্দের কথা। আর এটা তাঁর নিজের পক্ষেও কম লাভ নয়। জীবনের একটা বিস্তৃত পরিধি— কর্মের একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র নিজেকে নিজের কাজেও শ্রদ্ধনীয় ক'রে তোলে। নৈলে সারাদিন, দিনের পরে দিন কেবল 'হাঁ ভাই ও-ভাই' ক'রে সময় কাটানো, তার গ্লানি কি মেয়েরা অনুভব করেন না!"

"কী, আলো তো জ্বলে উঠল—আজ কী পড়া হবে? কাল তো 'প্রায়শ্চিত্ত' পড়া হোলো—পুরুষের কী চরিত্রই এঁকেছি!"

"তা আপনার দোষ কি? যা সত্যি তাই তো লিখবেন। বাল্মীকিই বা এত চেষ্টা ক'রে এমন কি চরিত্র আঁকলেন?"

"বটে, তাই নাকি? তবু ওই পুরুষদের না হ'লেও তো চলে না সখি! এই বিশ্রী চরিত্রের জীবদের বাদ দিয়ে জীবনটা কাটাও না দেখি! আমাদের অত অহঙ্কার নেই, কী বল ডাক্তার? সেই তোমাদের বৌদ্ধ আর্টিষ্ট কালিমপংএ গিয়ে মূর্তি বানাতে লাগলো, হঠাৎ বলে এখানে আমার কাজ চলবে না,—এখানে মেয়েরা সর্বদা যাতায়াত করে, তাদের দৃষ্টি প'ড়ে আমার কাঠ ফেটে যাচ্ছে। এ রকম পবিত্র কাঠের বৃত্তান্ত শুনে রোমাঞ্চ হ'ল। তখুনি তাকে বল্লুম,—তাহ'লে তোমার দ্বারা আমাদেরও চলবে না। সে দৃষ্টি ছাড়া সংসার যে অচল হবে। আমরা তো এ সহজেই বলে থাকি, গর্ব ক'রে তো বলিনে তোমাদের কোন দরকার নেই! তোমরা কিন্তু এমন ভাব দেখাও যে সংসারে পুরুষ জাতটাই একটা অবাঞ্ছিত উপদ্রব। এই দেখ না, আমরা যখন ছবি আঁকি, তোমাদের ছবি আঁকি। যখন লিখি, তোমাদের কথাতেই সব ভরা, তাও সবই ভালো কথা, দোষগুলো নির্বিচারে চেপে যাই, গুণগুলোকে ক্রমাগত সাজিয়ে তুলি। আর তোমরা যখন ছবি আঁক? আমাদের ছবি আঁক? সেই নিজেদেরই আঁক বসে বসে। কেন এত অহঙ্কার? আচ্ছা দাও, পড়া যাক একটা কিছু, কী হবে আর ঝগড়া ক'রে! একি, এ যে 'গীতবিতান'!—এ তো তোমার কোন্ আদ্যিকালের এডিশন? সব ভুলে ভর্তি। দাও কমলটা খুলে—"

গান করলেন—

> "খোল খোল দ্বার
> রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।"

সেইদিন সমস্ত সন্ধ্যা গান করেছিলেন প্রায় চৌদ্দ পনেরটা। এক একটার সুর এখনও মনে পড়ে।

'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা'—

সেই অপূর্ব সুরধ্বনির যাদু মাখানো সন্ধ্যার অন্ধকারে গানের কথাগুলি মনের মাঝখানে আঘাত করতে লাগল—

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে-যে আমায় কাঁদায়, আমি
কী জানি তার নাম।
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে
ফিরি আমি কাহার পিছে
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাইনি তাহার দাম···"

এসব গানগুলো কোথাও শুনতে পাইনে—জানিনে কেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা সুকণ্ঠী তাঁদের হৃদয় কি এগুলো স্পর্শ করে না? আজকাল বেতার-এর প্রোগ্রামে, গ্রামোফোন রেকর্ডএর বিজ্ঞাপনে সর্বত্রই দেখি আধুনিক গীতি, কাব্যগীতি এইসব নাম, কি এ নামের তাৎপর্য তা বুঝি না। আর কবির গান হচ্ছে রবীন্দ্রগীতি। মনে করতে দুঃখ হয় কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে তার মধ্যে রবীন্দ্রগীতিই সব চেয়ে কম গাওয়া হয়। অথচ আধুনিক সঙ্গীত বল্লে কি বোঝায়? তাঁরই গানের একলাইন এখান থেকে আর এক লাইন ওখান থেকে জুড়ে গেছে। তাঁরই সুর কিছু পরিবর্তিত কিছু বিকৃত হয়েছে। তবে এ বিড়ম্বনা কেন? তিনি যে আমাদের সুরের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছেন সেই তো যথেষ্ট। গানের সুর হৃদয়কে যে অতল গভীরে ডাক দেয়, তাঁর গানের কথাগুলোও সেখানে হৃদয়ের একটা অবলম্বন হয়ে তাকে ধারণ করে থাকে। এমন কোনো দুঃখ নেই যা তাঁর গানে অমৃত হয়ে ওঠে না, এমন কোনো আনন্দ নেই যা তাঁর সুরের বেদনায় গভীর হয়ে হৃদয়কে ডুবিয়ে দেয় না। কথা আর সুরের আশ্চর্য মিলনে মানুষের মন বীণার মত বাজতে থাকে, একথা সেদিন খুব

গভীর করে অনুভব করেছিলুম। তিনি গাইছিলেন বারে বারে এই লাইন কটি—

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ভরে
ভুবন ভরে আছে যেন
পাইনে জীবন ভরে।

কি অনির্দিষ্ট বেদনায় মনের সমস্ত তন্ত্রীগুলি বাজল সুরে সুরে।

তখন অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে—মংপুর নির্জন অন্ধকার—চারিদিকে গভীর নীরবতা। আমরা কটি প্রাণী তাঁর পায়ের কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে বসে আছি—ঘরের একটি মাত্র আলো তাঁর হাতের বই আর মুখের চার পাশে একটি জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করছে। আজ মনে পড়ে সেই রাত্রি, সে যেন বহুদূরের এক স্বপ্ন।...যে দেহে তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন সে তাঁর অপার্থিব আশ্চর্য শক্তির উপযুক্ত আধার—কিন্তু সে সৌন্দর্য কি নাকের মুখের নিখুঁত রেখায়? সে কি শুধু রং এ? দীর্ঘ সুঠাম দেহের উপর কোমল মসৃণ ত্বকে? সে যে দেহের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে দেহাতীত কিছুকে প্রকাশ করত, তা নইলে তাঁর ভাইদের মধ্যে ও পরবর্তীদের মধ্যে অনেকেরই তাঁর মত চেহারা ছিল। তাছাড়া রং নাকি তাঁর ছিল ভাই বোনদের মধ্যে সব চেয়ে ময়লা। প্রায়ই বলতেন, "আমি ছিলুম মায়ের কালো ছেলে।" কিন্তু সেই মসৃণ সিল্কের মতো শুভ্রচুলে, সেই আঙ্গুলের বঙ্কিম রেখায়, বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত অবয়বে, এবং সমস্তকে নিয়ে একত্রে যে জ্যোতির্ময় লাবণ্য রূপ নিত, ভাষা তাকে ধরে রাখবে কি করে, ফোটোগ্রাফ হার মেনে যায়।

সন্ধ্যেবেলা মংপুতে আমাদের পড়বার আসর বসত প্রত্যহ। লম্বা বাতিদানে আলো জ্বলত ওঁর চেয়ারের ঠিক পিছনে—যাতে বইয়ের উপর আলো পড়ে। সমস্ত ঘর থাকত অন্ধকার, আমরা ওঁর চেয়ারের চতুর্দিকে ছড়িয়ে বসে থাকতুম মাটিতে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে বাতিদানের আলো ওঁর শুভ্র চিক্কণ চুলের উপর পড়ত,

মুখের চতুর্দিকে পড়ত, তাতে মনে হোতো যেন এক জ্যোতির্ময় ছবি, জীবন্ত মানুষের সমস্ত সজীবতা নিয়ে অথচ ছবির দূরত্ব নিয়ে সেই অনির্বচনীয় লাবণ্য মনকে একান্ত অভিভূত করত।

যদিও বৈজ্ঞানিকরা বললেন বিশ্বব্যাপারের সৌন্দর্যলীলা লৌকিক ও জৈবিক কারণের বশীভূত হয়ে চলেছে—কেন পুং কোকিলের গলায় গান, কেন ময়ূরের বর্ণচ্ছটা, কেন যৌবনের অসীম লাবণ্য—তা জীবধর্মে নিয়ন্ত্রিত। তবু মনে হয় সেইটাই সব কারণ নয়—বিশ্ব সৌন্দর্যের লৌকিক যে রূপ তাকে উত্তীর্ণ হয়ে তার লোকোত্তর মহিমা মন অনুভব করে। তাই বলছিলুম মানুষের শরীরে যৌবনের যে প্রভাব তা তাকে ফিরিয়ে দিয়েও জ্ঞানের, প্রতিভার, ধ্যান শক্তির, শরীরকে অবলম্বন করে অন্তর্যামীর যে সৌন্দর্যময় অনির্বচনীয় প্রকাশ, তা আমরা রবীন্দ্রনাথের আশী বৎসরের বৃদ্ধ দেহে দেখেছিলুম। বার্ধক্য যে কতগুলো দিনের পুনরাবৃত্তি নয়, তা যে একটা পরিণতি, যৌবনের মতই যে তা একটি নূতন এবং বিশেষ অস্তিত্ব তা অধিকাংশ সময়ই লোলচর্মের বিরূপতায়, মানসিক জড়তায় আমরা বুঝতে পারি না। কারণ অধিকাংশ সময়ই আমরা কতকগুলো দিন যাপন করি, বাকিগুলো করি তার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তিনি যে পূর্ণ প্রাণের প্রবাহের মধ্যে আপনাকে চালিত প্রবাহিত উৎসারিত করে দিয়েছিলেন তা কোথাও থামেনি, ফুরিয়ে যায় নি, দিনে দিনে যেমন তাঁর মনকে নব নব সৌন্দর্যে নব নব অভিজ্ঞতায় বিচিত্রভাবে পূর্ণ করেছে তেমনি তাঁর দেহেও এনেছে পূর্ণতর লাবণ্যের দ্যুতি। বস্তুতঃ তাঁর ছেলেবেলার ও মধ্য বয়সের যে ছবি দেখি তাতে দেখতে পাই ক্রমশই তাঁর চেহারা মনোজ্ঞ থেকে মনোজ্ঞতর হয়েছে। যেমন তাঁর কাব্য, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, মানসী এইভাবে একটা পরিণতির মধ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছে তেমনি তাঁর শরীরগত লাবণ্য যেন লৌকিক থেকে অলৌকিকের দিকে দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে চলেছে।

ক্রমেই তাঁর বিশেষত্ব বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে তার অসামান্যতা, সেই বিরাট প্রতিভা যেমন ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্মে ও আত্মোপলব্ধিতে ক্রম পরিণত অস্তিত্বে প্রবেশ করেছে তেমনি তাঁর দেহের দর্পণেও তা প্রতিফলিত হ'তে বাধা পায় নি।

যখন ফিরে এলুম তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবার জন্য, দেখি গীতবিতান পড়ছেন বসে। "তোমাকে একটা নতুন এডিশন দান করতে হোলোই দেখছি, এটা একেবারে ভুলে ভর্তি। নাঃ, তোমার সঙ্গে আমি কথাই কইব না, তুমি একেবারে অপদার্থ, গান শুনে তুমি কাঁদো! সত্যি তুমি মোটেই গান শুনতে পাওনা। আমি তাই ভাবছিলুম এতক্ষণ। এ জায়গাটা বড় নির্জন তা মানতেই হবে, বিশেষ করে তোমাদের বয়সের পক্ষে। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর না, একজন সঙ্গিনী রাখোনা যে বেশ গাইতে জানে, খুকুকেও দেখবে?"

"কী যে বলেন, আমি তো আর প্রিন্সেস্ নই যে গায়িকা সখী রাখব।"

"না না, যত অসম্ভব মনে করছ তা নাও হ'তে পারে। কেন গান শিখলে না? এ যে মনুষ্যের কত বড় সঙ্গী। এখানকার এই সুদীর্ঘ সন্ধ্যাগুলো দিনের পর দিন একাকী কাটানো কষ্টকর বৈকি। আমরা এসেছি এ আরো খারাপ, যখন চলে যাব আরো কষ্ট হবে।"

"কী যে বলেন, চিরদিন পাব না ব'লে যতটুকু পাই তার মূল্য কি বুঝিনে? চিরদিন আপনাকে রাখব এমন সাধ্য কি? তবু যে ক'টা দিন পাই সেজন্য কত কৃতজ্ঞ।"

"তা এমন কিই বা অসম্ভব? না হয় আমার শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় তোমাদের কাছেই কাটাব। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। যা ভালো লাগে, যা চাওয়া যায়, তার সমস্তটুকুই কেন পেলাম না এ নিয়ে আব্দার করা সাজে না—যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই আনন্দিত হ'তে হবে। মানুষের সেই তো পরীক্ষা।

তবু যাদের স্নেহ করা যায়, ইচ্ছে করে সব অসুবিধা কেটে যাক্ তাদের।"

"কেন বাজাও কাঁকণ কণ কণ কণ কত ছল ভরে, ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভরে, কেন বাজাও—কেন বাজাও কাঁকণ কণ কণ কণ"—গাইতে গাইতে বল্লেন,—"কি মিনতি! আহা কি বোকাই ছিলুম তখন নৈলে আর এমন কথা লিখি? এখন হ'লে লিখতুম—চলতো ভালো, নৈলে তোমার কনক কলসটা রেখে যাও, বিশ্বভারতীর কাজে লাগবে। যাবে তো যাও না, তুমি গেলে এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু তোমার ওই কনক কলসটা বিশেষ দরকারী। সেই যে ক্ষণিকায় একটা কবিতা আছে না—?"

"কোন্‌টা? ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায় সান্ত্বনার্থে হয়ত পাব চারজনা?"

"হাঁ হাঁ, বড় খাঁটি কবিতা। ক্ষণিকার কবিতাগুলো লোকের তেমন নজরে পড়েনি কিন্তু ওগুলো ভালো, এ বইটা আমার খুব প্রিয়।"

"অনেকদিন আগে একবার আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আমার সব বইয়ের মধ্যে যদি একটিমাত্র রাখতে পাও তো কোনটা রাখ?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কোনটা রাখেন সেইটেই জানবার মতো। আপনি বলেছিলেন 'বোধ হয় ক্ষণিকা,' অবশ্য তা আমি মানব না।"

"না ও রকম ক'রে বলা চলে না। তবে ক্ষণিকার কবিতাগুলো তখনকার যুগে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। তখন আমাদের দেশের লোকের রসবোধের standard আশ্চর্য রকম নীচু ছিল,—এ সব কবিতা উপভোগ করবার মত মন তৈরি হয়নি তখন। 'চিত্ত দুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা, আজকে আমি কোনমতেই বলব নাকো সত্য কথা'—এসব কবিতা তখনকার দিনে এমন সহজে উপভোগ্য

হওয়া সম্ভব ছিল না গো, অনেক দিন লেগেছে মন তৈরি হ'তে। আমাদের সময়টা ছিল যেন শুচিবায়ুগ্রস্ত। সে এক রোগে পাওয়া যুগ। এই যেমন তুমি অনায়াসে সেদিন বল্লে ওই গানটা করতে, 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,' আমিও অনায়াসে গাইলুম। আমাদের সময় হোতো কি? কেউ গাইতে পারত না এ গান। এ যে ঘোরতর অশ্লীলতা। তাই আমি সেদিন ভাবছিলুম কেমন ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে হাওয়া।"

"কেন ওর মধ্যে অশ্লীলতা কি আছে?"

"ওরে বাবা, অশ্লীল নয়? 'পাখী ডাকি বলে গেল বিভাবরী বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী।' এযে ঘোরতর দুর্নীতি! তুমি বিশ্বাস করবে না, কথা ও কাহিনীর সেই যে ভিক্ষুক কবিতাটায় আছে না—ভিখারিণী তার একমাত্র বাস ফেলে দিল—কী লাইনটা বল না হে ডিস্পেনারী, এবার নির্ঘাত ঠকে যাবে।"

"কথা ও কাহিনীর কবিতায় নয়, গদ্য কবিতায় ঠকতে পারি। অরণ্য আড়ালে রহি কোনমতে, একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে, বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে, ভূতলে।"

"হাঁ ওই কবিতাটা যখন বেরুল,—মহাশয় আমাকে বল্লেন, রবিবাবু এটা লেখা কি ঠিক হয়েছে? ছেলেরা পড়বে আপনার কবিতা, এর মধ্যে এ কথাটা 'একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে'—ঠিক হবে কি? এতটা অশ্লীল রচনা ছেলেদের পড়া উচিত হবে না। কী আর বলব বল? অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলুম—কাদের জন্য লিখছি? আচ্ছা—তিনি তো একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি, তিনিও যদি এমন কথা বলেন, তাঁকেও যদি বিশদ ক'রে বোঝাতে হয়, ওখানে 'একমাত্র বাস' কথার কি তাৎপর্য তাহ'লে কেন এ লেখার বিড়ম্বনা বল? যাক্, দিনকাল বদলেছে, বুদ্ধি সহজ সুস্থ হয়েছে দেশের। আজ যে এমন সহজে মনকে সাহিত্যের রসে, আনন্দে সিক্ত করতে পারছ, সেজন্য একটু আধটু ধন্যবাদ দিও কন্যে, আমারও কিছু পাওনা আছে। এখনও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনতে পাই

আমার রচনা সম্বন্ধে, এই যেমন সেদিন—বল্লে, "আপনি নাকি বনমালীকে দেখে লিখেছেন—'হে মাধবী দ্বিধা কেন ?' শুনে এমন মনের অবস্থা হ'ল,—না হয় সুদিন গেছেই, তাই বলে কি এমনই দুর্দশা হয়েছে যে বনমালীকে দেখে গাইব—ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন ?"

"মিত্রা, আজ সকাল থেকে তোমার দেখা নেই কেন ? তুমি কপি করবার জন্য খাতাটা নিয়ে গিয়েছ, না দিলে লিখতে পারছিনে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আছি।"

"কী কাণ্ড, আমি তো রান্নাঘরেই ছিলুম, কানু ডাকলে না কেন ?"

"আমি তো ওকে ডাকতে বলি নি। সে হয় না, জানোইতো আমার স্বভাব। যতটুকু সহজে আসে তার বেশি নয়। সেই ক্ষণিকার কবিতাটা জানো তো—যাহা তাহা পাই যেথা সেথা ধাই ছাড়িনেক' ভাই ছাড়িনে, তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি করে কাড়িনে—এই আমার জীবনে ফিলসফি,—যা সহজে পাই তা ছাড়িনে, বাদ দিতে চাইনে কিছুই, কিন্তু জোর নয় কাড়াকাড়ি নয়।"

"আচ্ছা, এ কথাটা আপনার এই সামান্য কারণে বলা ঠিক হচ্ছে ? একটু তীব্র ভর্ৎসনা হচ্ছে না ?"

"না না আমি তোমাকে বলি নি, একটা উপলক্ষ ক'রে কথাটা বল্লুম এই মাত্র। তোমাকে কখনো বলতে পারি ? আমি তো জানি ডেকে পাঠালে তুমি খুশিই হ'তে কিন্তু সত্যিই বলছি সে আমার স্বভাব নয়। এখন বরং যত নিজের স্থবিরতা অসুস্থতা বাড়ছে তত আত্মনির্ভরতা কমে যাচ্ছে, ছেলেমানুষ হ'য়ে যাচ্ছি। অকারণ অনেক বিরক্ত করি তোমাদের, কিন্তু যখন বয়স কম ছিল, চলৎশক্তি ছিল, তখন কখনই কাউকে বিরক্ত করতুম না। ডাকাডাকি, হেই ওটা নিয়ে আয়, পান দিয়ে যা রে, একটু বাতাস

কর, এসব কখনো করিনি। জীবনে পেয়েছি অনেক, কিন্তু কাড়াকাড়ি ক'রে নয়—ছাড়িনেক' ভাই ছাড়িনে, তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি ক'রে কাড়িনে।"

সেদিন কবিতা পড়া হচ্ছে—"শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে, জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে। অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে, নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে, এমন সময় অরুণ ধূসর পথে, তরুণ পথিক দেখা দিল রাজ রথে।…শুধাল কাতরে সে কোথায়, সে কোথায়! ব্যগ্র চরণে আমারি দুয়ারে নামি, সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়, নবীন পথিক সে যে আমি, সেই আমি।—এ হোলো সেই পেয়ে-না-পাওয়ার কথা, আকাঙ্ক্ষার প্রবল আবেগ মানুষকে বঞ্চিত করায়,—যা হাতের কাছে আছে, চোখের সামনে আছে, তাকে খুঁজে পাইনে—যখন দূরে চলে যায় তখন সেই বিস্তৃত ব্যবধানের দিকে চেয়ে মনে হয়, এই তো ছিল! অনেকটা পরশ পাথরের মত আর কি।"

সেদিন মহুয়ার অনেকগুলো কবিতা পড়া হোলো—সবলা কবিতাটা পড়লেন—

> নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেন নাহি দিবে অধিকার
> হে বিধাতা
> পথ প্রান্তে কেন রব জাগি
> ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
> দৈবাগত দিনে—?

কিছুক্ষণ পরে সভা ভাঙবার সময় আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—'হে বিধাতা' কেন আলাদা লাইনে লেখা হয়েছে। বল্লেন,—"তাইতো, এর সঙ্গে মিলের লাইন নেই দেখছি, তবে কিছু এসে যায় না তাতে।" বইটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন, তারপর ঐ লাইনটার পাশে লিখলেন

—হে বিধাতঃ

সংকোচের দৈন্যজাল কেন তুমি পাতো

চিত্ত ঘিরে।

"এই লাইন দুটো পাঠিয়ে দিও বিশ্বভারতীতে—রচনাবলীতে যখন ছাপা হবে দিয়ে দেয় যেন।"

পাঠান হয়েছিল কিনা এখন আমার স্মরণ নেই। কারও কোনও প্রশ্ন তিনি অবহেলা ক'রে শুনতেন না, সে যত অর্বাচীনই হোক না কেন। এমন সব চিঠি আসত, এমন সব অর্থহীন অবান্তর প্রশ্নেরও তিনি উত্তর দিতেন, ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়।

যখন তিনি কিছু পড়তেন, সমস্ত রচনাটা যেন প্রাণ গ্রহণ করত। যে গল্প যে কবিতা আগেও বহুবার পড়েছি সেগুলোও যেন চেনা যেত না, সে যেন আর একটা নূতন সৃষ্টি,—আরো সমগ্র, আরো পূর্ণতর। মনে আছে যেদিন ক্ষুধিত পাষাণ পড়ছিলেন—'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও', সে ফকির যেন তার সমস্ত আর্তি নিয়ে সামনে এসেছিল। সে স্বর সে প্রকাশ ভঙ্গিমা লেখাতো যায় না, মনে ক'রে রাখতে পারি এমন মনই বা পাব কোথায়? সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাঁর নিকটে এসেছিলাম। অজস্র ধারায় তাঁর প্রতিভার রশ্মি সর্বদা বিকীর্ণ হ'ত নানা রকমে নানা ভঙ্গীতে, আমরা সে আলোকে স্নান করে ধন্য হয়েছি, কিন্তু আমরা সে আলোক ধারণ করবার উপযুক্ত আধার ছিলাম না। পৃথিবীর বৃহৎ দুর্ভাগ্য, আমাদের চেয়ে যোগ্যতর কেউ তাঁর নিয়ত সঙ্গ পেল না। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের একজন যাদের মধ্যে জন্মেছিলেন, বুদ্ধিতে শক্তিতে তারা সামান্য। তাই তাঁর অনেক হারিয়ে গেল। সাহিত্যে কাব্যে গানে শিল্পে যা ধরে রাখা যায় তা তিনি অক্ষয় করে গেছেন। অক্ষয় করে গেছেন তাঁর প্রভাব ভবিষ্যৎ মানুষের জীবনে—কিন্তু যা তাঁর প্রত্যহের দান, যা তাঁর কণ্ঠস্বরে, প্রত্যেক হাসি কৌতুকে, কাজে বিশ্রামে, আনন্দে উপদেশে, সর্বদা উৎসারিত হত, তারও কী অসীম মূল্য ছিল!

আজ সেদিনের কথা মনে পড়লে মনে হয় এমনটি আর সম্ভব নয়, আর কখনো দেখব না। রসে আনন্দে পরিপূর্ণ, প্রাণ প্রবাহে উদ্বেল এমন একটি জীবনের ছবি ক'জন মাত্র লোক দেখল, অথচ সমস্ত লোকের তা দর্শনীয় ছিল।

"আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়···আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়···যারে যায় না দেখা যে যায় দেখে, ভালোবাসে আড়াল থেকে, আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালবাসায়···মাসী, আজ সন্ধ্যে থেকে এতগুলো যে গান করলুম, কি তার পুরস্কার? আগেকার দিনে কবি গান গাইলে রাজকন্যারা কণ্ঠহার খুলে ফেলে দিতেন, সেদিন আর নেই—এখন কবি কেবল গান গেয়েই যাবে, অপরপক্ষ নিরুত্তর।"

"রাজকন্যা কোথায়? এ দীনের কুটীর, আমাদের কী আছে, কী দেব?"

মাসী বল্লে—"শোনেন কেন ওসব কথা! ওই তো গলায় দিব্যি হার রয়েছে, দিক্ না খুলে—"

"হাঁ তা তো রয়েইছে, ইচ্ছে থাকলে কি আর দেওয়া যায় না? সেই ভিখারিণীও তো দিয়েছিল ভিক্ষুকে।"

"আপনাকে দেওয়া শক্ত অনেক, এই নিন না তাহ'লে।"

"ওরকম ক'রে বল্লে কি আর নেওয়া চলে?"

হারটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। "একে কি পাথর বলে—পান্না? হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে, কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে—জানো, একবার মাত্র জীবনে গয়না পরেছিলুম, আংটি। নতুন বৌঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল। এই লও তোমার হার। দেখ ভালো ক'রে তোমার হীরে পান্না কিছু খুলে নিই নি।"

"কেন, নিলেন না যে বড় ?"

"হাঁ, ওই আমার কপালে বাকি আছে, তোমার গয়না বিক্রি করা !"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এল। এটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস, এই বছরই ডিসেম্বর মাসে আমাদের সমস্ত গয়না চুরি হ'য়ে গেল। তার কয়েকদিন পরেই আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম। ঘরে ঢুকতেই বল্লেন—"কি গো বুদ্ধিমতি, সর্বস্ব হারিয়ে খুব তো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ !"

"গয়না কি আমার সর্বস্ব ?"

"ছাড়ো কবিত্ব, বোকার দল সব। অধ্যাপকের বাড়ি না হ'লে আর এমন হয় !"

"বা তাঁর কি দোষ, এত গয়না তো বাড়িতে থাকত না, আমিই এনেছিলুম।"

"ও তোমারই বুদ্ধি, তা না হ'লে আর এমন হয় ? অসাধারণ প্রতিভাশালিনী কিনা !"

"কিন্তু একটা কথা শুনুন। সব গয়না তো গেছে,—যার যা কিছু ছিল, বাড়িতে এক টুক্‌রো সোনাও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সেই যে হারটা মংপুতে আপনাকে দিয়েছিলুম শুধু সেইটি র'য়ে গেছে।"

"কি ক'রে ? চোরেরা সেটা আমার জেনে ফিরিয়ে দিয়ে গেল নাকি ?"

"না অতটা নয়, তবে কেবলমাত্র সেইটেই আমার শ্বশুরবাড়িতে র'য়ে গিয়েছিল।"

"আশ্চর্য তো !"

"আশ্চর্য বৈকি, আমার খুব আনন্দ হয়েছে সেজন্য।"

"দেখলে তো, অমন কৃপণের মত দিলে কেন—সব যদি দিতে সব থাকত—"

"হ'তেও পারে তা, যখন সব গেল শুধু ওইটি থাকল, তখন আমরা সবাই আপনার সেই 'কৃপণ' কবিতাটা ভাবছিলুম—দিলেম

যা রাজভিখারীরে স্বর্ণ হ'য়ে এল ফিরে, তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভ'রে—তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য ক'রে—"

"মিত্রা, জানো, একবার আলমোড়া থেকে ফিরছি, সমস্ত টাকা টিকিটসুদ্ধ ব্যাগটা গেল হারিয়ে। সঙ্গে অসুস্থ মেয়ে, অসুবিধা খুবই হ'ল। মনটা যখন বিরক্তিতে খারাপ হ'য়ে গেল, তখন ভাবলুম আমায় ঠকিয়ে নিয়েছে মনে ক'রেই তো এত দুঃখ। যে নিয়েছে আমি তাকেই দিলুম, দান করলুম তাকে, একথা মনে করতে এক মুহূর্তে মন পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তুমি আসবার আগে আমি ভাবছিলুম এ গল্পটা তোমায় বলব।"

এমন সময় পুপুর বিবাহের গহনা এলো, একরাশ নূতন ঝকঝকে গহনা থালার উপরে। "আঃ, এ কন্যাটির সামনে আবার এসব কেন!"

গহনা নিয়ে চলে গেলে আমি বল্লুম, "আপনার উপর রাগ করেছি। আপনি মনে করেন আমার গহনা নেই ব'লে পুপুর গহনা দেখে আমার দুঃখিত হওয়া সম্ভব?"

"তাইতো স্বাভাবিক।"

"কখনই নয়—মেয়েদের যে গহনা-প্রীতির কথা পৃথিবীতে প্রচার হয়েছে সে দারুণ অত্যুক্তি। ওর একটা আর্থিক একটা আর্টিষ্টিক মূল্য আছে বৈকি, তাছাড়া পারিবারিক স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবেও তার দাম কম নয়। হারাতে কেউই চায় না। কিন্তু যদিই হারিয়ে যায় তো কি হবে!"

"মিত্রা তুমি বেশি দুঃখিত হওনি তাহ'লে? নিশ্চিন্ত হলুম, বৎসে, তুমি যথার্থ দুঃখ যথার্থ সুখ পাবার যোগ্য হও।"

"আলুর কাছে মাসীর অশ্বারোহণ পর্ব শুনছিলুম। আর একটু হ'লেই খাদে পড়েছিল আর কি,—তারপর তার জামাই তাকে অনেক তোয়াজ ক'রে ঠাণ্ডা করেছে···আলুর যা বর্ণনা একেবারে রোমাঞ্চকর, শুনে কবিতার প্রেরণা আসছে।—তড়বড়ি ছুটে মাসী

উঠে পড়ে ঘোড়াতে, নেমে এসে তারপরে শুধু থাকে খোঁড়াতে।
জামাতা বাবাজী তার ডাক্তার সেন যে, সযতনে মাসীমার পা
টিপিয়া দেন যে…"

মুখে মুখে একটা প্রকাণ্ড ছড়া বলে চল্লেন, আমার তা লিখে নেওয়া হয়নি, তাই সবটাই হারিয়ে গেছে।

"কিন্তু তোমাদের এই পাহাড়ে ঘোড়া, ঘোড়া নামের যোগ্য নয়। আরব ঘোড়ায় চড়েছ কখনো? সে হচ্ছে ঘোড়ার মত ঘোড়া। নতুন বৌঠান সেই ঘোড়ায় চড়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যেতেন দাদার সঙ্গে। সে যে কি রকম অসমসাহসিকতা কল্পনা করতে পার? একেতো ওই প্রকাণ্ড ঘোড়া, কিন্তু তার চাইতেও অনেক প্রকাণ্ড ব্যাপার—সে যুগের ঘরের বৌ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলেছে। তিনি কিন্তু গ্রাহ্য করতেন না, এটা কম কাণ্ড নয়,—ছিল, তাঁর মধ্যে অনন্যসাধারণতা ছিল…এই যে মাতৃষ্বসা এসো, শরীরের অবস্থা কেমন? আমি এতক্ষণ অশ্বারোহণপর্ব ব'লে মহাকাব্য শুরু করেছিলুম। বাল্মীকির হৃদয়ের কেন্দ্র থেকে যেমন ছন্দ বেরিয়ে এসেছিল, তেমনি আলুর মুখে তোমার ঘোড়ায় চড়ার বর্ণনা শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব উৎসারিত হয়েছিল, যেমন ক'রে ব'য়ে আসে অমরলোকের সুরধুনী, যেমন ক'রে ছুটে আসে উর্মিমুখর সমুদ্র, যেমন ক'রে—"

"কৈ কি কবিতা শুনব—"

"সে কি এখনও মনে আছে? ঠিক inspiration-এর সময় এলে না কেন? তোমার ভাগ্নীকে জিজ্ঞাসা কর। সে সব লিখে নেয়, এইটি ভুলে গেছে। কী আর হবে, আমার অমর সাহিত্যলোক থেকে খসে পড়ল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—আমার—"

মাসী চটে গেল।—"ওর কথা আর বলবেন না। ভীষণ স্বার্থপর হিংসুক, আমার বিষয় কবিতা কিনা, তাই দিব্যি ভুলে গেল—। নিজের বিষয়ে হ'লে এতক্ষণে পাঠিয়ে দিত প্রবাসীতে।"

"দেখ মাসী, তুমি যে সব বিশেষণ ব্যবহার করলে, আমার মতও কতকটা ওরই কাছ ঘেঁসে যায়, তবে কিনা ভয়ে বলিনে, কথাটি বলিনে। তোমার মত এত দুর্জয় সাহস কোথায় পাব, তাহ'লে তো তোমার সঙ্গেই ঘোড়ায় উঠে পড়তুম।"

"আচ্ছা, লোকে যে বলে 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ—কে লক্ষ্য করে লিখেছেন, সে কথা সত্যি ?"

"বলে নাকি লোকে ? কেন—কি সন্দীপের মতো ভালো দেখতে ? বাবাঃ, যখন সবুজপত্রে 'ঘরে বাইরে' বেরুচ্ছে তখন সে কি বিদ্রোহ। এক ভদ্রমহিলা আমায় জানালেন যে এ একেবারে অসম্ভব, হ'তেই পারে না—"

"কি হ'তেই পারে না ?"

"বাঙালীর মেয়ের এরকম মনোভাব হতে পারে না—তাহ'লে যে সমস্ত দেশ বিশুদ্ধ সতীত্বের উচ্চলোক থেকে হুস্ ক'রে পাতালে পড়ে যাবে! বঙ্গললনা, আর হিন্দুললনা সব ললনাই যে সবার আগে ললনামাত্র, সে যে মানুষ, তার মধ্যে মোহ বিকার ভালোমন্দ সবই থাকা সম্ভব তা এরা মানবে না—সতীর দেশ যে, তাই সত্যের দেশ নয়। এখন কত স্বাভাবিক হয়েছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী তাই ভাবি। যে যুগে আমরা শুরু করেছিলুম কাউকে কিছু বোঝানো দায়! পায়রা-কবির বক্‌বকানি নগদ মূল্য এক টাকা! আমার সম্বন্ধে কত নিন্দের বিষ যে উদ্‌গারিত হয়েছিল এক সময়ে, তা তোমরা জান না। এ অহেতুক বিষ কেন? একটা কথা শুনেছ বোধহয় যে আমি একজন অত্যাচারী জমিদার? অথচ এত বড় মিথ্যে খুব কম আছে। আমার সঙ্গে আমার প্রজাদের সম্বন্ধ কোন দিন স্নেহশূন্য ছিল না। সত্যি সত্যি আমায় ভালবাসতো তারা! প্রথম জমিদারীর কাজে গিয়েই একসঙ্গে একলক্ষ টাকা মাপ করেছিলুম, সেটা সহজে হয়নি। বেশ মনে পড়ে এক মুসলমান প্রজা, প্রকাণ্ড লম্বা চেহারা, একসময়ে ছিল

ডাকাতের সর্দার, সে আমায় কী ভালোই বাসত! ভারী মজা লাগত আমার তার গল্প শুনতে। এক এক দিন পাশের জমিদারের প্রজাদের ধ'রে নিয়ে আসত। কি করে তারা? ওর ভয়ে আসতেই হোতো। আমার সামনে এনে সারি সারি তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে একগাল হেসে বলত, 'নিয়ে এলুম এদের, আমাদের কর্তাকে একবার দেখে যাক্। এমন চাঁদমুখ তোরা দেখেছিস?" আমাদের ওখানে তো মুসলমান প্রজা কম ছিল না, কিন্তু একথা বলতেই হবে তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকেও তা পাইনি। আজকাল এই ঘোর কমিউন্যাল বিদ্বেষের দিনে সে সব কথা মনে পড়ে। কৈ, একবিন্দু অভিযোগ করবার কারণ কখনো ঘটেনি। যখন প্রথম গেলুম, দেখলুম বসবার বন্দোবস্ত অতি বিশ্রী। ফরাস পাতা রয়েছে উচ্চজাতেব হিন্দু আর ব্রাহ্মণদের জন্য, আর মুসলমানরা ভদ্রলোক হ'লেও দাঁড়িয়ে থাকবে,—নয়তো ফরাস তুলে বসবে। আমি বল্লুম, সে কখনো হবে না, সবাই ফরাসে বসবে। ঘোর আপত্তি উঠল, ব্রাহ্মণরা তাহ'লে বসবে না। আমি বল্লুম, বেশ তাহ'লে বসবে না। কিন্তু এ ব্যবস্থা চলবে না, তাতে যাঁদের জাত যাবে তাঁরা না হয় নিজেদের শুচিতা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আজ এই ঘোর রেষারেষির দিনে সে সব কথা মনে হয়। আমাদের অপরাধও কম নয় তা মনে রেখো। অক্ষম অপমান সহ্য ক'রে যায় বাধ্য হ'য়ে, কিন্তু সে বেদনার ক্ষত মূল প্রসার করতে থাকে ভিতরে ভিতরে গভীর হ'য়ে ওঠে গহ্বর। তারপর যখন একদিন হঠাৎ ধ্বস নামে, তখন হায় হায় ক'রে লাভ নেই।···আর একটা ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। একবার মাঠের মাঝখান দিয়ে পাল্কীতে চলেছি, দুপুরের প্রচণ্ড রোদে চাষীরা ক্ষেতে কাজ করছে। পাল্কীতে ব'সে ব'সে বোধ হয় 'ক্ষণিকা'র কবিতা লিখছি,—একটা লোক মাঠের মাঝখানে কাজ করছিল, হঠাৎ হৈ হৈ করে ছুটে এসে পাল্কী থামাল। আমি বললুম, কি চাস্? সে বললে, একটু দাঁড়া।

দাঁড়াব কী, আমার গাড়ীর সময় হ'য়ে যাবে যে। সে কি শোনে? বলে, একটুখানি দাঁড়া না! রইলুম পাল্কী থামিয়ে, সে ক্ষেতের মধ্যে আঁকাবাঁকা আলের পথ ধ'রে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে একটা টাকা আমার পায়ের কাছে রাখলে। আমি বল্লুম, এর কি প্রয়োজন ছিল? কেন শুধু শুধু এজন্য আমায় দাঁড় করালি? সে বলে—দেব না, আমরা না দিলে তোরা খাবি কি? আমার ভারী মিষ্টি লাগল তার এমন সহজ ক'রে সত্যি কথা বলা। তাই মনে আছে আজ পর্যন্ত,—আমরা না দিলে তোরা খাবি কি।"

"তুমি যে সেদিন কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে, আমি বলি তুমি মহাভারতটা নিয়ে পড়। ও এক সমুদ্র। ওর মধ্যে যে কত কি আছে তার অন্ত নেই। একদিকে যেমন চিন্তা সুদূরপ্রসারী, গভীর, অন্যদিকে তেমনি অগাধ ছেলেমানুষি, ছেলেমানুষির শেষ নেই,—পাশাপাশি রয়েছে গীতা আর ঠাকুরমার ঝুলি। এখন যেমন সত্য না হ'লে বা সম্ভবপর ঘটনা না হ'লে মানুষের মন খুশি হয় না, তাই গল্পকেও সত্যের মুখোস পরতে হয়—তখনকার দিনে মানুষের মন এত খুঁতখুঁতে ছিল না। গল্প, তা সে গল্পই, সেখানে সম্ভব অসম্ভব একাকার হয়ে গেছে। তা নৈলে মুনিঋষিদের সঙ্গে সাপেরাও দিব্যি শাস্ত্রালোচনা শুরু করে! আনো না আমার ডায়েরির খাতাটা, আমি যে নোটগুলো করেছিলুম তোমায় দিই। আমার আর এখন হবে না—এ দীর্ঘদিন লাগবে—আমি তোমাকে যেমন বলে যাই তেমনি ক'রে শুরু কর। এর মধ্যে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মহাভারতের সম্পূর্ণ গল্পটা রূপক। এর একটা বলবার কথা আছে এবং সে কথা কৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে। কৃষ্ণই এর নায়ক। পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিল কৃষ্ণাকে, অর্থাৎ কৃষ্ণর cult-কে। তা না হ'লে পঞ্চ ভ্রাতাকে এক কন্যা মালা দিল, সেও কখনো সম্ভব! কৃষ্ণাকে যারা বরণ করলে, কৃষ্ণের তারাই আশ্রিত। লড়াইটা জমির জন্য নয়, লড়াই কৃষ্ণকে

নিয়ে—লড়াই মতের। তা যদি না হোতো তাহ'লে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাঝখানে হঠাৎ ওই একশো গজ লম্বা গীতা আওড়ানো কখনো সম্ভব হোতো না, কোনো মানে হোতো না তার। তুমি আমার ডায়েরি থেকে এ সবটা টুকে নাও। মহাভারতের সব চেয়ে যে গভীর মর্মকথা, যে উপদেশ, সে মুনিঋষিদের উপদেশ বা যুধিষ্ঠিরের আদর্শবাদিতার মধ্যে নেই, সে মহাপ্রস্থানে। এত বড় যুদ্ধ, এত মারামারি হানাহানি, সে লোভের জন্য নয়, স্বার্থের ঘৃণ্যতার মধ্যে তার সমাপ্তি নয়। ত্যাগের জন্যই যে আকাঙ্ক্ষা, বর্জনের জন্যই গ্রহণ, সেই নির্দেশই এই কাব্যের প্রধান কথা।"

এই প্রসঙ্গে ১৩৪৭ সালের ৭ই পৌষ উৎসবের ভাষণ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি। বর্তমান কালের রক্তকলুষ হিংস্র যুদ্ধের পটভূমিকার উপর মহাভারতের যুদ্ধকে তিনি কি ভাবে দেখেছিলেন তা জানা যাবে। "পাশ্চাত্য অলংকার মতে মহাকাব্য যুদ্ধ-মূলক। মহাভারতের আখ্যানভাগেও অধিকাংশ যুদ্ধ বর্ণনার দ্বারা অধিকৃত—কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্ত-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যায় জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ ক'রে বিজয়ী-পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন। এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ। এই নির্দেশ সকল কালে সকল মানবের প্রতি,— যে ভোগ একান্ত স্বার্থগত, ত্যাগের দ্বারা তাকে ক্ষালন করতে হবে।"

মনে পড়ে প্রত্যেক দিন রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে, মানুষের এই হিংস্রতার কলঙ্কে কি বেদনা তিনি পেতেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি সাধনা করেছেন মানুষকে মানুষের নিকটে আনতে,—বিভিন্ন দলের শিক্ষা সংস্কৃতির আদর্শকে তিনি ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে একত্র করতে চেয়েছেন,—নিত্য উৎসারিত প্রেমের, আনন্দের বাণী তিনি শুনিয়েছেন সমস্ত জগৎকে—কিন্তু কোথায় প্রেম, কোথায় আনন্দ, কোথায় মানুষের

মনুষ্যত্ব। সমস্ত জগৎ যখন এমন পাগল হ'য়ে বিকৃত বুদ্ধিতে একে আর একের গলা চেপে ধরল তখন দেখেছি তাঁর বেদনা।— আমাদের কাছে দূর দেশের যুদ্ধ অনেকটা পরিমাণেই যুদ্ধের গল্প ছিল, কিন্তু সকল দেশ সকল মানুষ যাঁর আপন, তাঁর কাছে আর্ত মানবের দুঃখ প্রতিদিন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হ'য়ে পোঁছত। এত কষ্ট পেতেন যে ইচ্ছে করত না তাঁকে খবর শোনাই, কিন্তু উপায় ছিল না। •তাই গভীর বেদনা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন 'হিংসায় 'উন্মত্ত পৃথ্বী'—আহ্বান করেছিলেন অনন্ত পুণ্যের আবির্ভাব।

শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণা-ঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

আবার সেই বেদনাপূর্ণ হৃদয়েই বিদ্রূপ ক'রে লিখেছেন—

ঐ শোনা যায় রেডিওতে বোঁচা গোঁফের হুমকি
দেশ বিদেশে সহর গ্রামে গলা কাটার ধুম্ কি !

গোঁ গোঁ করে রেডিওটা কে জানে কার জিত,
মেশিন গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্য বিধির ভিত।

চির বিদায়ের অল্প দিন পূর্বে মানুষের এই কলঙ্কিত ইতিহাস তাঁকে তীব্র বেদনা দিয়েছিল।

বাড়িতে যদি অতিথি আসবার কথা হ'ত তাহ'লে তাঁর ভাবনা চিন্তার অন্ত থাকত না। কি হবে, কে কোথায় শোবে, জায়গা হবে তো,—এবং সবার আগে নিজের ঘর ছেড়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন।

"আমি তোমায় বার বার বলছি ছোট ঘরই আমার ভালো লাগে।"

"তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনি এই ঘর ছেড়ে দিয়ে ছোট ঘরে ঢুকবেন, তাহ'লে যাঁকে এখানে থাকতে হবে তিনি কিছু আরাম পাবেন না।"

"তা বটে, তাহ'লে আমার চশমাটা দিয়ে যাও, আর এবার একটু শান্ত হ'য়ে বসো। সারাদিন যা হৈ হৈ চলেছে, জিনিসপত্র লণ্ড ভণ্ড এক কাণ্ড। আজও গল্প পড়া হোলো না, কালও হবে না।"

"কেন কাল হবে না, নিশ্চয় হবে।"

"তা কি হয়,—থাকবে যে, তাঁদের এসব ভালো লাগবে না। তোমাদের মত ধৈর্য কি সকলের থাকে ?"

"সে তো নিশ্চয়ই, আপনার মুখে আপনার লেখা শোনা সে কি কম কষ্ট! কত লোকে আমাদের দুঃখে সহানুভূতি জানায়!"

পরদিন সকাল থেকেই ব্যস্ত, কতক্ষণে অতিথি আসবেন, অথচ আমাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ চলেছে নানা রকম ঠাট্টা। "নতুন অতিথি আসবার উৎসাহে যে পুরোনো অতিথিকে একেবারে বিসর্জন দিতে বসেছ,--আজ আর Copyর কাজ হবে না ?"

"কেন হবে না, এই তো হচ্ছে।"

"কৈ আনো দেখি! কি, জানলা দিয়ে অত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে কি দেখছো ?"

"দূরে একটা গাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

"তবে তো কথাই নেই, 'এখন চল সখি কুঞ্জম্ সতিমিরপুঞ্জম্,' তুচ্ছ কপি টপি রেখে দাও।"

"না, গাড়ীটা চলে গেল।"

"গেল—? হায় হায়,—আমারি আঙিনা দিয়া! তোমার একেবারে জয়দেবের রাধিকার মত অবস্থা হ'য়ে উঠেছে, পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।"

"আহা কি যে বলেন তার ঠিক নেই। যাকে তাকে নিয়ে ঠাট্টা!"

"কাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে ঠিক তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয় তা তো জানিনে সখি, সেইটে যদি তুমি খুব গোপনে বলে ফেলো তাহ'লে আমার আর যাকে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে হয় না ··কে

ও ডাক্তার? আহা তুমি এমন সময়ে এসে পড়লে, এই মাত্র ইনি আমায় একটা গোপনীয় খবর বলতে যাচ্ছিলেন, সে তোমার সামনে চলবে না,—আর যেই হোক তোমার সামনে নয়, শেষকালে আমার তুচ্ছ কৌতূহলের জন্যে একটা গৃহবিচ্ছেদ হ'য়ে যাবে।"

ডাক্তার আড়ালে অন্যরকম, কিন্তু সামনে এলে বিষম বিপন্ন হ'য়ে পড়তেন। কোনো রকমে বল্লেন, "তাঁরা কিন্তু এসে পড়েছেন।"

"ও বাবা তাই নাকি, তাহ'লে তো এখুনি আমায় ভদ্রলোক হ'য়ে বসতে হবে, জোব্বা গায় দিতে হবে। জয়দেবের কবিতা আর একেবারেই নয়। এখন জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে দেশাত্মবোধ।"

এখানে এসে এবারে একটা ছোট গল্প লিখলেন "শেষ কথা।" কি আশ্চর্য পরিশ্রম করতে পারতেন এখনও পর্যন্তও, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ভোর পাঁচটায় বাইরে এসে বসতেন, ছ'টার মধ্যে চা খাওয়া খবর শোনা শেষ ক'রে চিঠির উত্তর লিখতে বসতেন। প্রত্যেক দিনই তো চিঠি জড়ো হোতো কম নয়। তারপর থেকে শুরু হোতো লেখা। মাঝে ঘণ্টা দেড়েক স্নানাহারের জন্য বাদ দিয়ে তারপর একেবারে আলো জ্বলা পর্যন্ত কাজ চলেছে তো চলেছেই। সন্ধ্যেবেলা লেখা ছেড়ে উঠে অল্প সময় বসতেন বারান্দায় অন্ধকারে, একটুক্ষণ গল্প চলত, তারপরে খাওয়া সেরে শুরু হোতো পড়া। আমাদের তো সবটাই লাভ,—প্রত্যেকদিন তাঁর মুখের পড়া শোনা কি কম সৌভাগ্য,—কিন্তু ভয়ও করত যদি ক্লান্ত বোধ করেন। তিনি তা গ্রাহ্যই করতেন না, কতদিন নিজেই বলতেন— আজ আলো জ্বলবে না? 'শেষ কথা' লেখা হ'লে বল্লেন— "এখনকার এগুলো গল্পগুচ্ছের মত নয়—এগুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হ'য়ে পড়ে। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো যেমন মানুষের প্রত্যহের ঘরোয়া জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকাল আর

সে রকম হয় না। আশ্চর্য লাগে আমার, কি ক'রে অত details মনে হোতো, লিখতুম কি ক'রে।"

'শেষ কথা' লেখা হ'য়ে গেলে একদিন পড়ে শোনালেন সম্পূর্ণটা। তার পরে বিজয়া দশমীর দিনে খাতাটা আমায় উপহার দিলেন। মাসী এসে বল্লে—"এ কি রকম ব্যবহার আপনার? এক বাড়িতে তুজন মানুষ আছে, অথচ আপনি—"

"তাতো আছেই, নিশ্চয় আছে, কিন্তু দিনটাতো এখনো শেষ হয়নি। একটু অপেক্ষা করেই দেখনা।"

সেদিন বিজয়া উপলক্ষে এখানকার সকলকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন—পর্ব চুকে গেলে সবাই চলে গেলেন, রাত্রি হ'য়ে গেছে তখন,—ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি একমনে ছবি আঁকছেন।

"এ কি কাণ্ড, এখন শোবেন চলুন—"

"তা হবে না—মাসীর ছবি শেষ না ক'রে রাতে ঘুম হবে না।"

বিপন্ন মাসী ছুটে এল—"এখন থাক, এখন আর নয়, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

"তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নিতে পার, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিতে পারিনে, তোমার কথায় আমার কথায় এই সামান্য একটু প্রভেদ।"

"অয়ি সীমন্তিনী, নবপুষ্প-মঞ্জরিতা তুমি বসন্তিনী, এই দেখ তোমার চিঠির কাগজের জন্য চিহ্ন আঁকছি বসে বসে। এর নীচে লেখা থাকবে,—অয়ি সীমন্তিনী, নবপুষ্প-মঞ্জরিতা তুমি বসন্তিনী, সে কেমন হবে?"

"এ সব কথা থাক, কালকের তর্ক শেষ হোক।"

"দেখো সুমিত্রা, কালকের তর্ক কিছুতেই শেষ হতে পারে না, যদি না তুমি নিজের মনে বেশ ক'রে ভেবে দেখো। কতকগুলো বিষয় আছে যা কেবল মাত্র যুক্তি তর্ক দ্বারা বোঝানো যায় না, যদি না দীর্ঘকালের সংস্কারের প্রভাব থেকে সরিয়ে বিশুদ্ধ চিন্তার

দ্বারা বুদ্ধির আবিলতা দূর করা যায়। আমাদের দেশে চিরদিন মানুষকে এক একটা মতের খুঁটিতে বলির পশুর মত বেঁধে রাখা হয়েছে। ছাড়া পাওয়া শক্ত। কিন্তু মনের দাসত্ব না ঘুচলে মানুষকে সত্য ক'রে জানা জীবনকে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখা তো সম্ভব হয় না। একজন মানুষ থাকবে না ব'লে আর একজনের জীবন শূন্য হয়ে যাবে, এ কথাকে তুমি আবার justify কর? তোমাকে কে বলেছে, দুঃখ শোক মানুষের জীবন ব্যর্থ করে। দুঃখে জীবন ব্যর্থ হয় তাদের, যারা অমন করে নিজেকে দুঃখের কাছে অসহায় ভাবে সমর্পণ করে, এবং তাতেই গৌরব বোধ করে। শোককে চিরকাল শোক ক'রে রেখে নিজেকে সেইখানে জীবন্ত সমাধি দেওয়াকে আমাদের দেশের লোকেরা বলেন সতীত্ব! একটি ক্ষণকালীন স্মৃতিকে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে অক্ষয় করতে হবে, এবং সেই জন্য উজ্জ্বল আনন্দময় পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যদি ঘরে দরজা বন্ধ কর তাতে কি গৌরব? তোমরা মনে কর সেটা একটা মস্ত বড় ত্যাগ? কিন্তু কিসের জন্য ত্যাগ? ত্যাগ তখনই মহিমান্বিত, যখন সে জীবনের কাজে উৎসর্গিত। মৃত্যুর অন্ধকার জীবনে ঘনীভূত করে তোলা, সংসারের দুঃখ বেদনার কাছে নিরাশ্রয়ভাবে আত্মসমর্পণ, নিরতিশয় শ্রীহীন। মানুষকে কোনো একটা স্থানে screw up ক'রে ফেলে সেখানেই জীবন শেষ ক'রে দেওয়া বিধাতার উদ্দেশ্য নয়, বাঁশের বাধার মধ্যে বাঁশী যেমন বাজে, তেমনি দুঃখতাপের দহনের মধ্যে বাজিয়ে চলতে হবে সুর। * * * সংসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পদে পদে কাঁটা, সেই কণ্টকাকীর্ণ পথেই হাসিমুখে আনন্দিত হ'য়ে চলতে হবে, এই তো মানুষের পরীক্ষা। বেদনাকে বোধনায় পরিণত করতে হবে, অম্লতাকে মাধুর্যে। জীবনে দুঃখ পাবার একটি গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই দুঃসহ তাপের মধ্যেই পরিচয় ঘটে অন্তরতম নিত্য 'আমি'র সঙ্গে। * * * তা ছাড়া তাকিয়ে দেখ দেখি, আজ জগৎ জুড়ে কী কাণ্ডটাই চলছে। সেই দুঃসহ দুঃখের

দক্ষ-যজ্ঞের কাছে তোমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ সুখ কি তুচ্ছ হয়ে যায় না? তাকে প্রাধান্য দিতে সংকোচ বোধ হয় না? * * আমার যাদের সঙ্গে স্নেহের যোগ আছে, আমি তাদের কাছে সেই আত্মবিজয়ী সাধনা প্রত্যাশা করি। আশা করি তোমাদের আপন ব্যক্তিগত চিন্তার গণ্ডি থেকে আপনাকে ঊর্ধ্বে তুলতে পারবে। * * তুমি যখন কাল চলে গেলে আমি তারপর অনেকক্ষণ ভাবলুম। একবার মনে হোলো তোমায় ডেকে বুঝিয়ে বলি, কিন্তু সাহস হোল না। হয়তো মনে করতেও পারতে বড় বড় উপদেশের কঠিন পাথর দিয়ে আমি তোমাদের বেদনাকে মাড়িয়ে দিতে চাই। কিংবা আমি জুলুম ক'রে আমার মত তোমাদের উপর চাপাচ্ছি। এ দুটোতেই আমার সমান আপত্তি। প্রত্যেক মানুষের একটা স্বতন্ত্র মত, স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, স্বাভাবিক ভাবে তাকে আপন গতিতে ব'য়ে যেতে দেওয়া উচিত। বড়োর অধিকার নিয়ে তার উপর জবরদস্তি আমার একেবারেই ভালো লাগে না। সেই জন্যই আমি তোমায় ডাকলুম না।"

"কাল রাতে দুবার স্বপ্ন দেখলুম, আশ্চর্য। আমি বড় একটা স্বপ্ন দেখিনে তা জানো, কিন্তু তোমার এখানে এসে আমায় স্বপ্নে পেয়েছে। প্রথমে দেখলুম যেন নলিনীকে বলছি যে, আমি এমন একটা খবরের কাগজ বের করব যা কোনো দলের কথা বলবে না। একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখবার শিক্ষা দেবে। তখন নলিনী যেন তার খসড়া তৈরি করতে লাগল,—কোথা থেকে কাগজ প্রকাশিত হবে, কে তার পৃষ্ঠপোষক কেই বা তার সম্পাদক, এই সব। এ স্বপ্নটা বোধহয় কাল ওর সঙ্গে যে নানা রকম আলোচনা চলছিল তারই ফল। মন্দ হয় না সত্যি ওরকম একটা কাগজ বের করলে। আমাদের একটা ভালো দৈনিকের দরকার আছে। বলব না কি ওকে আজ? যদি তার আসল দিকটার ওরা ব্যবস্থা করে তাহ'লে আমি না হয়—"

"আর থাক। আর আপনাকে খবরের কাগজ বের করতে হবে না,—নিজেই রাত দিন বলছেন, আর পারিনে এবার ছুটি চাই, বিশ্রাম চাই, তার পর খবরের কাগজ নিয়ে রাজ্যের লোকের মতামতের ঘূর্ণিপাকে পড়ুন আর কি।"

"যা বলেছ, ওইতো আমার দোষ কিছুতেই শিক্ষা হয় না। তারপরে আসল স্বপ্নটা শোনো আগে। হঠাৎ মনে হোলো যেন আমি চুপ চাপ শুয়ে আছি, আর একটা লোক, তার হাতে ধারালো ছুরি, সে আমার পেট চিরে দেখছে—"

"এ কি বিশ্রী অদ্ভুত স্বপ্ন!"

"আরে শোনো না সবটা, তারপর আমি যেন খুব বিরক্ত হয়ে তাকে ধমকে বল্লুম, এ কি রকম তোমার ব্যবহার, কে তুমি? সে বল্লে,—আমি নারদ, তার হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল। আচ্ছা একে কি বলা যায়? তোমার বাড়িতে এ রকম রাত দুপুরে নারদের আবির্ভাব হয় কেন? সেই থেকে মনটা নারদ নারদ করছে, আজ দিনটা কি ভাবে যাবে কে জানে!"

"কি, অমন করে এসে পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড় কেন? ওতে লোকে মনে করে যে আমি ভদ্রমহিলার সম্মান রাখতে পারিনে। তোমরা প্রগতিবাদিনী আধুনিকা, তোমাদের কি এ শোভা পায়? কাল—তাঁর এক প্রবন্ধ আমায় পাঠিয়েছেন, দেখেছিলুম বসে বসে। স্বজাতি মহিমা কীর্তনে একেবারে আত্মহারা।—মাতৃজাতি মাতৃজাতি ক'রে এত হৈ হৈ করবার কি দরকার—সে তো একটা নিজের কোন কৃতিত্ব নয়। আমরা তো নিজেদের পিতৃজাতি ব'লে গৌরব ক'রে বেড়াই নে। সাধনা প্রয়োজন প্রিয়া হবার জন্যে, সেখানে নিজেকে *সৃষ্টি* করতে হয়। অথচ বড় গলায় বলবার বেলা যাই বল, যতই মাতৃজাতি মাতৃজাতি ক'রে বেচারা পিতৃজাতিকে স্তম্ভিত ক'রে দিতে চাও, মেয়েরা মেয়েদের যত ক্ষতি করে এত পুরুষে কখনো করে না। কোনো

একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের ভালো দেখতে পারে না। সমস্ত জগৎসংসারকে নিজের চারপাশে এতটুকু গণ্ডির মধ্যে ধ'রে ফেলতে চায়। পুরুষকে সুদ্ধ নামিয়ে নিয়ে আসে।"

"আহা, পুরুষদের মধ্যে আর ঈর্ষাদ্বেষ নেই? এত মারামারি কাটাকাটি চলছে কেন তবে?"

"সে অন্য রকম। ঈর্ষা আছে বৈকি, কিন্তু জীবনের পরিধি বৃহত্তর ব'লে তার প্রকাশে এতটা মালিন্য নেই। কখনো দেখেছ দুজন পুরুষ ঝগড়া করে, যদি না তাদের মধ্যে মেয়ে জড়িত থাকে?"

"দারয়তি ভেদয়তি ভ্রাতৃণ।"

"তাই'ত ঠিক, কিছুতেই তারা যথার্থ সঙ্গিনী হ'তে পারে না। যতই লেখাপড়া শিখুক, বড় বড় বুলি শিখুক, তাদের যেটা কর্মের পরিধি সে অনুদার, গণ্ডিবদ্ধ, তাই অনেক বড়কেও তারা ছোট ক'রে ফেলে তবে অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষই মেয়ে। তা বল্লেও সব বলা হয় না, তারা শিশু! কি খোকামি তাই আজ পর্যন্ত চলেছে দেশ জুড়ে! 'মা, মা', ক'রে চিৎকার, সমস্ত দেশ যেন মায়ের কোলের খোকা। পুরুষকে যথার্থ পুরুষত্বে দীক্ষিত করতে হ'লে মেয়েদেরও সাহায্য প্রয়োজন। আমি তো দেখি নির্লিপ্ত নিস্পৃহ হ'য়ে যেখানে পুরুষকে কর্মের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হবে, সেখানে কোনো মেয়ে এসে পড়লেই সব গোলমাল হ'য়ে যায়।"

"আপনিও দেখছি শেষটায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগীদের দলে · "

"মাংপবী, চুপ দাও চুপ দাও, হচ্ছিল কামিনীর কথা, ওর মধ্যে আবার কাঞ্চন নিয়ে এলে কেন? একেই বলে ঘরের শত্রু! ও কথা তুলোনা তুলোনা! কামিনী নৈলে বরং চলে, কিন্তু কাঞ্চন নৈলে বিশ্বভারতীর কি হবে! · সত্যি এই সব প্রগতিবাদিনীদের লেখা প'ড়ে আমার হাসি পায়। এরা মনে করে পুরুষজাতটাকে বাদ দিয়ে অনায়াসেই এদের চলে,—কী অহঙ্কার! পুরুষের দাসীত্ব! মাতৃজাতির অধিকার! বড় বড় সব কথা! আরে বাবা, কে কাকে দিয়ে দাসীত্ব করায়, তোমরা নিজেরাই দাসীত্ব ক'রে খুশী হও।

আর সেটা দাসীত্বও নয়। মানি আমাদের দেশের মেয়েদের জীবনে কর্মের উদার ক্ষেত্র নেই, কিন্তু স্নেহের প্রেমের মহিমায় তোমরা তো কর তোমাদের ভাগ্যকে অতিক্রম। এই যে শুধু শুধু রাত্তিরে ঘুমোও না, এসে এসে দেখা চাই আমি কি রকম আরামে নিদ্রা দিচ্ছি,—অনর্থক এই হাঙ্গামা কেন? আর যদি জেগেই থাকতুম তাহ'লে একজন বিনিদ্র ব্যক্তির জন্য বাড়িসুদ্ধ লোক নিদ্রা ত্যাগ করবে, এর কি লজিক্ তোমরাই জান। অথচ দোষ দেবার বেলা দুষবে অভাগা পিতৃজাতিকে। তাই তোমার ব্যবহার দেখে আমার কেবলি সন্দেহ হয় এ আমাকে বিপদে ফেলবার ফন্দি ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার কী দরকার রস হাতে অপেক্ষা ক'রে থাকা? আর আমি, যেন কোথাও কিছু হয়নি, যেন এইটাই আমার প্রাপ্য এমনি গম্ভীর মেজাজে লিখেই চলেছি লিখেই চলেছি—যখন আমার সুবিধে হবে দয়া ক'রে ধম্‌কে বলব, জ্বালালে দেখছি, তারপর আরো দয়া ক'রে খেয়ে তোমায় কৃতার্থ করব। কেন, এর দরকার কি? বল্লেই পার, আপনার খুশি আপনি রস ক'রে খান গে, এখন আমার দাসীত্ব করবার সময় নেই, তার চেয়ে আমি এখন বর্তমান রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখব! তবে তুমিও কম নও! সে দিন কি তর্কই করলে, আমাকে শুদ্ধ দলে টানছ—দেখছ না তোমার মতে চলে চলে কি রকম সোভিয়েট বিরুদ্ধ আর ইংরেজভক্ত হ'য়ে উঠছি আমি।"

"কী, আমি ইংরেজভক্ত! কত দুর্নামই যে আপনি রটাচ্ছেন, শেষটায় ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারব না।"

"ইংরেজভক্ত নয়? বাঁচা গেল, আমি তো অপেক্ষা করে আছি কবে তুমি ছাতাওয়ালার ছাতার বর্ণনা ক'রে কবিতা লিখে ফেল।"

একবার শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যেবেলা এলেন একটি আধুনিকা, ঘণ্টা দেড়েক ধরে প্রগতি-প্রসঙ্গ চলল। তাঁর শ্রোতা অধিকাংশ সময় নীরবেই ছিলেন, তারপর বল্লেন—"দেখ তোমার সঙ্গে আমি ঠিক একমত নয়। সেবা মেয়েদের স্বভাবের ধর্ম, ওটা যে পুরুষ

তাদের কথার স্তুতিবাদে ফাঁকি দিয়ে আদায় ক'রে নিচ্ছে তা নয়। সেবা পেলে ভালো লাগে, কিন্তু ওদের দিতেও ভালো লাগে, তাই দেয়।" সেদিন অনেক কথা হয়েছিল, আমার সব মনে নেই। পরের দিন সকালবেলা পায়ের কাছে গিয়ে বসলুম। "এই দেখ আবার মাটিতে বসে,—দেখে ফেল্লে আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। কালকের আলোচনায় তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান একটুও বাড়ল না দেখছি!" এমন সময় ভদ্রাদেবী নিয়ে এলেন ডাবের জল। "ওটা কি পদার্থ? ডাব? তোমাদের নিয়ে কি বিপদেই পড়েছি। আচ্ছা কেন, তুমি তো বল্লেই পারতে—দেখুন আমি আপনার দাসীত্ব করতে পারব না! ওই তো গাছ রয়েছে, ইচ্ছে হয় চড়ে খান না। তা নয়,—দেখে ফেল্লে কি বলবেন?"

"এখন কেমন আছেন?"

"যে মারমাইট স্যুপ খাইয়ে গেলে, তারপর থেকে সাংঘাতিক জোর পাচ্ছি। মার মার করছে মন,—যুদ্ধে নেমে পড়তে ইচ্ছে করছে।"

"রথীদার ছবি দেখলেন?"

"দেখলুম, ওর ফুলের ছবিগুলো সত্যিই ভালো, এত delicate ক'রে আঁকে। ফুলের ছবিতেই ওর বিশেষত্ব। মাসীও একটা ছবি দেখিয়ে গেলেন—অর্কিড গুচ্ছ। বেশ হয়েছে।"

"চারিদিকে ছবি আঁকার ধুম পড়ে গেছে,—সবাই এক একটা জায়গায় রং তুলি নিয়ে বসে গিয়েছেন।"

"তাই নাকি, এর মধ্যে আমাদের ডাক্তার আর আলুই বাফার স্টেট্—মাসী আর রথী এরা হোলো আর্টিষ্ট, আর তুমি আর আমি হলুম আনার্টিষ্ট। আমাদের একটা প্যাক্ট করতে হবে আনার্টিষ্টদের প্যাক্ট—আজ একটা এমন ছবি আঁকব, কেউ দেখলে সন্দেহমাত্র করবে না যে কোন আর্টিষ্টের আঁকা! তার উপরে সই হবে আমাদের প্যাক্ট!…কী মাসী, কোন্ ধ্যানের আসন

থেকে উঠে এলে ? এটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না ?—সখি এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা কেমনে আছে সে পাসরি—সেথা কি হাসেনা চাঁদিনী যামিনী সেথা কি বাজে না বাঁশরী—"—কীর্তনের মত সুর ক'রে বল্লেন—"তাই তোমায় বুঝিয়ে বলছি, এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে, তারে আর তুমি সেধোনা—তার চেয়ে বরং—আমি কথা নাহি কব দুখ লয়ে রব মনে মনে স'ব বেদনা, সখি এত প্রেম আশা—আরে তাই বা কেন, এত বেদনাই বা কিসের, সংসারে আরো কি পাঁচজন নেই নাকি···"

"কি যে সব বলেন। যত ঠাট্টা, তার চেয়ে গানটা করুন—"

"কী গান করব ?

ওই মধুর মুখ জাগে মনে···
ভুলিব না এ জীবনে···
কি স্বপনে কি জাগরণে···
তুমি জানো বা না জানো
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে
আমি প্রকাশিতে পারিনে
শুধু চাহি কাতর নয়নে"···

অনেকক্ষণ ধরে এ গানটা করেছিলেন,—সেই সুর এখানে দিতে পারিনে বলে এ লেখা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেদিন কিছু পরে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—গান শুনলে এত মন কেমন করে কেন ? উনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন—"কী প্রশ্ন ! মনের বড় বালাই, যাদের মন কেমন করেই আছে, তারা আবার জিজ্ঞাসা করে গান শুনলে মন কেমন করে কেন।" একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন তার পরে বল্লেন,—"সুরের রাজ্য এক পৃথক রাজ্য, সে দূরের জগৎ, অন্য স্তর। সে স্তরে আমরা সর্বদা থাকিনে। আমরা যে-জগতে ছোটোখাটো সুখদুঃখে দোদুল্যমান হ'য়ে রয়েছি, সুর আমাদের নিয়ে যায় সে বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে ঊর্ধ্বলোকে, অন্য জগতে।

তার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আবেষ্টন একেবারে পৃথক। আমরা অনুভব করি হৃদয়ে সেই অনির্বচনীয় স্পর্শ, কিন্তু আমরা তো সেখানকার নয়, তাই বোধহয় এই অনির্দিষ্ট বেদনা। সুর যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মন সেখানে নিরবলম্বন হ'য়ে চ্যুত হবার জন্যই যেন রয়েছে। যেমন সমুদ্রের ঢেউ ছুটে এসে ক্ষণিকের জন্য তীরকে অতিক্রম করে, আবার ফিরে যায় তার বন্ধনের মধ্যে, আমাদের মনও তেমনি নিজের এবং চারপাশের বন্ধন অতিক্রম ক'রে ভেসে যায় সুরধ্বনিতে, কিন্তু সেখানে তার স্থান নয়। আবার ফিরে আসতে হবে তাকে নিম্নভূমিতে। সৌন্দর্যের জগতে ক্ষণকালের এই প্রবেশ, তার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিতে তো মন পারে না,—ভালো লাগে, বেদনা মেশানো ভালো লাগা।"

"আপনাকে একটা মজার গল্প বলি—একবার এখানে একটা লম্বা চওড়া দৈত্যের মত সাহেব এসেছিল—একদিন সকালবেলা রেডিওতে ভারি সুন্দর সেতার বাজছে, আমরা বসেছি চায়ের টেবিলে—সে ভদ্রলোক অনর্গল আজে বাজে বকে চলেছে। আমার ভারি বিরক্ত লাগছিল। এমন সুন্দর বাজনা, শুনতেও পায় না কি,—হোক্ না প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া, মানুষ তো বটে। তাকে জিজ্ঞাস করলুম—'এমন সুর যখন বাজতে থাকে, don't you feel any difference?' সে দারুণ আশ্চর্য হ'য়ে গেল,—'difference! what sort of difference?' আমি ততোধিক আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'Don't you feel something strange within you? Say, like Weeping?' সে তার ওপরে তিনগুণ আশ্চর্য হ'য়ে বল্লে—'weeping?' There must be something very wrong with you. Why, I haven't wept for last fifteen years!"

উনি হাসতে লাগলেন, "ধরেছে ঠিক। একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয় হ'য়ে গেছে, নৈলে আর এমন হয়?—কেন মন কেন এমন করে, কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়" এই গানটা প্রায়ই

গাইতেন, সেদিনও গাইলেন—"যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন, যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে—বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে···"

একবার কাগজে একজন আধুনিক সনাতনী পণ্ডিতের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি জাতিভেদ থেকে শুরু করে পর্দাপ্রথা পর্যন্ত সব কিছু সনাতনী বুদ্ধির সংরক্ষণী প্রস্তাব করেছিলেন। জাতি ভেদের প্রয়োজনীয়তা থেকে শুরু করে গোবরের বিশুদ্ধতার বৈজ্ঞানিক কারণ প্রভৃতি অনেক কিছু তথ্য তাতে ছিল। দেখি একটা লাইন টানা ফুলস্কেপ কাগজে ফাউনটেন পেন দিয়ে, একটা চেহারা আঁকছেন বসে বসে—"কালকের বক্তৃতাটা পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছ ত? তোমাদের কত সুখ্যাতি করেছে, তোমরাই দেশটাকে বাঁচাতে পার যদি আবার এক শ বছর পিছিয়ে নিয়ে যাও। এই চেহারাটা কেমন হয়েছে? ঠিক যেন বক্তৃতা দিচ্ছে", এই বলে, বলে উঠলেন, "মেয়েরা বাঁচাবে দেশ—দেশ যবে গেল অধঃপাতে।" কিছুক্ষণ পরে এসে দেখি সেই ছবিটার সঙ্গে এক প্রকাণ্ড কবিতা লেখা হয়েছে—

পুরুষের তন্ত্র মন্ত্র মিছে
মনুপরাশরদের সাধ্য নেই টেনে রাখে পিছে
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ
খাওয়া ছোঁওয়া সব তাতে করে গোলযোগ—
চলমান সময়েরে দিতে পারে ফাঁকি।
তাই আজ মেয়েদের ডাকি
সমাজকে বাঁধুক আঁচলে—
গণ্ডি ছেড়ে যেন সে না চলে।
মেয়েরা বাঁচাবে দেশ দেশ যবে যেতে চায় আগে—
হাই তুলে দুর্গা বলে যেন তারা শেষ রাতে জাগে।
খিড়কির পুকুরেতে সোজা—
বহে যেন নিয়ে আসে যত এঁঠো বাসনের বোঝা
মাজা ঘষা শেষ করে আঙিনায় ছোটে,

ধড় ফড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজা মুড়ো জাপটিয়ে ধ'রে—
সুনিপুণ কব্জির জোরে ;
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে বসে
কোমরে আঁচল বেঁধে কষে।
কুটি কুটি বানায় ইচোড়
চাকা চাকা করে দিয়ে থোড়
আঙুলে জড়ায় তার সুতো
মোচাগুলো ঘস ঘস কেটে চলে দ্রুত।

"সাংঘাতিক! আপনি এত খবর জানলেন কি করে ?"

"কেন জানবনা ? আমি সংসারে বাস করিনে ? চাঁদের পানে চক্ষু তুলে রইনি পড়ে নদীর কুলে! তবে তোমার দ্বারা এর একটাও কাজ হবে না, আমি জানি তা!"

তারপরে ছাঁটাই কাটাই করে ও নানা পরিবর্তন করে বেশ বড় একটা কবিতা হল। উপযুক্ত একটি মেয়ের নাম চাই ; যার নামে কাগজে যাবে, একবার হল মাতঙ্গিণী হাজরা, একবার হল নবরাণী হালদার, আরো অনেক কিছু নাম বাছাই হল। শেষ পর্যন্ত বোধহয় নবরাণী হালদার নামে অলকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাটা।

রবীন্দ্র রচনাবলী এসেছে দু' কপি—হাতে নিয়ে ওল্টাচ্ছেন। বারান্দায় আসতেই বল্লেন—"হে কল্যাণী, কলমটা দাও,—দেবীকে এই বইটা উপহার দেব, তার নাম লিখতে হবে।"

এগিয়ে দিলুম কলম, ধরে ধরে লিখলেন—কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী।

"বাঃ, এই যে বল্লেন—কে দেবেন ?"

"তোমায় পরীক্ষা করলুম, মুখের ভাবখানা কি রকম হয়, দাও কি না কলমটা! আমার অভিভাবকদের কড়া হুকুম হয়েছে এ বই

আমি কাউকে দিতে পারব না, একেবারে কাউকে নয়। তাই তোমায় একখানা লুকিয়ে দিচ্ছি। তুমি কিছু ভাবনা করো না। আমায় তো ওরা দু' কপি ক'রে দেবেই তা থেকে তোমায় আমি একটা দেব এই এমন করে 'লুকিয়ে'। তবে ওরা আবার আমায় সবচেয়ে খারাপ বাঁধানটা দেয়—কী হবে, যা আছে তোমার ভাগ্যে"—বলতে বলতে হঠাৎ দুই হাত দুই কানের উপর চাপা দিয়ে বল্লেন—"শিগগির বল এটা কি ?

কোথাও কিছু নেই, কি প্রশ্ন, বুঝতেই সময় লাগে।

"কি আবার ?"

"হ্যাঁঃ, অত চট ক'রে যদি বলবে তবেই হয়েছে। ভেবে বল। এটা 'চাপকান'—"

তারপর প্রায়ই এ খেলাটা হোতো, এর নাম শারাড। অন্য কথাবার্তা হচ্ছে ফস্ ক'রে বলতে শুরু করে দিলেন তিন লাইনের গল্প—"বাঃ অনিলচন্দ্র যে চলেছ কোথায়, এক হাত হয়ে যাক এস এস। না না আজ আর তাস নয়। বিষ্ণু ঘোষের বাড়ির দাওয়ায় আজ যে পঞ্চায়েতের বৈঠক বসবে। দিব্যি ফুরফুরে বাতাস বইছে ; —এক চক্কর দিয়ে আসি চল।" এর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে হবে 'বাতাস' কথাটা। সেটা প্রথম দু লাইনে ভাগ হয়ে তৃতীয়তে একসঙ্গে আছে, এই হোলো খেলা। "শান্তিনিকেতনের কাছে একটা জায়গার নাম যার অর্থ—খুব ভাল গভর্ণমেণ্টও হয়, খুব খারাপও হয়, বল দেখি কি ?—সুরুল। সু rule বা Shoe rule !"

ফস্ করে মুখে মুখে এত মজার মজার গল্প বলে যেতেন—একটু সময় লাগত না। কোনোটা বা গ্রাম্য ভাষায় কথাবার্তা কোনোটার বা মেয়েলি ভাষা আর তার মধ্যে হাসির খোরাক ঠাসা হ'য়ে থাকত।

গত তিন চার দিন থেকে 'চিরকুমার সভা' পড়া শুরু হয়েছিল, প্রত্যেকটি গান গেয়ে পড়তেন। যে গানগুলোর সুর মনে নেই

সেগুলোও তখুনি সুর লাগিয়ে আনন্দের কৌতুকের ঝরনা বইয়ে দিতেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকতুম। অক্ষয়ের হাস্য পরিহাস জ্বল্ জ্বল ক'রে উঠত—

যারে মরণ দশায় ধরে
সে যে শতবার ক'রে মরে
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপায়ে পড়ে!

কিংবা—

ওগো হৃদয় বনের শিকারী—
মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারী···

আর দ্বারকেশ্বরেরাও কম নয়—তারাও যেন সাম্‌নে এসে দাঁড়াত—বলত, যদি জিজ্ঞাসা কর আমার wish কি!

যাহোক চিরকুমার সভা শেষ হবার পূর্বেই যাবার দিন এগিয়ে এল—গাড়ী আসবার কিছুক্ষণ আগেও পড়া চলছিল—কিন্তু শেষ হ'ল না। একটা চিহ্ন দিয়ে রেখে বল্লেন—"রেখে দাও, ফের পরের বারে এসে শেষ করব। ছোট গল্পগুলো তো প্রায় সবই পড়া হ'য়ে গেছে,—না 'দুই বোন' বাকি, সেটাকেও ছোট গল্প বলা চলে। মনে আছে সেটা?"

"তা আছে; কিন্তু ওই বইটা আমার ভালো লাগে না—কেমন যেন লাগে।"

"কেন? আদর্শবাদিনী! কি আদর্শে আঘাত লাগে তোমার? আচ্ছা আজ তো আর সময় নেই, এর পরের বার এসে ওই বই শুনিয়ে তোমায় কাঁদাব। এসো মাসী শুনে যাও,—কি নির্মম স্বভাব তোমার ভাগ্নীর, এই যাবার দিনে না-হোক মিথ্যে ক'রেও লোকে দুটো মিষ্টি কথা বলে, না ফস্ ক'রে বলে বসল—আপনার লেখা আমার ভালই লাগে না, ওর চেয়ে—বাবু, হাঁ তা লেখার মত লেখা বটে, কি সুশিক্ষা, কি উপদেশ, প'ড়ে প'ড়ে চরিত্রের কী উন্নতি—"

"এ সব আবার কখন বল্লুম ?"

"বলতে কতক্ষণ !"

গাড়ী এসে দাঁড়াল একটু সন্ধ্যে ক'রে। আমরা সবাই নামব, সবাই কলকাতায় চলেছে। গাড়ীতে উঠতে উঠতে বল্লেন—"ডাক্তার মাঠের মাঝখানে সেই আমার গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘর ক'রে রেখো কিন্তু,—ঘর হয়েছে খবর পেলেই এসে উপস্থিত হব।"

গভীর অন্ধকার বন-পথের মধ্য দিয়ে মোড় ঘুরে ঘুরে গাড়ী নামতে লাগল।

"এত রাত্রে এ পথে কিন্তু তোমাদের চলাচল করা উচিত নয়, এটা tempting providence."

শিলিগুড়ি ষ্টেশনে নেমে গাড়ীতে বিছানা-পত্তর বিছিয়ে ওঁকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। কত রকমের লোক যে তাঁর কাছে আসত, কত বিচিত্র রকম কথাবার্তা, কেউ যদি সে সব সংগ্রহ ক'রে রাখতেন তাহ'লে সেও এক অপূর্ব সাহিত্য হতো। যত রকম চিঠি তাঁর কাছে আসত, যদি তার একটা ভালো রকম সংগ্রহ এবং সেই সঙ্গে তিনি কি চোখে তাদের দেখতেন, কী ভাবে গ্রহণ করতেন— কেউ লিখে রাখতে পারতেন তাহ'লে তাঁর উদার অমৃতময় চরিত্রের আরো একটা দিক উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত। কিন্তু কে এত সংগ্রহ করে! মানুষের জীবন যে প্রবল কালের স্রোতে ভেসে চলেছে, বসে বসে তাকে ছেঁকে ছেঁকে তোলা কি সম্ভব? তা ছাড়া যখন সহজে পাওয়া যায় তখন পাওয়ার আনন্দটাই সবখানি জুড়ে থাকে,—মনে আসে না এম্‌নি সহজেই একদিন হারিয়ে যাবে। আজ যা এত প্রচুর তা সেদিন এত সুদূর এত দুর্লভ হবে।

গাড়ীতে চুপচাপ বসে আছেন, আমরা বাক্স পেঁটরা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, ঠেলাঠেলি ক'রে এক ভদ্রলোক হুস ক'রে ঢুকে পড়লেন —মনে হ'ল অসম্ভব তাঁর তাড়া। কবি একটু বিস্মিতভাবে ফিরে তাকালেন, চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন অর্থাৎ—তা বেশ তারপর? তখন

ভদ্রলোক আরো ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"দেখুন, ট্রেনের সময় হ'য়ে এলো, আমি খেয়ে আসি।"

উনিও খুব গম্ভীর ভাবে উত্তর করলেন, "নিশ্চয়, খাওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন, খেয়ে আসতে দেরি করা কিছু নয়।" ভদ্রলোক যেমন প্রবলবেগে ঢুকেছিলেন তেমনি ভাবেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কবি আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন—"ইনি নিশ্চয় ভেবে-ছিলেন খেয়ে আসা সম্বন্ধে আমার অনুমতির বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

ভোর বেলায় রানাঘাটে ওঁর কামরায় এলুম পাশের কামরা থেকে। স্টেশনে স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াচ্ছে, পাশের চলমান ট্রেনের লোকেরাও সব হঠাৎ তাঁকে দেখে বিস্মিত হ'য়ে ঝুঁকে পড়ছে,—বাংলাদেশের এই পরমপূজ্য পরম প্রিয় কবিকে কি আগ্রহ দৃষ্টি নিয়েই সবাই দেখছে।

ট্রেনে বসে তাঁর ছেলেবেলার গল্প করছিলেন—"জীবনে কত জায়গা ঘুরেছি, কত মানুষের বিচিত্র আনাগোনা, কত আনন্দ উপহার,—কিন্তু প্রথম বয়সের সেই যে তেতালার ছাদের জীবন বৌঠাকরুণের হাতের অমৃত,—সে যেমন মনে পড়ে এমন আর নয়। আর কিছুই যেন জীবনের উপর সে রকম দাগ কাটেনি—বিশেষ ক'রে যত দিন যাচ্ছে তত সেই দূরের দিনগুলো যেন আরো উজ্জল হ'য়ে উঠছে। কাছাকাছি সব কিছু পেরিয়ে মন চলে যায় সেই জীবনের কেন্দ্রে,—লিখতে বসলে সেইখানেই মনটা ঘোরা ফেরা করে। ছড়া ও ছবিতে আমার ছেলেবেলার কথা ছড়িয়ে আছে। আমাদের ভাইদের মধ্যে যেরকম সম্পর্ক ছিল আজকাল বোধ হয় এরকমটি হয় না,—বিশেষ ক'রে জ্যোতিদাদা, তিনি আমায় এমন প্রশ্রয় দিতেন যেন আমি তাঁরি সমবয়সী। মনে আছে তিনি

পিয়ানোয় সুর বাজিয়ে যেতেন আর আমি মুখে মুখে গান বানিয়ে যেতুম। সেই সব দিনের মধ্যে জীবন যেন বাঁধা পড়ে আছে। কতই তো এল গেল, কিন্তু তেমন ক'রে আর কিছু মনে পড়ে না। বৌঠাকরুণের পাখীর সখ ছিল, এক চীনদেশের শ্যামা জোগাড় করেছিলেন,—একটা লোক ছাতু ফড়িং খাইয়ে যেত তাকে। আমার খাঁচায় পাখী বন্ধ ক'রে রাখা ভালো লাগত না—তিনি আমার সে সব কথা উড়িয়ে দিতেন—'আর পাকামি করতে হবে না'।"

এ সব বর্ণনা পরে 'ছেলেবেলা'তে লিখেছিলেন এবং কিছু কিছু ছড়িয়ে আছে 'ছড়া ও ছবি'র এবং অন্যান্য নানা কবিতায়—

বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের পরে দাদা
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হোতো তাঁর সাধা
জুটেছি বৌ দিদির কাছে ইংরেজী পাঠ ছেড়ে
মুখখানিতে ঘের দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।

তাঁর জীবনে সেই কয়েকদিনের স্মৃতি এত বেশি উজ্জ্বল ছিল যে ভারি আশ্চর্য লাগত। কত দেশে কত মানুষের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন, কত বিচিত্র সুখ দুঃখের সংঘাতে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন অসংখ্য অভিজ্ঞতায় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তবু সেই তাঁর ছেলেবেলার জীবন, যে জীবন বাইশ তেইশ বছর বয়সের পূর্বেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে, সেই জীবনই এই শেষ বয়সেও প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে ছিল তাঁর মনে। তাঁর জ্যোতিদাদা ও বৌঠাকরুণের স্নেহচ্ছায়ায় তেতালার ছাদের দিনগুলি যেন তাঁর জীবনের একটা প্রধানতম কেন্দ্র। কতবার যে এসব গল্প তাঁর কাছে শুনেছি তার শেষ নেই। এবং তাঁর লেখাতেও নানা জায়গায় নানা ভাবে এ ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করব—"আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে, আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি করা একেবারে ছেড়ে দেবেন।

যদি স্নেহ করেন তো বাঁচি। তাহ'লে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন, আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম—তাঁকে হারানোর পর থেকে আমার দ্রুতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ ক'রে হয়রান হয়েছি।"……এই স্নেহ তাঁর জীবনে এত সত্য যে দেবর ও বৌদিদির সম্পর্কের মাধুর্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দৃঢ় ছিল। বেশ মনে পড়ে একদিন আমার স্বামীকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন, হঠাৎ বল্লেন, "তোমার বৌদিদি আছেন তো? বৌদিদি না থাকলে জীবনে একটা মস্ত জিনিষ বাদ পড়ে যায় কিন্তু।"

বিস্মিত মনে তাই ভাবি, এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও যে স্নেহের স্মৃতি এমন ওতপ্রোতভাবে তাঁর জীবনে জড়িয়েছিল, তাঁর কল্পনায় মাধুর্য বিস্তার করত, অসংখ্য কবিতায় কবিত্বের কেন্দ্র হোতো, সে না জানি কি প্রভাবমণ্ডিত ছিল! কিংবা কবির মন তার আপন আলোতেই সৃষ্টি করে জগৎ, বাইরে তার অবলম্বন উপলক্ষ মাত্র, তবুও একথা মনে না ক'রে পারা যায় না, এমন অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিভার মধ্যে এত গভীর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন—তিনি কম প্রভাবশালিনী নন। তাই আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় নিত্য উত্থিত হয় তাঁর প্রতি—'কবির অন্তরে তুমি কবি।'

শিয়ালদহে গাড়ী এসে দাঁড়াল—অন্যবার আগে খবর প্রকাশ হ'ত না ব'লে ষ্টেশনে এত ভিড় হত না। কিন্তু লোকারণ্য সে দিন—তাঁকে নামিয়ে ঠেলা-চেয়ারে বসান মাত্রই নানা শ্রেণীর জনতা ঘিরে ফেলে নিয়ে চলল—আমরা পিছনে দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম—মনের মধ্যে একটা বিস্মিত অনুভূতি—ইনি যে রবীন্দ্রনাথ—যে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্বের হৃদ্‌পদ্মের মধ্যে কোরকের মত প্রস্ফুটিত হয়েছেন, মানুষ যা হতে চেয়েছে যা হতে পারেনি, সেই মনুষ্যত্বের

পরম আদর্শ হ'য়ে বিশ্বজগতের মাঝখানে দুর্লভ যাঁর আবির্ভাব। তিনি সকলের, তাই তিনি কারও কেউ নন, অথচ ক্ষণে ক্ষণে তিনি কত আপনার। এই কিছুক্ষণ পূর্বে এমনি ঘরোয়া ভাবে তিনি পরম আত্মীয় ছিলেন, এখন জনারণ্যের মাঝখানে তাঁকে তো আর সে রকম মনে হল না—তিনি যেন কত দূরে চলে গেলেন একমুহূর্তে। তখন তাঁর চতুর্দিকের জনতার সঙ্গে একত্র হ'য়ে বিস্মিত মন দূরের থেকেই পাঠাল প্রণামে আত্মনিবেদন।

তোমারে হেরিয়াছিনু যে নয়নে
সে নহে কেবল মাত্র দেখার ইন্দ্রিয়
সেথানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়

চতুর্থ পর্ব

১৯৪০এর ২১শে এপ্রিল কবি চতুর্থবার মংপু পৌঁছলেন। ১লা বৈশাখ উৎসব শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর সুধাকান্তবাবু জানালেন, শীঘ্রই তাঁরা আসচেন। নির্দিষ্ট দিনে ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছি, মনে আশঙ্কা, মত বদলালো না কি। দূরে ট্রেনের বংশীধ্বনি শোনা গেল, যথারীতি চেয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম। দূর থেকে সুধাকান্তবাবু হাত নাড়ছেন,—ভয় ঢুকল, এসেছেন কি আসেন নি। একটু পরেই দেখি একটা ছোট্ট ঘরে চারিদিকে জিনিসপত্র ছড়িয়ে বসে আছেন। কতকগুলো কাপড়ের ব্যাগ ছড়ান, তার কোনোটাতে কাগজপত্র, কোনোটাতে স্নানের সরঞ্জাম, একটা ঝুড়িতে কতকগুলি বায়োকেমিক ওষুধের শিশি। ঢোকামাত্রই বল্লেন,—"তোমার ভাগ্য ভালো যে এখানে কোনো টেলিগ্রাফ অফিস নেই। আবার আমার মত বদলাবো বদলাবো করছিল, আসবার ক'দিন আগে ওখানে বৃষ্টি পড়ল, ভাবলুম থাকি চুপচাপ ক'রে পড়ে যেমন আছি।"

চৌকিতে ক'রে রেল লাইন পার হ'য়ে গাড়ীতে উঠলেন—সঙ্গে অমিয়বাবু এসেছেন। "দেখ, অমিয় তোমায় বেশি খরচ করাবে না তা নিশ্চয় বলছি—।" সঙ্গে লটবহর অনেক ছিল, আমরা একটু এগিয়ে অন্য গাড়ীগুলোর জন্য অপেক্ষা করছি, কতক্ষণে আসবে। একটু ব্যস্ত হবার উপক্রম করতেই এক ধমক—"এত তোমার উদ্বেগ কিসের? আমরা তো একটা জায়গায় আছি, হারিয়ে তো যাইনি, তবে এত ব্যস্ততা কিসের। সব সময় শান্ত হ'য়ে থাকবে, যা ঘটবার তা তো ঘটবেই।"

অনেকটা পথ নির্বিঘ্নে কাটিয়ে একটা প্রকাণ্ড ধ্বসের সামনে এসে গাড়ী গেল আট্‌কে। এমন জল কাদা যে পার হওয়া শক্ত।

সারি সারি অসংখ্য গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে। সে আবার এক বাঁকের মুখ, যতই একটা গাড়ী পার করবার চেষ্টা করা হচ্ছে ততই তার চাকা কিছু কাদা বিক্ষিপ্ত ক'রে ঘুরতে থাকে আর দেবে যায়। আমাদেরটা ছিল পিছনে, সামনের গাড়ীটা যখন বহু কষ্টে পার হ'ল তখন তার নাচানি দেখে আমি স্থির করলুম, ওঁর গাড়ী কখনই এভাবে নেওয়া চলবে না। আমি তো নেমে পড়লুম। সঙ্গে একটা ঠেলে চালাবার চাকাওয়ালা গাড়ী ছিল, পরামর্শ হ'তে লাগল ওইটেতে বসিয়ে সবাই মিলে কোনো রকমে পার করা হবে। কিন্তু তারও নানা অসুবিধা। তা ছাড়া সব চেয়ে অসুবিধা কারও সঙ্গে কারও মতের মিল ছিল না, এবং সবাই একসঙ্গে মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেছিলুম। ছুটোছুটি হৈ হৈ চলল ঘণ্টাখানেক। কবি গম্ভীর ভাবে গাড়ীতে বসে রইলেন, একবার প্রশ্ন পর্যন্ত করলেন না যে ব্যাপার কি, বা তোমরা কি ভাবছ, কি নিয়ে এত আলোচনা, বা শেষ পর্যন্ত কি স্থির করছ। উনি জানেন এটা যাদের ভাববার বিষয় তারা ভাবছে; এ নিয়ে অনাবশ্যক প্রশ্নোত্তর করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সেই একঘণ্টা এত গোলমাল চলেছে, অথচ উনি একটি কথাও কইলেন না, কোনো প্রশ্ন করলেন না, বা বিচলিতও হলেন না কতক্ষণে পৌঁছন যাবে তার স্থিরতা নেই ব'লে। এই সব সামান্য সামান্য ব্যাপার তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এবং মজ্জাগত আভিজাত্যের নির্দেশক ছিল। আমি ঠিক বোঝাতে পারলুম কি না জানি না কিন্তু এই রকম ছোট ছোট নানা সামান্য ঘটনাই একটি প্রবল অসামান্যতা প্রকাশ করত।

যাক্ শেষ পর্যন্ত অনেক মতামত প্রকাশ ক'রেও কোনো মতামতই টিকল না, গাড়ীই চালিয়ে পার করা হ'ল, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী কর্দমাক্ত পথের গহ্বর থেকে উঠে পড়ল। সুধাকান্তবাবু বল্লেন—"ও কিছু নয়, বোলপুরের রাস্তায় অমন ঝাঁকুনি ওঁর অনেক অভ্যাস আছে।"

যখন গাড়ীতে এসে উঠলুম দেখি একটু একটু হাসছেন,—“বাবাঃ আজ একটা কাণ্ড করলে বটে। কী ব্যস্ততা, একবার এদিক একবার ওদিক্! আমি বসে বসে দেখছি, ‘নাই কি বল এ ভুজ মৃণালে’?”

“বাঃ ব্যস্ত হব না, যা কাণ্ড।”

“কেন, কাণ্ড কি? আমি জানতুম কিছু হবে না, কিছু হতে পারে না। তুমি ভাবছিলে ওম্‌নি গাড়ীটা উল্টে যাবে, আর খাদে পড়ব? আমি তা একবারও ভাবিনি, ঠিক জানতুম কিছুই হবে না, নিশ্চয় পার হ’য়ে যাব, অপঘাত মৃত্যু আমার হবে না,—নৈলে কতবার কত কাণ্ড হয়েছে। এই তো ‘ঘড়ঘড়িয়ায়’ (বেলঘরিয়া) নাবার ঘরে যা পড়াটা পড়লুম। বুকে পিঠে কি লাগাটাই লাগল,—একটা কিছু তখন হ’য়ে যেতেও তো পারত? তা হল না। ওরা খুব কষে আয়োডেক্স লাগাল ঘষে ঘষে। ঠিক ছিল, সেদিন যাব সুরেনের ওখানে। সবাই বলতে লাগল আজ আর কিছুতেই চলবে না যাওয়া, কিন্তু সব কাজ শেষ ক’রেই এলুম, কি হয়েছে আমার? তোমরা যতটা ভঙ্গুর আমায় মনে কর এতটা নয়।”···

“ওগো আর্যে, একটা সমস্যার সমাধান কর দেখি। আমি একটা সাবান পেয়েছিলুম খুব ভালো, মনে মনে স্থির করেছি এইটেই এখন ব্যবহার করব, কিন্তু এরা ভেবে দেখলেন সেটা উচিত হবে না, তাই সেটা আনেন নি,—একে কি বলা যায়।”

কানু এবং বনমালী প্রবল আপত্তি জানাতে লাগল এবং অনুপস্থিত আলুবাবুর ওপর দোষ চালান ক’রে দিতে ব্যস্ত হ’য়ে পড়ল।

“নাঃ, আমি বারবার দেখে আসছি ওদের আর আমার এই মতদ্বৈধ চলেছে, এখন তো এ একটা কায়েমী ব্যাপার হ’য়ে পড়ল—অর্থাৎ আমি বলব আমার যেটি দরকার ওরা সেটিই আনবে

না, আর ওরা বলবে ওরা যেটি আনবে না সেইটিই আমি চাইব। এখন এ সমস্যার কি সমাধান করবে তা বল।"

"সমাধান এখুনি হবে, আপনাকে সেই সাবানের চাইতে ভাল সাবান দিচ্ছি।"

"দেবে? তাতে আমার রংএ উন্নতি হবে? তোমার এখানে এসে কত যে আশ্বাস পাচ্ছি! আমার অদৃষ্টে ওই তো হয়, হারাধন খুঁজে খুঁজেই আমার দিন গেল। সাবান না হয় তুমি দেবে, কিন্তু ওর মধ্যে অনেকগুলো বই ছিল যে। ডাক্তারের (পশুপতি ভট্টাচার্য) একখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি, সে বেচারা খবরের কাগজ থেকে কেটে কেটে বাঁধিয়ে দিয়েছে—তাকে কথা দিয়েছি এই ছুটিতে দেখব, হারিয়ে গেলে লজ্জায় পড়তে হবে আমাকেই, আমার রক্ষকরা তার ভাগ নিতে আসবে না। লোকে আমার উপর নির্ভর করে, তারা তো জানেনা কী অসহায় অবস্থা আমার। আমাদের বনমালীর বন্দোবস্ত চলছিল ভালো, আলু এসে কস্ করে একটা মোট ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়।" তখুনি বসে বসে একটা চিঠি লিখলেন আলুবাবুকে। "নাও এটা পাঠিয়ে দাও।" জানতুম আমি, একটু পরেই মত বদলাবে। প্রায়ই ঘটত। কারও ওপর রাগ করে চিঠি লিখলেন, কয়েক ঘণ্টা পরই মন একেবারে বদলে গেল, তখুনি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি। কত সামান্য লোকের কাছে কত সহজে উনি ক্ষমা চেয়ে বসতেন ভাবলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। যে সব চিঠি তাঁর প্রকাশিত হয়েছে তাতেও একথা অনেকে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। সন্ধ্যেবেলা বল্লেন, "চিঠিখানা চলে গেছে?"

"না আজ আর পাঠান হয়নি।"

"ভালো হয়েছে, মিথ্যে ওকে বকে কি হবে। ওতো আলু বৈ নয়। ভৎর্সনা যদি কাউকে করতেই হয় তবে সে নিজেকেই করা ভালো।"

একটা গদ্য ছন্দে কবিতা লেখা হয়েছে, সন্ধ্যেবেলা সেটা পড়া হোলো, তারপর আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা চলল। "তোমরা জাননা আমি 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটা প্রথম কি ভাবে লিখেছিলুম। অত্যন্ত realistic বর্ণনা ছিল। থাকলে তোমরা দেখতে যে তোমাদের আধুনিক কবিরাই এর প্রবর্তন করেন নি। সেখানে একজন সামান্য গরীব কেরানী, তার নগণ্য জীবন সাহেবের তাড়া খেয়ে কাটে, কিন্তু তার ঘরে যেখানে সে প্রেমিক, সেখানে সে আর সামান্য নয়, সেখানে সেই প্রধান। তাকে নিয়েই জগৎ। একছত্র সম্রাট সে সেই প্রেমের রাজ্যে। প্রথম দিকটায় সেই কেরানীর জীবনের কথা ছিল, এখন মনে হয় ভালই ছিল, কিন্তু লোকেন এমন ধিক্কার দিলে যে দিলুম সে সব ছেঁটে।" সেদিন সকালে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, বল্লেন, "এই ছিল আমাদের ছেলেবেলা।"

ভদ্র ঘরের ছেলে
ছাঁচে ঢালা পালিশ করা সংসার
অসমান নেই কোথাও কিছু
হঠাৎ চমক লাগেনা কোনো খানে।
দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর মতো
একটার পিছনে আর একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।
মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে
অন্দর মহল থেকে দুধ আসে এক বাটি,
আমার তখন দুধ বিতৃষ্ণার বয়েস
খেতেই হয় যে ক'রেই হোক্।
নিয়মনিষ্ঠ মাষ্টার আসে ঠিক সময়ে
সাতটা বাজতেই।
নিয়মভীতু আমি পড়ি ফার্ষ্ট বুক রীডার
কালো মলাটটা ঢিলে,
নিজের বুদ্ধি নিয়ে রোজই শুনি একই বিচার
মন্তব্যটা স্মরণীয় হয় চড়ে চাপড়ে।

পাশের বারান্দায় বুড়ো দর্জি চোখে চশমা
ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় সেলাই করচে এক মনে,
দেখি তাকে, ভাবি সুখে আছে নেয়ামৎ।
দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি
কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে
দুই কানে দুই ভাগে,
কাছে বসে কাঁকন পরা ছোকরা দারোয়ান
কুটছে দোক্তা,
উঠানে ঘোড়া দুটো সকালেই খেয়ে গেছে
বালতিতে বরাদ্দ দানা।
কাকগুলো ঠোক্‌রাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা
জনি কুকুরটা থামকা অনাবশ্যক কর্তব্যবুদ্ধিতে
সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া।
সূর্য উপরে উঠে যায়, আর্ধেক আঙিনায় পড়ে বাঁকা ছায়া
ন'টা বাজে।
বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে ময়লা গামছা
নিয়ে যায় স্নান করাতে।
সাড়ে নটা বাজতেই দৈনিক অন্নের পুনরাবৃত্তি,
খেতে হয়না রুচি।
নির্মম ঘণ্টা বাজে দশটায়।
মন উদাস করা হাঁক শোনা যায় দূরে
কাঁচা আমওয়ালার।
বাসনওয়ালা ঢং ঢং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে
দূরে থেকে দূরে।
বড়ো বউদিদি পাশের বাড়িতে
ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠে
পশমের গলাবন্ধ বুনচে মাথা নীচু ক'রে,
অদৃষ্টের পেয়েছে প্রশ্রয়।
ছাদের উপর কুসুম আর মনি
কড়ি নিয়ে খেলচে,
কোনো তাড়া নেই।

বুড়ো ঘোড়া আমাকে টেনে নিয়ে যায় গাড়ীতে,
আমার দৈনিক নির্বাসনে।
সমস্ত পথে দুর্ভাবনার অটল সহচর
মাষ্টার মশায়ের মঞ্চে সমাসীন ক্ষমাহীন মূর্তি।
ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।
বিরস দিনের মরচে পড়া আলো মিলিয়ে আসে
ইট কাঠের জটিল জঙ্গলে।
বিশ্রামহীন সহরের পাঁচমিশেলি ঝাপসা শব্দ
স্বপ্নের সুর লাগায়
তন্দ্রা শিথিল প্রকাণ্ড প্রাণে,
পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি
অনবচ্ছিন্ন শাসন বিধির তর্জনী শিখা,
পরদিনের পড়া চাই।
কঠিন গাঁঠ বেঁধে দেয় সন্ধ্যা
এ দিনের বেরঙা অভ্যাসের সঙ্গে ওদিনের,
পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি।
বিছানায় ঢোকবার আগে একটুখানি থাকে
পোড়া অবকাশ।
সেখানে শুনতে শুনতে শোনা শেষ হয় না
রাজপুত্র চলেছে তেপান্তর পার হ'তে।
একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে
শুকনো ডাঙায় প্লাবন নামল
বাড়িতে এলো নূতন বউ
কচি বয়সের লাবণ্যে ঢল ঢল।
কাঁচা শামলা রঙের হাতে সরু সোনার চুড়ি,
মলিন দিন-শ্রেণীর কালো ছাপলাগা পাঁচিল
দুফাঁক হয়ে গেল যাদুমন্ত্রে
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা।
ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়,

ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে
ওদিকে থাকে অভাবনীয়, এদিকে থাকে উপেক্ষিত।
রাত হ'য়ে আসে
স্বরূপ সর্দার হাঁক দিয়ে যায়।
ছেঁড়া সেলাই করা দড়িতে ঝোলান মশারি,
তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে
গোধূলি লগ্নের সিঁদুর রঙে
চেলির রাঙা অন্ধকারে।

পরদিন সকালবেলা গিয়ে দেখি কালো মলাটের নতুন খাতাখানা হাতে ক'রে, আবার সেই কবিতাটার উপর কলম চালাচ্ছেন। "দেখ আবার ওটা নিয়ে পড়েছি। গদ্য কবিতার বেলা ওই হয়, ওর একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ নেই ব'লে ওই বার বার ঠিক করতে হয়, কোন শব্দটা হচ্ছে কোনটা হচ্ছে না। এ যদি মিলের ছন্দ হ'ত তা'হলে কি একটা নিয়ে এমন তিন দিন ধরে পড়তুম? তার একটা ছাঁচ আছে, তার মধ্যে পড়লে হু হু ক'রে চলল, কিন্তু এ তা নয়। এ যে কি, কেন যে এটা ঠিক হচ্ছে আর ওটা হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে বলতে পারব না যদি জিজ্ঞাসা কর। অথচ ওরও একটা ছন্দ আছে।

'অন্দর মহল থেকে দুধ আসে একবাটি
আমার তখন দুধ বিতৃষ্ণার বয়স
খেতেই হয় যে ক'রে হোক—'

এই তিন লাইন বাদ দেওয়া যাক। কারণ মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে, তারপরই নিয়মনিষ্ঠ মাষ্টার আসে, এইটেই ভালো—ও তিনটে লাইন একটু খাপ ছাড়া। বড় বৌদিদির থেকে এইখানটাও বদলাতে হচ্ছে। অদৃষ্টের প্রশ্রয় পেয়েছে—কথাটার অর্থ বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারছি না। ঐ যে পশমের গলাবন্ধ বুনচে, ইস্কুলে যেতে হবে না, কোনো মাষ্টার আসবে না, কোন তাড়া নেই,—সেইটি

তুলনা করতুম নিজের অবস্থার সঙ্গে। যেতেই হবে সেই ইস্কুলে, সে যে কি দুঃখ! কতদিন সেই গাড়ীতেই ফিরে আসতুম, দরজাটা ভেজান থাকত, দারোয়ানকে বলতুম—স্কুল বন্ধ হ্যায়। সে আর প্রশ্ন করত না, মনে মনে বুঝতো ঠিক। অথচ দেখছি ছোড়দি বেশ বেণী দুলিয়ে যাচ্ছে আসছে, স্কুল যেতে হবে না, কোনো হাঙ্গামা নেই,—তখন মাঝে মাঝে মনে হোতো, কেন মেয়ে হ'য়ে জন্মালুম না! বাবা, কি কাণ্ডই হোতো তা'হলে, ভাগ্যিস বিধাতা শুনে ফেলেননি।"

"কেন মেয়ে হ'লে দোষ কি?"

"এই দুর্লভ পুরুষজন্ম পেয়ে আবার মেয়েজন্মের উপর লোভ। সেই সুপুরি কাটা, সারা জীবন ধরে! আচ্ছা তোমাদের এই স্কুলের দুঃখটা পেতে হয় না?"

"আজকাল তো ভালই লাগে, খেলার ব্যবস্থা রয়েছে, অত শাসন নেই, ছেলেমেয়েদের ভালো লাগবার একটা চেষ্টা হয়েছে। তবে ছেলেদের স্কুলের কথা জানিনে।"

"না ছেলেরাও বোধ হয় সে রকম নেই। আমাদের সেই স্কুলে গিয়েই সারি সারি দাঁড়িয়ে twinkle twinkle little star, ভোর বেলায় টুইন্ টুইন্ লিটিল ষ্টার ক'রে চিৎকার। বাবা—সকাল বেলা কোথায় little star তাও জানিনে, মানে কি তাও জানিনে, শুধু চেঁচাচ্ছি, এত stupid! তারপর ঠেলে দিল পণ্ডিতের ঘরে। পণ্ডিত মশায়কে দেখলে পকেট থেকে আস্তে আস্তে আমসত্ব বের করতুম, তাতে অনেকটা ঠাণ্ডা থাকতেন।"

"মার কাছ থেকে আনতেন বুঝি আমসত্ব?"

"হ্যাঃ, মার কাছে চাইলে দিতেন কিনা—বলতেন কী করবি, কাকে দিবি, তার চেয়ে চুরি ক'রে আনতুম। সত্য উপুড় হোতো, আমি তার পিঠে চড়ে আমসত্বর হাঁড়ি নামাতুম। পণ্ডিতমশায় ঐটি পেয়ে ঠাণ্ডা থাকতেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করতেন,—শুনেছি তোমাদের বাড়িতে নাকি খুব ভালো কেয়া খয়ের হয়? তারপর

কেয়া খয়ের সংগ্রহ ক'রে আনতুম তাঁর জন্য, সেও চুরি। যে ক'রে হোক কোনো রকমে ঠাণ্ডা রাখতে পারলে হয়।"

বনমালী সকালবেলার খাবার নিয়ে এল। অল্প একটু কফি নিয়ে বাকিটা দুধ ঢাললেন,—"দেখ এটা ছলনা, কফির ছল করে দুধ খাওয়া। অথচ যদি ওইটুকু কফি না দিই তাহ'লে আর দুধ সহ্য হবে না।" আর কিছুই খেলেন না। বনমালী বল্লে—"একটু খান ব্রাউন রুটি।"

"হ্যাঁ তাতো নিশ্চয়ই, একটু রুটি না খেলে চলবে কেন, চায়ের সঙ্গে একটু চাট।" আবার স্কুলের গল্প চলতে লাগল। সেই প্রত্যেক দিন ধরাবাঁধা নিয়মে স্কুলে যাওয়া এবং অত্যন্ত নীরস ভাবে পাঠ্য বই পড়বার কঠিন চেষ্টা, তাঁর কবি ভাবুক শিশুমনের উপর বোঝার মত চেপেছিল। সেই ধরাবাঁধা নিয়মের শৃঙ্খল তাঁর ভালো লাগে নি শুধু নয়, সাধারণ সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গও তাঁর প্রিয় ছিল না, তাদের রুচি শিক্ষা এবং ব্যবহার তাঁর মার্জিত মনের সঙ্গে মিলত না—বলতেন,—"অধিকাংশ ছেলেদের গল্প আলোচনায় এমন অশুচি একটা কুৎসিত ভাব ছিল, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতুম না, আমার যেন গা কেমন করত। বড় হ'য়ে একবার মাত্র কলেজ গিয়েছিলুম লেক্‌চার শুনতে। আগে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, গেলুম তো উৎসাহ নিয়ে। তখন আমার চুল বড় বড় ছিল আর গলাও মোলায়েম ছিল,—ঘরে ঢোকামাত্রই ছেলেরা বল্লে, 'এই যে, বাইজী যে'। তখুনি আমি বুঝলুম এ চলবে না, এ সঙ্গ আমার সহ্য হবে না। সেই চলে এলুম, আর কখনো যাই নি।...যাক্, তারপর যে কথা হচ্ছিল। আচ্ছা দেখ এই লাইনটা ছিল—কচি বয়সের লাবণ্যে ঢল ঢল, আমি কেটে করেছি কচি বয়সের চিকন দেহ।"

"কেন 'ঢল ঢল' তো বেশ ছিল—লাবণ্যে ঢল ঢল তো শুনতে বেশ লাগছে।"

"তাহ'লে তাই হোক, তবে চিকন কথাটা মনে হয়েছিল, দেখেছিলুম কিনা গলার শাম্‌লা রংএর ওপর হার চিক্‌ চিক্‌ করছে। তাকে চিকনই তো বলবে?"

"সেই বারো বছর বয়সে কি দেখেছিলেন হার চিক্‌চিক্‌ করা, আপনার মনে আছে?"

"হাঁ পরিষ্কার মনে আছে পাল্কী চড়ে নতুন বৌ এল, গলার অনাবৃত অংশটুকুর শাম্‌লা রংএর উপর সোনার হার ঝিক মিক করছে।"

"শাম্‌লা রং কাকে বলে? বাংলায় একরকম সংস্কৃততে এক-রকম, না?"

"বাংলায় শ্যামল রং হচ্ছে বাঙালী মেয়ের যা রং।"

"কিন্তু সংস্কৃতে—"

"না সংস্কৃততে ওর একটা স্থির মানে নেই, শ্যামা হ'ল তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাঙ্গী। তা তুমি এত খাওয়াচ্ছ, তোমায় তাহ'লে সংস্কৃত ক'রেই বলব। না হয় সত্যি নাই হোলো!"

বেলা দশটা বাজে, খাবার জন্য ডাকতে গেলুম। সেদিন সকাল সকাল স্নান সেরে বসে আছেন। "কি গো আজ আর খেতে দেবে না নাকি? ক্ষিদেয় যে পেট হু হু ক'রে জ্বলে গেল!" তারপর খেতে বসে কিছুই খেলেন না। সেই কালো মলাটের কবিতার খাতা হাতে ক'রেই রয়েছেন। পড়তে দিলেন, দেখি কবিতাটা আরো অনেক বদলেছে। বল্লেন,—"ওর মধ্যে দিনের সন্ধ্যের দিকটা বাদ পড়েছিল, জুড়ে দিলুম। এই গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও মেটেনি, তাই কিছুতেই মন ঠিক হয় না। বার বার লিখি আর বদলাই, উল্টে পাল্টে একটা কথা জুড়ে একটা বা ছেঁটে, ও একটা শিল্প।...আজকাল আমার এই ছড়াগুলোতে কিন্তু কম মিল ছড়াইনি; তুমি যে সন্দেহ করছ মিল আমার আসে না ব'লে আমি গদ্য ছন্দ লিখছি, তা নয়—সেইটে প্রমাণ

করবার জন্যই তো এত উঠে পড়ে মিল ছড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই তোমাকে convince করতে পারছি না।”—

বাসাখানি গায় লাগা আর্মানী গির্জার
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার
কাবুলি বেরাল নিয়ে দুদলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।

*　　　*　　　*　　　*

ইগাণে পড়েছে সাড়া গবেষণা বিভাগে—
এ কাবুলী বিড়ালের নাড়ীতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জার গুষ্টির হবে কিগো ঝিয়ারী
এর আদি মাতামহী সেকি ছিল মিশোরী
নইল্-তটিনীতট বিহারিণী কিশোরী

মিল একেবারে দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছি, আর একেবারে নিখুঁত মিল তা মানতে হবে। আর একটা মিল আছে, সেই যে কবিতাটা লাহোর থেকে লিখেছিলুম—”

“আধুনিকা?”

“হাঁ, ওটাতেও মিলের ঘুব ঘটা, আর ওটা ভালো কবিতা, তোমরা ওটা বেশি লক্ষ্য কর নি।”

“লক্ষ্য করব না কেন?—

আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না
তাহাদেরই কল্যাণে কাব্যানুশীলনা

*　　　*　　　*　　　*

আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে
কবি যশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার পেয়েছি ও শাস্তি
প্রমাণ গিয়েছি রেখে এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধরণীর”

"বাবাঃ, ঠিক বেছে বেছে জায়গাগুলো মুখস্থ ক'রে রেখেছ, নিজেদের স্তুতিবাদ। আর কি স্তবই করেছি!"

কিছুদিন থেকে 'চিত্রা'টা নিয়ে দেখছেন—চিত্রার ভূমিকা লিখবেন। চিত্রা পড়তে পড়তে তাঁর মনে পড়ে যেত, যখন লিখেছিলেন তখনকার experienceএর কথা। বেশ বুঝতে পারতুম উনি যেন হারানো দিনগুলো ফিরে পেতেন, সুদূর অনুভূতির স্মৃতি। ঘরের মধ্যে বসে শুনছি অমিয়বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে—অমিয়বাবু সদ্য-প্রকাশিত 'নবজাতক' সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। কবি বলছেন,—আপাতত একটা বইয়ের মধ্যে যে কবিতাগুলো টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন মনে হয়, তার মধ্যেও এমন একটা যোগ আছে, যদি দেখবার চেষ্টা করা যায় তাহ'লে দৃষ্টি পড়ে। এই সেদিন চিত্রা পড়তে পড়তে আমার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলি। ওই কবিতাগুলোকে যারা কল্পনা বা তত্ত্ব বলে মনে করে, সত্যি সেটা যে কি ভুল তা বলতে পারিনে। ওটা একটা experience। এমন একটা গভীর অনুভূতির থেকে ওগুলো এসেছিল, সেই কথা আবার মনে পড়ছিল দেখতে দেখতে সেদিন। কে যেন গড়ে তুলছে একটা সৃষ্টি আমাকে কেন্দ্র ক'রে। আমার হাসি খেলা আমার সব কিছুকে নিয়ে একটা সৃষ্টি চলেছে। সে যেন কোন যন্ত্রীর হাতের বীণা, তাকে অবলম্বন করে শিল্পী করে চলেছে সুর সৃষ্টি। নিজেকে দেখা 'আমি' বলে নয়—objective ভাবে দেখা। আমি গড়ে উঠেছি তার হাতে। সেই গড়া, সেই সৃষ্টি, শিল্পীর শিল্প। তাই থেকে থেকে প্রশ্ন করেছি—ভাল কি লেগেছে? আমাকে অবলম্বন করে যা গড়তে চেয়েছ তা কি হয়েছে? যে সুর বাজাতে চেয়েছ আমার মধ্যে তা কি বেজেছে? এই আমার জীবনদেবতাকে প্রশ্ন—তোমার সৃষ্টিতে তুমি খুশি হতে পেরেছ তো? মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম? এটা সত্যি একটা কবিত্বের কথা

মাত্র নয়, খুব গভীর ক'রে মনে করা—লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ? কিন্তু সে experience-এর কথা কি করে বোঝাব! যেমন মনে পড়ে বলাকার কথা—সেই এলাহাবাদে ছাদের উপর বসে আছি, বসেই আছি—দীর্ঘ সময় রাত্রি বয়ে চলেছে, তারাগুলো আকাশের এপার থেকে ওপারে চলে গেল; আমি বসে বসে যেন অনুভব করলুম কালের স্রোত, যে কাল বয়ে চলেছে তার প্রবল বেগ, সে আমি বোঝাতে পারিনি, সেই অনুভূতি বোঝানো যায় না। কত রকম চেষ্টা তো করলুম নদীর সঙ্গে স্রোতের সঙ্গে তুলনা ক'রে —বয়ে চলেছে কাল প্রবাহের মত, তার মধ্যে বস্তুগুলো যেন জলের ফেনার মত পুঞ্জ পুঞ্জ হ'য়ে উঠছে, কিন্তু বলতে কি পেরেছি? সেদিন রাত্রে যেমন করে অনুভব করেছিলুম তা বলা হয়নি। ও কবিতা যারা বিশ্লেষণ ক'রে পড়বে, তারা পাবে ওর মধ্যে ছন্দ উপমা মিল তত্ত্ব কত কি, কিন্তু তাই দিয়ে ওকে বোঝা যায় না। আরও একটা কিছু যোগ করতে হবে! সে যে পড়বে তার নিজের অন্তর থেকেই। তার মনের মধ্যে যদি সেই রকম স্থান থাকে যেখানে এর অনুভূতিটা বাজে,—তা না হ'লে ও হবে না। কবিতা দেখবার একটা সত্যকারের দৃষ্টি থাকা চাই, নইলে ওর true perspective পাবে না। জানো অমিয়, মাটি ক'রে দেয় এই অধ্যাপকের দল, কতকগুলো বাঁধা নিয়মের মধ্যে চিন্তাগুলো যাদের বাঁধা, তারা সব কিছুকেই সেই ছাঁচে ফেলে দেখতে চায়। আমি বরং দেখেছি এরা, যারা unsophisticated, পরিষ্কার বলে ভাল লাগছে কিন্তু জানিনে কেন লাগছে, হয়তো মানে বুঝিনে, শুধু এইটুকু বুঝি যে আনন্দ পাই,—তারাই অনেক বেশি বোঝে। মনের ঠিক জায়গাতে লেগেছে, নাই বা বুঝলুম কি ক'রে লাগল কেন লাগল বিকলন ক'রে ক'রে······

·····এই দেখ, সাহিত্যালোচনা চলছে, উনি নিয়ে এলেন কফি। আজ বলেছিলুম কফির সঙ্গে দুধ খাব বেশি ক'রে, তা কতটুকু দুধ এনেছে দেখ। তা বনমালী খুব তোমার পয়সা বাঁচাচ্ছে।"

বনমালী ছুটল। একটু বাদে ফিরে এল দুধ নিয়ে। বল্লে, "একটু বিস্কুট খান।"

"কেন, আমি যদি একটু বেশি দুধ খাই, তাতে তোমার ক্ষতি কি ?"

"না দুধও খান বিস্কুটও খান, শুধু দুধ খাবেন এটা তো আমার ভালো মনে হচ্ছে না।"

"ওঃ তোমার ভাল মনে হচ্ছে না। আমার তো এইটেই ভাল মনে হচ্ছে।"

"আজ আমায় পাগলামিতে পেয়েছে ; যা রোদ উঠেছে, কবির মাথায় মিলগুলোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে মিলের স্কন্ধে চেপে।" সেদিন একটা প্রকাণ্ড ছড়া লিখেছিলেন—কদ্‌মাগঞ্জ উজাড় করে আসছিল মাল মালদহে, চড়ায় প'ড়ে নৌকোডুবি হোলো যখন কালদহে, তলিয়ে গেল অগাধ জলে বস্তা বস্তা কদ্‌মা যে, পাঁচ মোহনার কৎলু ঘাটে ব্রহ্মপুত্র নদ মাঝে ইত্যাদি।

"আজ সেই মাছের বৃত্তান্ত লিখতে লিখতে নানা রকম মাছের আস্বাদ মনে পড়েছে। 'সামন' মাছের কচুরি বানাও না, সে রীতিমত ভালো হয়। আমি যখন মেজদার ওখানে ছিলুম তখন বৌঠাকরুণকে দিয়ে নানা রকম experiment করিয়েছি। তাছাড়া রথীর মার কাছে তো একটা বড় খাতা ছিল আমার রান্নার, সে কোথায় গেছে কে জানে। টিনের মাছের কচুরি আর জ্যামের প্যারাকী, সে সব মন্দ খাদ্য নয়। তোমার অতিথিদের যদি একবার এ সবের স্বাদ দেখাও তাহ'লে আর তারা নড়তে চাইবে না। যাকগে এ সব কথা ব'লে তোমাকে আর চঞ্চল করে দেব না। তার চেয়ে তুমি চুপ ক'রে বোসো, গোলমাল করোনা,—হাঁ তোমার ছবি আঁকব ; তবে সে ছবি দেখলে কেউ সন্দেহও করবে না যে তোমার। সে হয়তো ঠিক দেখবে সুধাকান্তর মতো।"

ছবি আঁকা চলছে। গৃহস্বামী এলেন। "দেখ ডাক্তার, তোমার গৃহিণী এমন কৃপণ। কলম চাইলুম ছবি আঁকব ব'লে, জানেন তাতে কলম খারাপ হ'য়ে যায়, তাই চট্ ক'রে নিজেরটা সরিয়ে আমারটা দিলেন,—যাক্ শত্রু পরে পরে।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি নিজের কলম এগিয়ে দিলেন।

"কৃপণতা মোটেই নয়, আমার সরু নিবে আপনার ছবি আঁকা চলত না।" নতুন কলমটা নিয়েও অসুবিধা হচ্ছিল,—আমি বল্লুম—"আপনি বাঁকা করে ধরেছেন, সোজা ক'রে ধরুন তা'হলে মোটা হবে,"—ব'লে হাতের মধ্যে কলমটা ঘুরিয়ে দিলুম। উনি ভীষণ মজার মুখ ক'রে আমাদের দিকে চাইলেন, বল্লেন—"বাবা, আজ পঁচাত্তর বছর কলম ধরছি, আমায় কলম ধরতে শেখাবে এখনও? আর কি আমার উন্নতির কিছু আশা আছে? এ জন্মের মত কি হয়ে যায় নি?" তারপর সবাই মিলে উচ্চৈঃস্বরে হাসি। আমি বল্লুম, "সত্যি যখন কলমটা ঘুরিয়ে দিলুম তখন কিছুই মনে করিনি এর কতটা significance। এটা এসোসিয়েটেড্ প্রেসে দেবার মত ঘটনা।" উনি খুব হাসতে লাগলেন—"হাঁ খুব জোর গলায় বল—শৃণ্বন্তু বিশ্বে আমার এই কার্য, রবীন্দ্রনাথকে আমি কলম ধরতে শেখাচ্ছি।"

সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঢুকে দেখি মাসীর সঙ্গে কথা হচ্ছে। ওঁর হাতে এক গুচ্ছ অর্কিড, হলদে রংএর। উনি বলছেন—ফুলটি কেমন? মাসী বললে, "আশ্চর্য সুন্দর।"

"সত্যিই তাই, আশ্চর্য সুন্দর, সৃষ্টিকর্তা একে আপন আনন্দে সৃষ্টি ক'রে খুশি হয়েছেন। মানুষের মধ্যেও আছে এই সুন্দরকে সৃষ্টি করবার প্রবল ইচ্ছা, তাই পাথর কেটে দিনের পর দিন কি উৎসাহে, কি অক্লান্ত পরিশ্রমে সব সৃষ্টি করেছে—কেমন ক'রে কেউ জানে না, আর কেনই বা? কেন এই অক্লান্ত পরিশ্রম, এই প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টির, সৌন্দর্য সৃষ্টির? দেখেছ কনারকের

মন্দির? সে কি অদ্ভুত ব্যাপার। বিনা যন্ত্রে, না জানি কি অক্লান্ত পরিশ্রমে সে শিল্প গড়ে উঠেছিল! বিধাতাও অনেক যত্নে অনেক ধৈর্যে সুন্দর ক'রে তুলছেন আপন সৃষ্টিকে। এই সুন্দরকে সৃষ্টি করবার জন্য যুগযুগান্তরের তপস্যা আছে। যখন আদিযুগের অতিকায় প্রাণীগুলোর কথা ভাবি, কি কুৎসিত জীবগুলো! প্রথম জীব সৃষ্টির আগের পৃথিবীতেই বা কি খাটুনি কি পিটুনি, পাহাড়ে সমুদ্রে মাটিতে আগুনে—সে এক কাণ্ড! তারপর সব জীবেরা আসতে লাগল একে একে, একে একে তারা বাদ যেতে লাগল,—না না, এ হয় নি, এও নয়। প্রকৃতিই বল আর বিধাতাই বল, সে যেন strive করেছে, চেষ্টা করেছে, একটা কিছু গড়তে,—পছন্দ হল না, মুছে দিল আপন হাতে,—অবিরত ভেঙে গ'ড়ে তাই সে চেষ্টা ক'রেই চলেছে! এমনি ক'রে যুগের পর যুগ ধরে চলেছে সাধনা, এই গুচ্ছটিকে ফোটাবার জন্য।"

আমি বল্লুম—"আপনি পূরবীতে লিখেছেন,—আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হ'ল উচ্চ, লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ!"

একদিন আবার তর্ক উঠল গদ্যকবিতা নিয়ে।

"আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, অনেক কথা আছে যা কখনই মিলের কবিতায় লেখা চলে না। যা একমাত্র গদ্যছন্দেই প্রকাশিত হ'তে পারে।"

"গদ্যে লিখলেই হয়!"

"না তাও নয়, গদ্যেও নয়, মিলেও নয়, একমাত্র গদ্য-কবিতাতেই যথার্থ সুন্দর ভাবে প্রকাশ হ'তে পারে এমন কথাও আছে।"

"যখন গদ্য-কবিতা লেখা হ'ত না তখন সেগুলোর কি অবস্থা হোতো?"

"তখন সেগুলো লেখাই হ'ত না। যেমন ধর না ভাষা, আজকাল কত পরিবর্তন তার হয়েছে। এই কিছুদিন আগেও কত

কথা—, যা লোকে এখন সহজে অনায়াসে বলে, তা বলতে পারত না। এখন তোমরা যে ভাষায় কথা কও কন্তে, যে ভাষা তোমাদের জন্যে তৈরি করেছি, আমাদের যুগে এ ভাষায় মহাপণ্ডিতরাও কথা কইতেন না। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, ক্রমে গড়ে উঠছে। যখন ভাষা ছিল না, মানুষের ভাবনাও কম ছিল। তেমনি যখন গদ্যছন্দ ছিল না, তখন গদ্যছন্দে আজ যা লেখা হচ্ছে তা লেখা হ'তে পারত না। যেমন ধর সেদিনকার কবিতাটায়—দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে, কাছে বসে ছোকরা দারোয়ান কুটচে দোক্তা, উঠানে ঘোড়া দুটো সকাল বেলাই খেয়ে গেছে বালতীতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা,—এই যে ছবিটা, এ কখনও মিলের কবিতায় দেওয়া চলত না। এই সমস্ত ছবিটা বাদ দিয়ে এতটুকু ভাবরস ছেঁকে তুলতে হোতো তাতে বাদ পড়ত অনেক। ওই যে নেয়ামৎ ঝুঁকে পড়ে সেলাই করছে আর চন্দ্রভান দাড়ি আঁচড়াচ্ছে, এই দৈনন্দিন পটভূমির উপরই বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। নিয়ে এস 'পুনশ্চ', তোমায় কিনু গোয়ালার গলিটা শোনাই।" পড়লেন কবিতাটা।

কিনু গোয়ালার গলি
লোহার গরাদে দেওয়া একতলা ঘব
পথের ধারেই—ইত্যাদি

"সেই লোনাধরা স্যাঁতাপড়া দেওয়ালের মাঝখানে কাঁঠালের ভুতি আমের খোসা ছড়ানো ডাষ্টবিনের পাশে পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানীর জীবনযাত্রা চলেছে। সেই জীবনের মধ্যেই স্বপ্ন জাগে, পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর প'রে যে অপেক্ষা ক'রে আছে,—কিনু গোয়ালার গলির সীমানায় তার আবির্ভাব আর অন্য কোনো ছন্দেই চলত না, গদ্যছন্দ ছাড়া, লিখলে সে একেবারে অন্য জিনিষ হোতো, এ জিনিষ নয়।"

"তবে একে কবিতা বলার দরকার কি ?"

"কিছুই নয়, নামে কি এসে যায় ? আমি যে নাটকগুলি লিখেছি সেগুলো কোনো পুরুষে নাটক নয়। তবু লোকে নাটক বলে। আর প্রবন্ধ লেখে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য ব'লে। নামে কি এসে যায় ? কবিতার মতো লাইন না বেঁধে গদ্যের মতোও লেখা যেতে পারে, তবে পড়বার সুবিধের জন্য ফাঁক দেওয়া চাই, গদ্য-কবিতা পড়া শক্ত।"

সেদিন 'পত্রপুট' থেকে অনেকগুলো কবিতা পড়লেন।

"আপনি একবার 'পৃথিবী' কবিতাটা পড়বেন ? সেই যে, 'আমার শেষ প্রণতি গ্রহণ কর পৃথিবী'।"

"ও কবিতাটা তোমার ভাল লাগে ? আচ্ছা তুমি পড় তাহ'লে।"

"না না, সে হবে না।"

"কেন, পড়বে তার আবার লজ্জা কি ? আচ্ছা এসো শিখিয়ে দিই, কেমন ক'রে গদ্য কবিতা পড়ে।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা মংপুর প্রায় সবাই এসেছেন। অন্য ঘরে যথারীতি কিছুক্ষণ আড্ডা ও সুধাকান্ত বাবুর অভিনয়াদির পর, ওঁর কাছে সবাই এলেন।

"কিহে তোমাদের কলধ্বনি তো অনেকক্ষণ শুনছি, সুধাসমুদ্র বুঝি জমিয়ে তুলেছেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ, অভিনয় করছিলেন।"

"অভিনয়। কিসের অভিনয় ?"

সুধাকান্তবাবু এগিয়ে এলেন, আবার সমস্ত পুনরভিনয় চলল। উনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

"আপনি আজকাল কেমন আছেন ?"

"বোধ হয় ভালই আছি, জ্বরটা বন্ধ হয়েছে এখানে এসেই। তবে তেমন উৎসাহ পাচ্ছিনে এখনও।"

"আমরা আর বসব ?"

"বোসো, বোসো, কি হবে তাতে ? আমার ভালই লাগে পাঁচজন এলে। জীবনে কতরকম লোকই দেখেছি, এখন তো তবু অনেক দূরে চলে গেছি। অনেকগুলো বেড়া পেরিয়ে তবে সবাই আসেন"—ব'লে সুধাকান্তবাবুকে দেখালেন।

"আমাদের সময় তো এসব ছিল না, সবাই আসতো, অবারিত দ্বার। কেউ হয়তো এসে র'য়েই গেল কিছুদিন। দাদা কি মামা হ'য়ে উঠল। মনে আছে একদিন বসে আছি দোতলার ঘরের মাটিতে, তখন 'সাধনা'র সম্পাদক আমি, একটা লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত, ডেস্কের ওপর উপুড় হ'য়ে রয়েছি, হঠাৎ একজন ঢুকল। ঢুকেই কোনো দিকে দৃকপাত না ক'রে বড় চৌকিটাতে বসে খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। আমি আর কি করব, নেহাৎ ভালমানুষ ছিলুম, চুপচাপ কাজ ক'রে যেতে লাগলুম। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক কাগজখানা রেখে ঘড়ি দেখলে, তারপর বল্লে,—'দেখুন আমার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনার সঙ্গ যেমন interesting তেমনি entertaining।' আমি চুপ ক'রেই রইলুম, একটিও কথা না ব'লে আমার সঙ্গ কি ক'রে তার এত entertaining বোধ হ'ল বোধহয় সেই কথাই চিন্তা করতে লাগলুম। কিছু পরে সে বল্লে—'arica-nut আছে, arica-nut ?' আমাকে বাংলা ক'রে জিজ্ঞাসা করতে হ'ল—'সুপুরি ? তা থাকতে পারে, আনিয়ে দিচ্ছি।'

'দেখুন আমার স্ত্রীকে আমি আপনাদের কাছে এখানে রাখতে চাই, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না, অথচ আপনাদের সঙ্গ তার বিশেষ দরকার।'

এতক্ষণে বলতেই হোলো—'পীড়াপীড়ির আবশ্যকতা কি ? জোর ক'রে আনাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।' সে কি তা শোনে, বলে—'না না, তাঁর এখানে আসার বিশেষ প্রয়োজন আছে।' কিছুক্ষণ পরে arica-nut তো চলে গেল, কিন্তু অনেক দিন

পর্যন্ত তার স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে হবে এই আশঙ্কাটা উদ্বিগ্ন করে তুলত।"

এই কথায় মনে পড়ে গেল, কিছুদিন পর ১৯৪১-এর চৈত্র মাসে শান্তিনিকেতনে এই গল্পটা আবার আমাদের কাছে করেছিলেন। যেদিন সকালে গল্পটা করেন সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা আমি আর মাসী তাঁর পায়ের কাছে বসে আছি, নববর্ষের আগের দিন সন্ধ্যা, তাই সবাই গিয়েছেন মন্দিরে। অন্ধকার চাতাল। হঠাৎ একজন রোগা লম্বামত লোক অন্ধকারে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াল। উনি ইসারায় জিজ্ঞাসা করলেন—কে? ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তরে, আমায় ইংরেজিতে বল্লেন, তিনি এখানে কিছুক্ষণ বসবেন। গুরুদেব খুব আস্তে আস্তে বললেন—"ওঁকে বল, কাল সকালে যখন সবাই আসবেন তখন এলেই ভাল হয় না? এখন এত ক্লান্ত আছি, তাছাড়া এই অন্ধকারে একটু বিশ্রামের সময়ে—।" ভদ্রলোককে সে কথার অনুবাদ ক'রে দিতেও তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপব চেয়ার টেনে নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলেন। আমবাও চুপ, তিনিও। সে এক অস্বস্তিকব নীরবতা। একে অসুস্থ মানুষ, কখন কি দরকার হয়,—এবং যাই দরকার হোক কখনই একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের সামনে কিছুই বলবেন না তাও জানি। যতই অসুবিধা হোক না কেন, চুপ ক'বে থাকবেন। সেই লোকটি আমায় আস্তে আস্তে নানা রকম অনুরোধের বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন—আলো জ্বালুন, অটোগ্রাফ দিন, কথা বলতে বলুন, ইত্যাদি। অবশেষে এক সময়ে উঠে চলে গেলেন। লোকটি নেমে যেতেই ক্লান্ত হাতখানি তুলে বল্লেন—"এ যে সুপুরিরও বাড়া হোলো!"

মংপুতে সেদিন আরো একটা গল্প বলেন।—"Arica-nut-এর স্ত্রী সম্বন্ধে আমার ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। একবার খুব ভুগেছিলুম কিনা। একটি বিধবা স্ত্রীলোককে রেখেছিলুম রথীর মাকে সাহায্য করবার জন্য, আমরা তখন বোটে থাকতুম, আমাদের

সঙ্গে ব—ও ছিল। আমার ওখানে তো সর্বদাই লোকজন যাতায়াত করছে, তখন সে মেয়েকে নিয়ে এক উৎপাত। তার সর্বদাই ভয় পুরুষের। ওই কে এল, ওই বুঝি একজন পুরুষের ছায়া দেখা গেল—সে এক বিপদ। আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লুম, দেখ, জগৎ থেকে পুরুষ জাতটাকে লুপ্ত ক'রে দেবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই, তোমাদের মতো তাদেরও এই পৃথিবীতেই থাকবার একটা ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, আমি আর তার কি করতে পারি! তবে তার কাছে একটিমাত্র পুরুষ exception ছিল, সে হ'ল ব—, কিন্তু ব—তাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। এদিকে রথীর মাকে সাহায্য করবার কথা, কিন্তু সে কোন কাজই করবে না। বল্লে বলত, আমি তো এখানে কাজ করতে আসি নি, এসেছি নিজের উন্নতি করতে। আর আমরাও এমন ভাল মানুষ ছিলুম, কি ক'রে একে ঘাড় থেকে নামাব ভেবে পেতুম না। তারপর যখন জোড়াসাঁকোয় এলুম, ব—ওরা বল্লে এইবার তাড়াব! তার ছিল আবার দারুণ ভূতের ভয়। তেতালার ঘরে থাকত, রাত্রে ওরা নানা রকম শব্দ করত, মুখোস প'রে দাঁড়িয়ে থাকত। হাঁউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে সে মেয়ে এক কাণ্ড করত। বলে এ ভূতের বাড়ি। আমরা বল্লুম, সেজন্য তো পৈতৃক ভিটে ছাড়তে পারিনে। তারপর সে বিদেয় হোলো।"

"আশ্চর্য তো! কেন, তাকে সোজা যেতে বল্লেই তো হোতো?"

"ঐ তো বল্লুম আমরা প্রচণ্ড ভালমানুষ ছিলুম!"

কী কথায় সেইদিনই মেয়েদের পোষাকের কথা উঠল। "বাংলা দেশের মেয়েদের শাড়ি সর্বদাই সাদা। সাদাটাই প্রধান রং। মাঝে মাঝে যে এঁরা ঝকমকে রং লাগান না তা নয়, সে একটা শৌখিন বাহার। কিন্তু যে রংটা দেশের রং, সে সাদা। অথচ কাথিওয়াড়ে রাজপুতনার ওদিকটায় যখন ঘুরেছি, আশ্চর্য হ'য়ে দেখতুম, সাদা কাপড় চোখেই পড়ত না। সব কড়া রং, সবুজ, লাল, হল্‌দে, যত রকম রং সম্ভব। কিন্তু সাদা কখনো পরতে

দেখিনি। ওদের মরুভূমির দেশ কিনা, প্রকৃতিতে রং নেই, চোখ তাই রংএর জন্য তৃষিত হ'য়ে থাকে,—রঙীন ঘাগরা, রঙীন ওড়না, আর মাথার উপর সারি সারি কলসীতে জল। তাই ভাবতুম, যেমন কণ্ঠের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য জল নিয়ে আসে তেমনি চোখের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য বইয়ে দিয়েছে রংএর ঝরনা। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রকৃতিই যে রঙীন, তার ঘন শ্যামলের মাঝখানে সাদা রংএ কালো পাড়টি যেমন মানায় এমন আর কিছু নয়। একথা ঠিক, তোমরা এখন যে পোষাক পর এ আমাদের সময়ের চাইতে ঢের ভালো। তখনকার আধুনিকারা যে পোষাক পরতেন সে এক জবড়জঙ্গ ব্যাপার,—এখানে একটা টুক্‌রো ঝুলছে, ওখানে একটু ফ্রিল, গাদা গাদা লেস্, সে এক কিম্ভূতকিমাকার পোষাক। সমস্ত চেহারাটাই অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠত। তাই নিয়ে কি দুঃখই পেয়েছি। বৌঠানদের বলতুম। তাঁরা গ্রাহ্যমাত্র করতেন না।—'জ্যাঠামি করতে হবে না, তোমার এ সব কথায় দরকার কি ?' আমি বলতুম, 'দরকার তো আমাদেরই, তোমাদের তো তোমরা দেখ না, আমরা দেখি।' কিন্তু সে সব ঝগড়াতে কিছুমাত্র লাভ হোতো না, নতুন ফ্যাশান ব'লে প্রায়ই একটা লোক অদ্ভুত অদ্ভুত সব পোষাক আনত, আর হৈ হৈ পড়ে যেত। লোকটাকে দেখলে রাগ হোতো। তখন আবার কেউ কেউ শাড়ির সঙ্গে টুপি পরতেন, পিছন দিকে একটা লম্বা কাপড় ঝুলত, যা দেখতে হোতো সে বলার নয়। এই তো হোলো আধুনিকাদের পোষাক, আর যাঁরা পুরাতনপন্থী তাঁদের তো পোষাকেরই বালাই ছিল না। কোনো জামা নেই, একটিমাত্র ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরী শাড়ি,—লজ্জা বোধ হ'ত যখন দেখতুম ট্রেনে আর সব দেশের মেয়েরা বসেছে ভদ্র সুশ্রী পোষাকে, সকলেরই গায়ে মোটা জামা কাপড়,—আর যতদূর সম্ভব অসংযত আর বেআব্রু পোষাক এই বাঙালী মেয়ের। যাক্ এখন এদিকে অনেক উন্নতি হয়েছে, এখন তোমরা যে পোষাক পর সে তখনকার তুলনায় স্বর্গ। মনে আছে

ওইরকম জবড়জঙ্গ পোষাক দেখে দেখে চোখ যখন হাঁপিয়ে উঠেছে তখন একদিন শিয়ালদা স্টেশনে দেখি সাদা রংএর কালাপেড়ে শাড়ি প'রে একটি মেয়ে চলেছে। মুখের চারিদিকে কালো পাড়ে ফ্রেম ক'রে আছে, সাদা ক'রে পরা শাড়ি, দেখেই মনে হ'ল এ কত ভালো, কত ভালো, কিন্তু বোঝাবো কাকে? তখন আমি যে ছেলেমানুষ। বল্লেই বলবেন—জ্যাঠামি কোরো না।"

"তোমার কর্তৃপক্ষকে ডাকো, রেডিওটা চালান, একটু শোনা যাক ক'টা জাহাজ ডুবল। যে লোকটা বাংলায় বলে, বলে কিন্তু বেশ। বেশ ভালো অনুবাদ, ও কি তখুনি তখুনি অনুবাদ করে?… আহা তুমি আবার ওসব ধরতে যাও কেন, শেষটায় আলুর মত করবে, ও যার কাজ তাকে ডাকো। ··এসো অমিয়, পশ্চিম যে যেতে বসল, এ কি নৃশংস হানাহানি cannibalism একেবারে। মনে পড়ে সেই সব দেশ,—সেই সব হাসি হাসি মুখ,—এই তো তোমার শ্বশুরবাড়ি Denmark গেল, কী সুন্দর দেশ। আর মনে পড়ে সেই তাদের torch light procession, সারারাত্রি ধ'রে কি উৎসবই করেছিল। অথচ আমি তাদের কে, কতটুকু বা তারা আমার পরিচয় পেয়েছে, কিইবা তাদের আমি দিয়েছি। এতটুকু এতটুকু অনুবাদ হয়েছে আমার বইএর, তাই দিয়েই তো আমার পরিচয় পেয়েছে? সে কতটুকু? অথচ কী অজস্র অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমায় উপহার দিয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি কি করে এ সম্ভব হোলো। মনে আছে বেভেরিয়াতে একটা খাবার জায়গায় আমি ঢুকতেই সব উঠে দাঁড়াল। আমার ভারি আশ্চর্য বোধ হোলো,—আমি বিদেশী, তাদের কেইবা? কিছুতেই ভেবে পেতুম না তারা কি দেখতো আমার মধ্যে।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, এইবারই কালিম্পংএ একদিন সন্ধ্যে-বেলা তাঁর কাছে বসে আছি,—তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলেছে, প্যারিসের সেদিন পতন হয়েছে। কিছুদিন থেকে রোজই সবাই

মিলে রেডিওর সংবাদ শোনা হচ্ছে, খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে, আর চলেছে উত্তেজিত আলোচনা। বিশেষ ক'রে 'মাদ্‌মোসেল বসনেক' ব'লে একটি ফরাসী ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ফ্রান্সের খবর তাই খুঁটিয়ে শোনা হ'ত। সেদিন গুরুদেবের শরীরটা ক্লান্ত ছিল, চুপচাপ বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ দরজার কাছে উত্তেজিত অথচ মৃদু করুণ কণ্ঠস্বরে 'গুরুদেব' বলে মাদ্‌মোসেল ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন—"গুরুদেব আজ ওরা প্যারিসে 'ডাকঘর' অভিনয় করছে, এখন।" উনি উঠে বসলেন। বেশ বুঝলুম মনের ভিতরে একটা নাড়া লাগল। "আজ? আজ ওরা 'ডাকঘর' অভিনয় করছে?" একটু স্তব্ধ হ'য়ে থেকে আবার যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে পড়লেন, শুধু উত্তেজিত ভাবে পা নড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে বল্লেন,—"সেবারও রাশিয়াতে ওদের দারুণ দুঃখের দিনে ওরা বার বার অভিনয় করেছে King of the Dark Chamber।" আবার দীর্ঘক্ষণ নীরবতা—"একে বলে পুরস্কার!"

বিদেশে তিনি যে প্রভূত রাজকীয় সম্মান পেয়েছিলেন তার কাহিনী ভাল করে লিপিবদ্ধ নেই। যাঁরা তাঁর রচনা পড়াবার সুযোগ পান নি তাঁরাও তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার সম্মোহনে মোহিত হয়েছেন। জার্মাণীতে ফুল বিছান পথ দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে। কোনো ভারতীয় ইতিপূর্বে এমন সম্মান পায়নি। আমাদের এক হাঙ্গেরিয়ান বন্ধুর কাছে গল্প শুনেছিলুম; তাদের দেশে যখন তিনি যান কেউ যে গিয়ে কথা বলবে কবির সঙ্গে সে স্পর্ধা সে সাহস রাখে না, শুধু একবার দেখবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারি দিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে। কবি যে মানুষের হৃদয়ের দরজায় প্রেমের অতিথি। এই প্রীতি তিনি দেশে বিদেশে যোগ্য ও অযোগ্য সকল রকম মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন অজস্রধারায়। মানুষ তাকে ঈর্ষা করেছে, দ্বেষ করেছে, তাঁর ত্রুটির সন্ধানে ঘুরেছে, ঈর্ষার জ্বালায় মিথ্যা নিন্দা করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভালো তাঁকে

বেসেছে। সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কাজ তাঁর দান গ্রহণ করতে না পারলেও সেই আসন তাঁকে না দিয়ে পারে নি যা বীরের জন্য ত্যাগীর জন্য ও মহাপুরুষের জন্য সর্বদাই আমাদের বুকের মধ্যে পাতা আছে।

ভোর বেলায় এসে দেখি বারান্দায় স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছেন প্রত্যহের মতো। রোদ এসে পড়েছে পায়ের কাছে। এটি তাঁর নিত্যকার অভ্যাস ছিল। সকালবেলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন বসে থাকতেন। এই সময়ে তাঁকে দেখে মনে হোত না যে তিনি কারও দিকে ফিরে চেয়ে কৌতুক ক'রে কথা বলতে পারেন, ঘরোয়া কথা বলতে পারেন। এ সব কোনো কবিত্বের কথা নয়, এ সত্যিই একটা অলৌকিক দূরত্ব, যা প্রত্যহ আমাদের অনুভবের গোচর হতো। যেমন দূরে স্তব্ধ হ'য়ে আছে অত্যুঙ্গ তুষারাবৃত পর্বত, তেমনি সুদূর হ'য়ে, উনি তাকিয়ে থাকতেন দূরের দিকে। দেখে বোঝা যেত যেন তাঁর চারপাশের দৈনন্দিন পৃথিবী সরে গেছে—তিনি একাকী, সম্পূর্ণ একাকী, অতি সুদূরে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পরেই সকলের মধ্যে ফিরে আসতেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে। অনেকবার উনি বলেছেন—"ভোর বেলায় আমার আকাশের মিতা যখন আমায় আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেয়, তখন আমি চেষ্টা করি আমার নিজের থেকে দূরে যেতে। আমাদের মধ্যে দুটো 'আমি' আছে—দুটো মানুষ, একজন লোভে ক্ষোভে শোকে দুঃখে আনন্দে বিষাদে সর্বদাই দোদুল্যমান, আর একজন সে বড়ো 'আমি'। সে এ সমস্তের অতীত, সে স্থির, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, অথচ ঢাকা পড়ে থাকে সেই বড়ো সত্তাটাই। এরই বিষয়ে আমি বলেছি,—মানুষের দুটো রূপ, একটা তার বিশেষ রূপ, আর একটা তার বিশ্ব-রূপ। সেই বিশ্ব-রূপেই সে অসীমের সঙ্গে এক। আমি যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি সেই ছোট আমিটার থেকে দূরে যেতে,

তা না হ'লে এই ক্ষণিক সুখদুঃখে আবিল তুচ্ছতায় ঢাকা পড়ে যেতে চায় আমার মধ্যে আমার অতীত সেই অমর অজেয় আত্মা। সে বড় ভয়ানক ক্ষতি। সেই বড়ো সত্তার মধ্যে দৃঢ় ভাবে সত্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলে মানুষের আর কোন ভয় থাকে না। যখনই কোনো কারণে চঞ্চল হই, তখনি বুঝতে পারি আমার সাধনা সম্পূর্ণ হয়নি। তাই আমি ভোরবেলার সূর্যালোকে বসে প্রত্যহ চেষ্টা করি সেই ছোট আমিটার থেকে দূরে যেতে। আমি কোনো দেবতা সৃষ্টি ক'রে প্রার্থনা করতে পারিনে, নিজের কাছ থেকে নিজের যে মুক্তি সেই দুর্লভ মুক্তির জন্য চেষ্টা করি। সে চেষ্টা প্রত্যহ করতে হয়, তা না হ'লে আবিল হ'য়ে ওঠে দিন। আর তো সময় নেই, যাবার আগে সেই বড়ো আমিকেই জীবনে প্রধান ক'রে তুলতে হবে, সেইটেই আমার সাধনা।"

এই কথা তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছি। তাঁর এই সাধনার সম্পূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্য বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়,—কিন্তু যখন দেখতুম ছোট বড় সব দুঃখবেদনাগুলো সহজেই তাঁর মধ্যে পরিবর্তিত হ'য়ে যেত,—যত অপ্রিয়ই হোক যা inevitable, যা ঘটবেই, তিনি কত সহজে তার সঙ্গে মন মিলিয়ে নিতেন—তখন তার মধ্যেই খুঁজে বের করতেন যতটুকু ভালো, যখন দেখতুম গভীর শোকও এত সহজে তাঁর মধ্যে সংহত হ'য়ে আসত,—যখন দেখতুম পরম শত্রুও কাছে এসে দাঁড়ালে তিনি তার সব পূর্বাপরাধ এক মুহূর্তে ভুলে গিয়ে অনায়াসে হাত বাড়িয়ে দিতেন, হৃদয়ে স্থান দিতেন তুচ্ছতম মানুষকেও, তখন মনে হ'ত এই সেই বড়ো-আমির কথা।

"কী গো আর্যে, অমন নীরবে এসে দাঁড়ালে কেন? খাবার না খবর?" তখন রোজ যুদ্ধের খবর রেডিওতে শুনে ওঁকে বলতে হোতো।"

"এখন খাবার সময় হোলো।"

"ও তাহ'লে খাবার খবর? তার চাইতেও দরকারী খবর আছে যে সম্প্রতি একটা কবিতা লিখে ফেলেছি। তুমি যদি তোমার শ্রীহস্তের মুক্তাক্ষরে নির্ভুল বানানে এটা এখুনি কপি ক'রে দাও তাহ'লে এটা আজই প্রবাসীতে চলে যেতে পারে। ওই দেখ, তাই ব'লে আবার কাজ আদায়ের জন্য যা যা বল্লুম সব সত্যি ভেবে নিওনা। তোমাদের নিয়ে এইটি মুশকিল, একটু বাড়িয়ে বলবার জো নেই। অমনি বিশ্বাস ক'রে বসবে।"

"এখনও আপনার প্রশংসা বিশ্বাস করব? আমার কি শিক্ষা যথেষ্ট হয় নি?"

"যাক, এইবার তুমি আমার কাছে থাকবার যোগ্য হ'য়ে উঠছো। যা বলবো একধার থেকে সব অবিশ্বাস করে যাবে।"

"আচ্ছা এখন আপনি দিন তো, কপি করি—"

পড়ে দিলেন কবিতাটা, নাম 'প্রৈতি'। আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"একটু শক্ত হয়েছে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না?"

"আমার পক্ষে একটু,—একটু বলে দিন।"

"না না তা হয় না, তাহ'লে খাতাটা রেখে যাও, আমি আবার দেখি। আমার নিজেরই মনে হচ্ছিল পরিষ্কার হয় নি। তোমাকে না হয় বল্লুম, কিন্তু কত লোককে ডেকে ডেকে বলব,—ও আবার ঠিক করতে হবে।"

"কিন্তু কেন তা করবেন, আমি না হয় নাই বুঝতে পেরেছি।"

"আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে কিনা। এই যে ক্ষণিকের জন্য বুদ্বুদের মত আমরা ভেসে উঠছি অসীম কালের প্রবাহের মধ্যে—এ কোথা থেকে আসছে। বিরাট অসীম এক বিশ্বসত্তা যেন এতটুকু এতটুকু কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে বাঁধছে। এসব চিন্তা কিন্তু এত abstract যে কথার frame-এর মধ্যে তাকে বেঁধে ফেলা শক্ত,—কিছুতেই যেটি বোঝাতে চাই সেটি হয় না,—আচ্ছা পালাও, এখন এটাকে নিয়ে পড়ি।"

বিকেল বেলা এসে দেখি কবিতাটা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে এবং নাম হয়েছে 'প্রথম প্রৈতি।' পড়ে গেলেন—

"কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া
অদেহ ধরিল কায়া
সত্তা আমার জানিনা সে কোথা হ'তে
হোলে উত্থিত নিত্য-ধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ মাঝে—কেন্দ্র রচিল স্বীয়
বিশ্ব সত্তা মাঝখানে দিল উঁকি
এ কৌতুকের মাঝখানে আছে জানি না কে কৌতুকী
ক্ষণিকেরে নিয়ে অসীমের এই খেলা
নব বিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ বিনাশের হেলা
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে
মুখ ঢাকা বধূ সেজে
গলায় পড়িয়া হার
বুদ্বুদ মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ
অনন্ত তারে অন্ত সীমায় জানায় আবির্ভাব।

এখন খুব স্পষ্ট হয়েছে তো? বুঝতে পারছ?"

"হ্যাঁ এখন পারছি বৈকি। কিন্তু আমার বোঝা-না-বোঝায় কি কিছু এসে যায়?"

"তবে কার বোঝা-না-বোঝায় এসে যায়? সেইটি যে আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। এর standard কি? তোমাদের জন্যই তো লিখছি, তোমরা যারা প'ড়ে আনন্দ পাও। কিন্তু কবি বা শিল্পীর অদৃষ্টলিপি আরো জটিল, অর্থাৎ যারা কিছুমাত্র আনন্দ

পায় না, বোঝে না, তাদের কাছেও জবাবদিহি করতে হয়। অন্য সব বিষয়েই—দর্শনে বল, অঙ্কশাস্ত্রে বল, ব্যাকরণে, বিজ্ঞানে সব কিছুতেই অনধিকারী কোনো কথা বলতে পারে না। যেটা যার বিষয় সেইই সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সাহিত্য যেন পথে পড়ে আছে, যেন ওর মর্ম গ্রহণ করবার জন্য কোনো শিক্ষার অপেক্ষা নেই। যে খুশি সে তার বিচারক হ'য়ে বসতে পারে। তেমনি দেখি ছবির বেলাতেও। যারা ছবি দেখতে জানে না, ছবি দেখার মন নয় যাদের, তারাও অনায়াসে মতামত প্রকাশ করবার স্পর্ধা রাখে। অন্য সব ক্ষেত্রেই প্রথমে মাথা নীচু ক'রে শিক্ষার্থীকে প্রবেশ করতে হয়, কিন্তু আমাদের কপালে সকলেরই উদ্ধত শির, সকলেই মস্ত বিচারক, এবং তাদের মতামতও মূল্য পায়। আমি সারাজীবন ধ'রে এই কাজ করছি, কিন্তু অনায়াসেই যে কোনো একটা লোক বলতে পারে এবং বলবার স্পর্ধা রাখে—রবিবাবু কিন্তু এটা ঠিক ফোটাতে পারেন নি। কিংবা রবিবাবুর লেখায় ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"জয়শ্রী পত্রিকা আমাকে অনুরোধ করেছে আপনার কাছ থেকে একটা লেখা সংগ্রহ ক'রে দিতে,—বেচারা তারা তো সত্যি খবর জানে না যে আমি অনুরোধ করলেই তার ফল উল্টো হবে।"

"অয়ি অকৃতজ্ঞে, একথা তুমিই বলতে পার বটে! তোমার কথায় বারবার দুর্গম পাহাড় পর্বত পার হ'য়ে দৌড়ে আসছি কিনা! তার চেয়ে চুপ ক'রে শান্ত হ'য়ে বসে এই কবিতাটা পড়ে দেখ,—এ হোলো রবীন্দ্রোত্তর বা 'রবীন্দ্রধুত্তোর' কাব্য!"

"ক্ষমা করুন, এ সব আমার বিদ্যায় হবে না।"

"না না একবার চেষ্টা ক'রেই দেখনা। আমি তো প্রায় মিনিট-দশেক ধরে চেষ্টা করলুম, প্রত্যেকটা লাইনের অর্থ একরকম ক'রে হয়, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য লাইনের যে কি যোগ তা কবি জানেন কিংবা তাঁর অন্তর্যামী। তুমি যদি বলতে পার, আমার সু'পাঁচ আনা সমেত কলমের বাক্সটা নিশ্চয় তোমায় দিয়ে ফেলব।"

নাম দেখলুম, একজন নাম-চেনা আধুনিক কবি। "দেখুন আপনি নিজে একদিন এর লেখার কি প্রশংসাই করেছিলেন, এখন এই রকম বলছেন ?"

"কি করব—বল্লে ভালো, আমি ভাবলুম, নিশ্চয় ভালো।"

"আর তাই নিয়ে অনায়াসে ঘণ্টাখানেক কী তর্কই করলেন। ওইতো আপনাকে নিয়ে মুশকিল, যে যখন কাছে থাকবে সে যা বলবে—"

"দেবি! তোমার সম্বন্ধেও শত্রুপক্ষ এইরকম অপবাদ দিয়ে থাকেন।"

"যদি তেমন কাজ করি তাহ'লে দেবে বৈকি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনার ব্যবহার সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি লেখাতে গেলে ঠিক উল্টোটি লিখতেন।"

"ঐ দেখ, আজ ঐ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকেছে। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, হতভাগা বনমালীর নিশ্চয়। মাসী কোথায় গেল ? তোমায় এত ওষুধ খাওয়াচ্ছি, সকালবেলার ঝগড়াটা মিটিয়ে দিয়ে যাও।"

সে দিন শরীরটা বেশ খারাপ ছিল, কাঁচের ঘরে এসে দেখি বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বল্লুম—"একটা কাজ কিন্তু আমার ভালো মনে হয় না।"

"কি সেটা ? যদিও সেজন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইনি, কারণ বরাবর দেখে আসছি, যেটা আমার ভালো মনে হয় তোমার সেটা ভালো মনে হয় না। যাহোক্ বলে ফেল।"

"রাত্রে যে আপনার ঘরে কেউ থাকে না, এটা ঠিক নয়।"

"এই দেখ, যা ভেবেছি তাই। কিন্তু আমার মতে ওইটেই ঠিক। তোমাকে তো বলেছি আমার কিছু দরকার নাই, কি সাহায্য কে করবে ? যেই থাকুক, আমি কাউকে ডাকবই না। বরং পাছে তার ঘুম ভাঙে ব'লে আস্তে আস্তে চলতে হবে।"

"কেন, ডাকলে কি ক্ষতি ?"

"ও আমার স্বভাবই নয়। দেখ, তোমরা সেবা ক'রে খুশি হও, তাই আমারও ভালো লাগে, খুশি হ'য়ে সেবা নিই। কিন্তু মাইনে দিয়ে রেখেছি ব'লেই যে তাদের ওপর জুলুম, এ আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া রাত্রিটা হোলো ঘুমের জন্য, যার ঘুম নেই সে যদি অন্যকেও জাগিয়ে রাখে, সেটা অন্যায় নয় তুমি বলতে চাও ?"

কারও কাছ থেকে সেবা নিতে চাইতেন না, শত প্রয়োজন হ'লেও ডাকাডাকি করতেন না। ইদানীং শরীর স্থবির হ'য়ে পড়েছিল, স্নান করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়তেন, কিন্তু চাকরের দ্বারা স্নাত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। শত কষ্ট হ'লেও নিজেই করতেন। তাঁর গায়ের চামড়া এত সুকুমার ছিল যে কর্কশ হাতের স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন না। কাজেই যে-সে পায়ে মালিস করতে এলে বা সেবা করতে এলে তাঁর পক্ষে মুশকিল হ'ত। কারণ ভদ্রতা ক'রে কিছু বলতেও পারতেন না আর সহ্য করাও বিপদ। কোনো শারীরিক প্রয়োজনের কথাই কখনো বলতেন না। বুঝে বুঝে করতে হ'ত। যদি ঠিক মত হোতো—ভাল, খুশি হতেন, না হ'লেও কোনো অনুযোগ অভিযোগ নেই। সব চুপচাপ ধীরেসুস্থে হয়ে যাচ্ছে, এইটি তাঁর ভাল লাগত। এটা চাই ওটা চাই ক'রে ব্যস্ত করা তাঁর একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ। রাত্রে শত প্রয়োজন হলেও কখনো কাউকে ডাকতেন না। চাকররা ঘুমিয়ে থাকলে পা টিপে টিপে চলতেন, পাছে তাদের ঘুম ভাঙে। তাঁর এই অভ্যাসগুলো অন্য সকলের চাইতে এত পৃথক যে আমাদের ভারি আশ্চর্য লাগত, এবং কত যে ভাল লাগত বলা যায় না। সাধারণতঃ আমাদের দেশের বাড়ির কর্তারা বাড়ির আর পাঁচজনের উপর একটা প্রকাণ্ড বোঝা। পাছে তাঁদের পান থেকে চুন খসে, এই জন্য সমস্ত সংসার তটস্থ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই জিনিসটি তিনি মোটে পছন্দ করতেন না। হুকুম করতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন। কলমটা দাও বা চাদরটা চাই—এও যেন তাঁর বলতে

ইতস্তত বোধ হ'ত। ইদানীং বাধ্য হ'য়েই তাঁকে পাঁচজনের সাহায্য নিতে হ'ত, কিন্তু তাতে অস্বস্তি বোধ করতেন। তাই যদি কেউ খুশি হ'য়ে সানন্দে তাঁর কাজ করত তবেই তার কাছ থেকে নিতেন,—বলতেন, চাকরবাকরদের মাইনে দেওয়া হচ্ছে ব'লেই ওদের বাধ্য ক'রে খাটানো কিংবা জোর ক'রে সেবা আমি নিতে পারি নে। ক্রমশই পরামুখাপেক্ষী হ'য়ে পড়ছেন, এটি তাঁর খারাপ লাগত, তাই শেষ একবৎসর যখন শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছিলেন তখন নিশ্চয় খুবই কষ্ট পেতেন। যাঁরা সেবা করতেন তাঁদের প্রতি যেন কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। একথা কখনো মনে করতেন না যে, কেন করবে না বা এতো করবারই কথা,—এ দৃষ্টিতে দেখতেন না। তাঁর সেবা করতে পাওয়াই এক পরম সৌভাগ্য, যে সৌভাগ্যের স্মৃতি আজীবন সকলে মনে রাখবে। কিন্তু তিনি সেই সেবা যেন সহজপ্রাপ্য ব'লে অগ্রাহ্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। তিনি তার মধ্যের স্নেহ-রসটুকু সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে ভোগ ক'রে, তাঁর সমস্ত সেবক-সেবিকাদের ধন্য ক'রে,—তাঁর জন্য যতটুকু করা তার চতুর্গুণ দাম চুকিয়ে দিয়েছেন—"যে আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে, ফেলিয়া যে যায় নাই ঋণভার।"

এই প্রসঙ্গে মনে আছে আর একটি ঘটনা, কালিমপং থেকে দারুণ অসুস্থ অজ্ঞান অবস্থায় কলকাতায় নিয়ে যখন পৌঁছনো গেল, জোড়াসাঁকোর বাড়ি লোকে লোকারণ্য। পৌঁছতেই রথীদা বল্লেন—"ডাক্তাররা বলেছেন রীতিমত শিক্ষিত ইংরেজ নার্স আনতে হবে, কারণ শুশ্রূষা একেবারে বিধিসঙ্গতভাবে চালাতে হবে। জোর ক'রেও লিকুইড্ খাওয়াতে হবে, সে সব তোমাদের কাজ নয়।" এলো যথারীতি ইউনিফর্ম-পরিহিতা বিদেশী নার্স। সে দিন সারাদিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় কাটল। এক এক বার অল্প সময়ের জন্য জ্ঞান ফিরে আসছিল বটে, কিন্তু নার্সকে দেখতে পান নি। রাত্রি বারোটা তখন, পরিষ্কার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমি তাঁর বিছানার পাশে একটা চৌকিতে বসেছিলুম। বেশ মনে পড়ে,

সামনে বাতির আলোয় ঝুঁকে প'ড়ে নার্স থার্মোমিটার পড়ছে আমাদের দিকে পিছন ফিরে। উনি নিজের মাথার দুদিকে হাত দিয়ে নার্সের মাথায় হুড্‌টার অনুকরণ ক'রে আমার দিকে সপ্রশ্ন ভাবে তাকালেন। "টুপি?" অর্থাৎ টুপি-পরা ও কে। "নার্স।" করুণ ভাবে বল্লেন—"আবার এসব উৎপাত কেন? ওঃ, বড়লোকের অসুখ করেছে কিনা, তাই সব দস্তুরমত হওয়া চাই,—দস্তুর! আমি ওসব দস্তুর ভালবাসিনে।" তারপর অনেকক্ষণ নীরবতা, ঘড়ি টিক্ টিক্ করে চলছে; অন্ধকার নিঝুম রাত্রি, ওপরে দেয়ালে মহর্ষিদেবের প্রকাণ্ড ছবি—যেন জীবন্ত মানুষ, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন।

"তোমাদের কি খুব ষ্ট্রেইন্ হচ্ছে?"

"না, না, সে কথা কেন ভাবছেন, আমরা তো থাকবই, তবে হয়তো আমরা সব কাজ ভালো ভাবে পারব না।"

"তাহ'লে আমার কাজ খারাপ ভাবেই হবে।"

"কিন্তু আপনি জল খান না, আমাদের কথা শোনেন না।"

"আমি তোমাদের হাতে যদি জল না খাই, তাহ'লে কি এই অস্পৃশ্যের হাতে খাব?"

হেসে উঠলুম, কিন্তু তাতে নিষ্কৃতি হোলো না। "একেতো ফোঁড়াফুঁড়ির দুঃখ চলেইছে, আবার এ সব কেন? ডাকো না তোদের কর্তাকে।" সুরেনবাবু এলেন, বুঝিয়ে বল্লেন—কাল সকালেই নার্স বিদায় হবে। ব্যবস্থা তো হোলো, আবার ভয়, যদি নার্সের মনে কষ্ট হয়। ভোরবেলা তার হাতে ধ'রে বলেছেন— "তুমি কিছু মনে কোরো না এখন তো আমি প্রায় সুস্থ হ'য়েই উঠেছি, সেইজন্য আর দরকার হবে না। আর তা ছাড়া এই যে এরা রয়েছে, এরা আবার unemployed হ'য়ে পড়বে। ওদের সর্বদা কাজ দিয়ে আট্‌কে রাখতে হয়, নৈলে বড় গোলমাল করে।"...

"ওগো সীমন্তিনী, মাসী যে ক্রমাগত ভুগতেই লাগল। আমার ওষুধে ফল হচ্ছে না, না খাচ্ছেন না?"

সুধাকান্তবাবু বল্লেন, "উনি অনেক অনিয়ম করেন।"

"তাই নাকি, চল কোথায় সে আছে, বুঝিয়ে ব'লে আসি—"

"না না, আপনাকে যেতে হবে না, সে খুব আসতে পারবে।"

মাসী এলো। "দেখ মাতৃষ্বসা, এটা কি ভালো হচ্ছে? শুনছি তুমি নাকি বড় অনিয়ম কর?"

"খেলেও যা না-খেলেও তা, নিয়ম করলেও যা অনিয়ম করলেও তা।"

"এই শোনো কথা! এখন একটা ওষুধের পরীক্ষা চলেছে, এখন যদি তুমি অনিয়ম কর তাহ'লে এ অভাগা ডাক্তারের প্রতি বড় অবিচার করা হয়। তা ছাড়া তোমার এই ভাগ্নীটি তো সর্বদাই আমার কৃতিত্ব কমাবার চেষ্টায় আছেন। এনে দিলুম ওষুধ, এনে দিলুম বই, তা একবার পড়ে না। ওষুধ গুলো যেমন রেখে গিয়েছি তেমনি আছে, খায় না পর্যন্ত, এত অবজ্ঞা! তবু আমিই মাঝে মাঝে খেয়ে কমাই।"

"বা, অসুখই করেনা তো ওষুধ খাব কি?"

"শুনে ঈর্ষা হচ্ছে। আমারও এক সময়ে ওই দুঃখই ছিল, জুতোসুদ্ধ জলের ভিতর পা ডুবিয়ে ভিতরের জামা ভিজিয়ে কত রকমে চেষ্টা করতুম—কিন্তু কি অসম্ভব রকম ভালো ছিল শরীর, একেবারে অভদ্র রকম ভালো। জীবনে মাথা পর্যন্ত কখনো ধরে নি।"

মিঠুয়া নাচতে নাচতে এসে কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন —"দাদু একটা গান কর। তুমি সেই গানটা জানো?"

"কোন্‌টা মিঠুয়া?"

"খোল খোল দ্বার, আর আজ আমাদের ছুটি!"

"এক কালে তো জানতুম মনে হচ্ছে, দেখি মনে আছে কি না।"

ছুটো গানই করলেন, খুকু চুপ ক'রে শুনতে লাগল। "আচ্ছা, এতটুকু মেয়ে এমন ক'রে গান শোনে এ আমি কিন্তু দেখিনি। এখানে যে তোমার গান শেখাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। নিজে তো শিখলে না, মেয়েকে শিখিয়ো কিন্তু, ওর এ তৃষ্ণা মিটিয়ো নইলে অন্যায় হবে। তুমি যখন অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাক তখন ও মাঝে মাঝে আসে, কখনো বলে—দাদু চকোলেট, কখনো বলে—দাদু গান। ছুটোই যে ওর সমান প্রিয় এটা কম নয়—তোমার জামাই তো হবেন আর্টিষ্ট ; আর ইনি যদি গাইয়ে হন, তাহলে দুই আর্টিষ্টের মিলন বিশেষ সুবিধের হবে কি না, কি জানি।...তার চেয়ে মিঠুয়াকে একটু চৈনিক লিচু খাইয়ে দাও। মনে রেখ দৈনিক, চা খাইবে চৈনিক, গায়ে যদি বল পাও হবে তবে সৈনিক, জাপানীরা যদি আসে চিঁড়ে নিক দৈ নিক, আধুনিক কবিদের যত পারে বই নিক।"

"শান্তিনিকেতনে যে দিন এ ছড়াটা বল্লেন, সেদিন আরো একটা বলেছিলেন,—জাপানী ও জাপানী, তোমার হাড়েতে লাগিবে কাঁপানি, এখন যতই কর লাফানি ঝাঁপানি,—সেটা প্রকাণ্ড ছিল কিন্তু মনে করতে পারছি না।"

"যাক তাতে বেশি ক্ষতি নেই, না হয় আমার ছড়া-লোক থেকে একটা ছড়া খসেই গেছে। তবু তো তুমি অনেক মনে ক'রে রেখেছ। আগে তো কথায় কথায় বলতুম, সব হারিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, তোমরা ছাতু খাওনা কেন? ছাতু জিনিসটি ভালো, আর তেমন ক'রে মাখতে পারলে অতি উপাদেয় ব্যাপার হয়। এক সময়ে ভাল ছাতুমাখিয়ে ব'লে আমার নাম ছিল, মেজদার টেবিলে ছাতু মাখতুম মারমালেড্ দিয়ে।"

"মারমালেড্ দিয়ে ছাতু?"

"নয় তো কি? অতি উপাদেয় সুখাদ্য। আনাও না ছাতু।"

"মংপুতে তো নয়ই, দার্জিলিংএও যবের ছাতু পাওয়া গেল না। অগত্যা মুড়ির ছাতু তৈরি হ'ল। তাতেই চলে যাবে।

মারমালেড্ এল, গোল্ডেন সিরাপ এল, আদার রস, দুধ, কলা, মাখন, প্রভৃতি যেখানে যা আছে সব ছাতুর উপর পড়তে লাগল, আর মাখা চলল আধঘণ্টা ধরে।

"আপনার রসুনটাই বা বাদ যায় কেন? একটু পেঁয়াজের রসও পড়ুক না?"

"বটে, ঠাট্টা? খেয়ে দেখো।"

সন্ধ্যেবেলা বসবার ঘরে আসর বসল। প্লেটে প্লেটে ভাগ হ'ল ছাতু, সবাই ওঁর সামনেই শুরু করলুম। হবি তো হ' আমি আবার একেবারে সামনে। আর সবাই একটু এদিক ওদিক। কাজেই আমার বিপদ বেশি, সোজা তাকিয়ে আছেন। মুখে তোলামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি রকম?"

সত্যি বলতে গেলে খুব যে উপাদেয় লেগেছিল তা নয়, তবু প্রায় তৎক্ষণাৎ বল্লুম—"খুব চমৎকার, এতো রোজ খেলেই হয়।"

সেই বিলম্বটুকু নজর এড়ায় নি।

"মাতৃস্বসা তোমার কেমন লাগল?"

"নির্ভয়ে কবো?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"এতই কি ভালো?"

"দেখো তোমার ভাগ্নীরও ঠিক তাই মত, কিন্তু স্ত্রী-সুলভ চাতুরীবশত সামলে নিলেন। স্পষ্ট দেখলুম মুখে দিতেই মুখটা কেমন হ'য়ে গেল, একবারে তখুনি তখুনি ব'লে উঠলেন—খুব চমৎকার, যত খারাপ লাগছে তত বলে আরো খাওয়া যাক। মেয়েরা তো এমনি ক'রেই বশ করে,—একেই তো বলে—"

"বেশ বেশ, ভালো বল্লে যদি তার এত ব্যাখ্যা শুনতে হয়, এত গাল খেতে হয়, তা'হলে না হয় খারাপই বলা যাবে।"

› "তোমাদের ছাতুর দোষ গো ছাতুর দোষ, তা না হ'লে ভালো না হ'য়েই যায় না! মেজদার টেবিলে সবাই তো উৎসুক হ'য়ে থাকতেন, তাঁরা কিছু কম শৌখিন ছিলেন না।

যাক, কাল আর একবার চেষ্টা করতেই হবে। মাসীকে দিয়ে ভালো বলাতেই হবে। আমি ছাতু মাখবো আর উনি অবজ্ঞা ক'রে বলবেন—এতই কি ভালো, এও সহ্য করতে হবে বিশ্বকবির ?"

"কেন বিশ্বকবির তাতে দুঃখটা কি ? ছাতু-মাখিয়ে ব'লে তো আর আপনার খ্যাতি নয় যে সেটি খোয়া যাবে ?"

"রীতিমত খ্যাতি ছিল, মাসীর কাছে সেটি প্রমাণ করা চাই। কাল কিন্তু ভালো ছাতু এনো, ওসব বাজে ছাতু চলবে না।"

কিন্তু এনো বল্লেই তো ছাতু আসে না, এ একটা গণ্ডগ্রাম, এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। মাসীকে বল্লুম—কি বিপদে ফেল্লি, এখন ছাতু পাই কোথায় ? তখন যব ভাজিয়ে যাঁতায় গুঁড়ো করানো হ'ল, দেখে মনে হ'ল ঠিকই হয়েছে। সেদিন বিকেলে সবাই বেড়াতে গিয়েছেন, উনি বল্লেন—চল ছাতু মাখা যাক। আবার সব এলো। যা যা চোখের সামনে ছিল, যা বা মনে পড়ল, সব মিশলো ছাতুর সঙ্গে। তখন বল্লেন—একটু খেয়ে দেখ। মুখে দিয়েই দেখি, ছাতু মোটেই ছাতু হয়নি, সব দানাগুলো কড়্ কড়্ করছে, উনিও দেখলেন।

"যাক ভালই হয়েছে, আজ মাসীকে জব্দ করা যাবে। কাল মাসী ভাল হয়নি বলেছে, ভেবেছে তাতে আমায় দুঃখ দেওয়া হয়েছে। আজ আর কিছুতেই বলতে পারবে না ভালো হয়নি। দেখো যতই কড়্ কড়্ করুক, হাসিমুখে বলবে এতো অতি উত্তম। তবে বেচারাকে পরীক্ষার পর খেতে দেবার জন্য খানিকটা চেলে নিয়ে ভালো ছাতুও মেখে রাখা যাক।"

উনি তখন খেতে বসেছেন, মাসী বেড়িয়ে ফিরলেন। "মাতৃস্বসা, গিয়েছিলে কোথায় ? আমি যে তোমার জন্যে ছাতু মেখে নিয়ে বসে আছি।"

"তাই নাকি, কোথায় ?"

"ওই যে ঢাকা রয়েছে।"

ঢাকা খুলে মাসী খানিকটা নিলে, খেতে খেতে বল্লে—"আজ তো খুবই চমৎকার হয়েছে, কালকের চেয়ে ঢের ভালো।"

আমরা হেসে উঠলুম। অপ্রস্তুত হ'য়ে মাসীর চামচ পড়ে গেল। "মাতৃষ্বসা, কাল যে কাজটা করেছিলে সেটা স্বজাতির বিরুদ্ধতা, আজকেরটাই ঠিক, এ সব বিষয়ে সত্য মিথ্যার মূল্য সমান, দুঃখ দিতে চাও না এইটাই অমূল্য।"

"কেমন আছেন আজ?"

"বেঁচে আছি এইটাই দুঃখ। এই মাত্র তোমার কর্তৃকারক খবর শুনিয়ে গেলেন। এই যে সব দেশের উপর হানাহানি চলেছে, ওরা তো অপরিচিত নয়, ওখানে কত সুন্দর দিন কত আনন্দে কাটিয়েছি। মনে পড়ে সেই সব হাসি হাসি মুখ, আদর অভ্যর্থনা আর কষ্ট হয়,—কেন এ অত্যাচার, এ কি এ। জগৎব্যাপী আজ যে হানাহানি, যে বিরাট মরণ যজ্ঞের আয়োজন চলেছে, সেই ভীষণ দুঃখের সামনে নিজেদের ছোট খাট সুখদুঃখগুলো এত তুচ্ছ এত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় যে তাদের আর কোনো প্রাধান্য দিতেই লজ্জা পাই। অথচ যত বেদনাই লাগুক একটা কড়ে আঙুল তুলেও তো সাহায্য করতে পারব না কাউকে, তবে এই নীরব বেদনার কোনো কি মূল্য নেই? কি জানি। যেমন মানুষের হাতে শানিত ছুরি, তেমনি মানুষের হিংস্র আক্রোশ লেলিহান হ'য়ে উঠেছে। তারই পাশে এই যে আমাদের গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, একি একেবারে নিষ্ফল নিরর্থক হবে? তবে এই বা এলো কেন? যদি এক বিরাট বিশ্বব্যাপী সত্তার কল্পনা করা যায় যে এক হাতে মারে আর এক হাতে আনে জীবন যে নিজ হাতে নিজের সৃষ্টিকে মুছে মুছে তার সংশোধন ক'রে চলেছে!—সর্বশক্তিমান্ নয় তাহ'লে তো চরম ভালোটির সৃষ্টি করতে পারতেন কিন্তু আদি যুগ থেকেই চলেছে কাটাকুটি

মোছামুছি, প্রাণপণ চেষ্টা আরো-ভালো থেকে আরো-ভালো করবার। প্রথমে আদিম যুগের প্রাণীগুলো গেল বাদ পড়ে—সৃষ্টিকর্তার ধ্যানলোকের আদর্শের সঙ্গে তারা মিলল না। মানুষের নৈতিক চেষ্টার মধ্যেও আছে এই জিনিস। মানুষের ইতিহাসও বার বার পালটিয়ে লেখা হতে থাকে। সেই কাটাকুটির দুঃখ তো পেতেই হবে।—আজ সকাল বেলা বসে বসে তাই মনে হচ্ছিল সেই মন্ত্র—স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্তা সর্বমসৃজৎ যদিদং কিঞ্চ—তিনি তপস্যায় তপ্ত হয়ে এই সমস্ত সৃষ্টি করেছেন, এই বিরাট সৃষ্টিকার্যের মধ্যে বিরাট দুঃখও আছে, কিন্তু তার চাইতেও বড় হ'য়ে আছে মঙ্গলের আদর্শ। তা না হ'লে সে আদর্শের কথা আমাদের মনেই উঠত না, একথা মনে হ'ত না যে—যদি প্রেম দিলে না প্রাণে!"

একদিন ডাকের সঙ্গে এল এক বোতল মধু; শিশিটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেছে।

"ওগো মাংপবী, তোমায় মধুর কবিতা লেখার পর থেকে কেবল মধুই আসছে, মধুই আসছে। কিন্তু কবিতা তো আর বেরুচ্ছে না। এক সঙ্গে চার চারটে মধুর কবিতা লিখলুম, তুমি আবার দিলে প্রবাসীতে ছাপিয়ে, সবাই ভাবলে এই হচ্ছে কবিতা লেখবার সহজ উপায়,—পাঠাও একে মধু, মধু পাঠাও, কিন্তু কবিতা তো আর বেরুচ্ছে না। কেবলমাত্র মধু যে কবিতার inspiration যোগায় না, তা তো অকবিদের জানা নেই!"

"রথীদা বলছিলেন, তার চেয়ে যদি আপনি চাল ডালের উপর কবিতা লিখতেন, সে আরো ভাল হ'ত। সংসারের খরচ অনেকটা বাঁচত।"

সুধাকান্তবাবু এগিয়ে এলেন, "গুরুদেব, আমাদের ডাক্তার সেন থাকেন চুপচাপ, কিন্তু এদিকে রস আছে। মধুর কবিতা লেখাতে মধু আসছে শুনে তিনি বল্লেন, গুরুদেব যদি তার চেয়ে বধূর কবিতা লিখতেন আর বধূ আসতে থাকত!"

ডাক্তার সেন দরজার আড়াল থেকে নিষেধের প্রচণ্ড ভ্রূকুটি করলেন।

"তাই বলে নাকি সে? গেল কোথায়, এতো খুব ভাল প্রস্তাব, যাকে বলে গিয়ে একটা good suggestion!"

গতবার গাছের ডাল দিয়ে যে ঘর বানাতে বলেছিলেন, সেটা বানানো হয়েছিল,—তার নাম দিয়েছিলেন 'শৈল কুলয়'।

"আজ চল তোমার শৈল কুলয়ে।"

"আচ্ছা গাড়ী নিয়ে আসি, সুধাকান্তবাবুকে ডাকি।"

"ও, ভারি এক সুধাকান্তবাবু পেয়েছ। কেন, সে কি আমায় ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে নাকি? এমন সময় সুধাকান্তবাবুর পুনঃ প্রবেশ।

"এই যে আসুন আসুন, আপনার জন্য আমরা যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলুম।"

শৈল-কুলয় খুব ভাল লেগেছিল। "ওই চা-বাগানের ভিতরের রাস্তাটা তো ভারি সুন্দর! এদিকটা আমার কিছু জানা ছিল না, এই গাছটিও একটি সুকুমার ভঙ্গীতে নেমে এসেছে, সামনে ও গুঁড়িটাও রেখেছ ভালো জায়গায়। ওইখানে তুমি বসবে, আর তোমার ভক্ত বসবে ঘাসের উপরে।"

"ফস্ ক'রে এখানে ভক্ত পাব কোথায়?"

"আরে তেমন ক'রে চেষ্টা করলে কি এক আধটা ভক্ত জোগাড় হবে না? সুধাকান্তকে ব'লে দেখব, বোধ হয় বেশী পীড়াপীড়ি করতে হবে না। না অমিয়, এ ঘরটি ভারী সুন্দর হয়েছে। কার suggestion ইনি বোধ হয় সে কথাটা সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছেন?"

"মোটেই না, আমি সকলকেই বলেছি।"

"আচ্ছা তোমরা সব এখন পালাও, আহারাদি করোগে, আমি বসে বসে দেখি, আর ওই প্রুফটা নিয়ে যাও সীমন্তিনী, বালিশে চুল মেলে দিয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে পড়ো গিয়ে।"

বিকেল বেলা গিয়ে দেখি, চারিদিকের জানালা খোলা, উনি খুব খুশি মুখে চুপ ক'রে রয়েছেন। "দেখো আমি দেখছিই, ওই যে প্রকাণ্ড গাছটা, ওর দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ফেরানো যায় না, বাতাসে আলোতে ঝলমল ঝলমল করছে। এত দেখছি চিরজীবন আর প্রতিদিন দেখছি, তাই বলেছিলুম মনে মনে যে এমন ক'রে কে এদের দেখবে, যখন আমি থাকব না? কিন্তু একটা কথা আছে, যদিও জানি, বল্লেই আপত্তি তুলবে।"

"আর বলতে হবে না, আপনি এই ঘরে থাকতে চান, এই তো?"

"এইবার ঠিক ধরেছ, ফস্ ক'রে কি ক'রে বুঝে ফেল্লে? তোমার বুদ্ধি তো এত তীক্ষ্ণ ছিল না, আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে শান পড়ছে আর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে।"

"সে যাই হোক, কিন্তু তা হয় না।"

"এই দেখ, আমিও এ জানতাম। তুমিও যেমন আমার মনের কথা বল্লে, আমিও তেমনি তোমার মনের কথা বলেছি। কিন্তু কেন হয় না? তোমার যুক্তিগুলোও আমি জানি। প্রথম কথা এখানে চানের ঘর নেই। তার জন্য বিশেষ কোনো হাঙ্গামা হয় না, ছোটখাট একটা ব্যবস্থা দু'এক দিনেই হ'য়ে যেতে পারে। আমি ডাক্তারকে বল্লেই সে ক'রে দেবে, যদি না তুমি মাঝখানে পড়ে বাধা দাও। দ্বিতীয় আপত্তি, এত দূর বাড়ি থেকে একা একা কি ক'রে থাকবেন? যেন আমি একেবারে নাবালিকা, আমায় গুণ্ডারা রাতারাতি চুরি ক'রে নিয়ে যাবে। কিন্তু নিলেও সামলাতে পারবে না, তোমার ভয় নেই। তৃতীয় কারণ, আমাদের ভয়ানক ভাবনা হবে। যে ভাবনার কোনো কারণ নেই, সেই অনির্বচনীয় অলৌকিক অকারণ ভাবনার জন্য আমার এখানে থাকা হবে না, যেখানে থাকলে আমার শারীরিক মানসিক সব দিক থেকে ভালো হোতো। এটা কি উচিত, তুমিই ভেবে দেখো।"

"আচ্ছা, তাহলে সুধাকান্তবাবুকে বলি।"

"এই কথাটারই অপেক্ষায় ছিলাম,' 'সুধাকান্তবাবুকে বলি', তাঁকে না ব'লে জগতে কোনো কাজ কখনো স্থির হ'তে পারে না, তিনিই হলেন এ বাড়ির ডিক্‌টেটর। রবীন্দ্রনাথের এমন অবস্থা হোলো যে সুধাকান্তবাবুর কথায় তাকে উঠতে বসতে হবে। হায় রে হায়।"

সেদিন সকাল বেলা কফি এলো, আর এলেন সুধাকান্তবাবু। "দেখ্ সুধাসমুদ্র,—র সেই প্রবন্ধটার যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে দে। যারা আমার জীবনী লিখতে শুরু করে, আমার এত খারাপ লাগে, কে জানে আমার জীবনের কি? এই সুদীর্ঘ জীবন কি ক'রে কাটিয়েছি, কি ভেবেছি, কি পেয়েছি, কি বেদনা, কি আনন্দ, কত রকম experience, তার কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথ, কত শত শত দিক, কে তা জানে বল—? কে আমার জীবনী লিখবে? কেউ আমাকে এতটুকু দেখেছে, কেউ বা আর এতটুকু, কিন্তু না-দেখা অংশটা অনেক বেশি। তাই আমার খারাপ লাগে কেউ যখন ফস্ ক'রে লিখে বসে—মানুষ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, বা ঐ জাতীয় একটা কিছু,—কে জানে মানুষ রবীন্দ্রনাথের খবর? কতটুকু তার তোমরা দেখেছ?"

"আপনি নিজে কেন লিখলেন না?"

"সে হয় না, সে হয় না। যে পর্যন্ত হয়, যে পর্যন্ত ছবি মাত্র, সে পর্যন্ত তো লিখেছি, কিন্তু যখন সত্যিকারের জীবন শুরু হোলো, *সে আর লেখা যায় না। লিখতে গেলে আবার সেই experienceএর* মধ্যে চিন্তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়,—সে বড় বেদনা।"...আর দেখো ঐ ডায়েরি; সে আমার দ্বারা কোনো কালে লেখা হল না; emotionএর একটি গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয়।"

"তা হবে কেন? যেমন করে প্রকাশ্য হ'তে পারে তেমন করেই হবে, ঘটনাগুলোকে ধরে রাখলে পরে তো তাকে অবলম্বন করে লেখা যায়?"

"মৃত্যু আছে যে, মৃত্যু—সে যে হঠাৎ আসে তখন জীবন বৃত্তান্ত যেমন করে শোনাতে চাও না তেমন করেই লোকে শোনে।"

"আপনার জীবন সম্বন্ধে দেশের লোকের যে অসীম কৌতূহল। আর তাছাড়া, পস্‌টেরিটিকে তো জানাবার সুযোগ দেওয়া উচিত?"

"বটেই তো, আমার জীবন একেবারে পথে পড়ে আছে! সকলেরই তাতে অধিকার। Greatness-এর penalty! সে কি আর এ জীবনে শেষ হবে না গো! কতই তো চলেছে—চিঠির পর চিঠি লেখ, বক্তৃতা দাও, দেশসুদ্ধ নবজাতকের নামকরণ কর, নিজের বিয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই, সে কথা উত্থাপনমাত্র হেসে উড়িয়ে দেবে, অথচ পরের বিয়ের পদ্য লেখ! তার উপর আবার এই জীবনী? তবে তুমি ঐ যে কী কর, কথা টুকে রাখ, কথার মালা গাঁথ, সে মন্দ নয়। কিন্তু এখন আর এই উঞ্ছবৃত্তি করে কী হবে? এখন কী আর সে দিন আছে? কথা কইবার সুযোগই বা কোথায়? বিদেশে অনেক হারিয়ে গেছে, কত বড় বড় মনীষীর সঙ্গে কত বিষয়ে আলোচনা, সে সব কেউ রাখল না। বিশেষ করে সে বার ইউরোপে কী আশ্চর্য সমাদরে ওরা আমায় গ্রহণ করেছিল সে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল— সে যদি কেউ রাখত, তোমরা দেখতে পেতে কেমন করে ভারতবর্ষের কবিকে ওরা সম্মান করেছে। বোধ হয় অন্যদেশের রাজা এলেও এমন সমারোহ হয় না। সে সব ভেসে গেছে, সেজন্য আমার দুঃখ হয় না যে তা নয়। আজ আর এ ছিন্ন কথার পুঁজি জমিয়ে কি করবে? আগে যদি আসতে, কাজে লাগতে পারতে। লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অসময়—! এক ছিল আমার পিয়ার্সন সাহেব, এমনটি আর হয় না—ট্রেনে যেতে যেতে পথে যেতে যেতে যেখানে যা বলছি টুকে রাখছে—এমন তৎপর এমন কর্মঠ এমন সর্বদা সজাগ কি আমাদের দেশের লোক হতে পারে? ওগো দেশাত্মবাদিনী, তোমার দুঃখ হবে জানি, এখুনি রণে প্রবৃত্ত হবে, কিন্তু তফাৎ আছে, ওরা আর আমার স্বদেশীয়রা এক ধাতুর নয়। আর যাক সে কথা, তুমিও

যেমন! জীবনকে কী ধরে রাখা যায়, যে দিনগুলো পার হয়ে এসেছি তার মধ্যে আর ফিরে গিয়ে কী হবে? ফুরায় যা দাও ফুরাতে।"

*　　　　*　　　　*

"কালকে সেই অলঙ্কারের বইটা পড়ছিলুম গো। এ পড়ে ওঠাই শক্ত। একে কি বলে সাহিত্য! এই পদ্ধতি মেনে ইনিয়ে বিনিয়ে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে লেখা! অলঙ্কার আর অনুপ্রাস আরও কত কী। অমনি করে কী সাহিত্য হয়—নিয়ম মিলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা। নিয়মের খাতিরে অর্থ কোথায় তলিয়ে গেল! অথচ লোকের ভালও তো লাগত এসব। আমাদের সময়ে সেই সুর করে পাঁচালী পড়া মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোয় মাদুর বিছিয়ে বসে, আর হরুঠাকুরের কাব্য, সে তো খুব উপভোগ্য ছিল—সে কি আর এখন তোমাদের ভাল লাগবে? তাই বলি তোমরা যে স্তুতিবাদ কর সে সত্য নয় গো নয়। চিরকালের জন্য কিছু কি দেওয়া যায়? কী জানি। আমার রচনার মধ্যেও অনেক কিছু আছে যা সাময়িক। সে সব ছাঁট পড়ে যাবে, বাদ পড়ে যাবে, তার পর বাকি যদি কিছু থাকে তবে মহাকাল তা গ্রহণ করবেন—বোঝা তো অনেক জমেছে, এত বোঝা কী পার হবে? তার মধ্যে আবার আজকাল এক উৎপাত জুটেছে, আমার কর্তাদের মাথায় ঢুকেছে ইতিহাস রক্ষা—কোথা থেকে সব কবর খুঁড়ে এনে হাজির করে বলে আমার রচনা, সে দেখলে লজ্জায় মরে যাই। বলতে ইচ্ছে করে সে তোমার লেখা, কিন্তু তা হবার নয়—ছাপার অক্ষরে একবার কালী পড়লে সে কলঙ্ক আর ঘুচবে না—ইতিহাস রক্ষা! আরে কাব্যের আবার ইতিহাসের দরকার কী? তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই আছে, ফুলের মূল্য বুঝতে গেলে কি তার শিকড়োৎপাটন করতে হবে? সৃষ্টিকর্তা আপনিও তো তাঁর নিজের রচনা বার বার সংশোধন করে চলেছেন। নির্মম হাতে মুছে ফেলছেন কত অসমাপ্ত সৃষ্টি। কত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে

আজকের মানুষ তৈরি হয়েছে—সে সব চাপা পড়ে গেল—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কাঁচা বয়সে শুরু করেছি লেখা, কত কাঁচা দুর্বল রচনা স্তূপ হয়ে আছে, যা আবর্জনা—তা বাদ দিতে চাই। ইচ্ছে মত ছাঁটাই কাটাই করে গড়ে তুলে মূর্তিটি—মুছতে দেবে না—? ছবি আঁকবে রবার ব্যবহার করবে না, ইরেসার? কিন্তু আমার অভিভাবকরা তা হতে দেবে না—ইতিহাস চাই তাঁদের! এসব হচ্ছে অধ্যাপকী বুদ্ধি! যা যাবার তা যাবেই, তুমি আগলে বসে থাকলেও যাবে, না থাকলেও যাবে!"

"আজ সকালে খুকু ভারি মজা করেছে। ক'দিন থেকে সেই ছড়াটা শুনছে,—'ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা, সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।' তার মধ্যে একটা লাইন আছে—'পায়রা জমায় সভা বক্‌বক্‌ বকমে।' আজ ভোর বেলা দেখি, খুকু আর তার বাবা বক্‌বক্‌ ক'রে আজে বাজে কথা বলছে। আমি বল্লুম, খুকু কী বলছ তোমরা? ও বল্লে, আমরা পায়রার মত বক্‌বকম করছি। আমার এত মজা লাগল, পায়রার ডাককে যে বক্‌বকম বলে, মানুষও যে সেই রকম অকারণ কথা বলে, বক্‌বকম করে, এত কথা চার পাঁচ দিন আগেও ওর সম্পূর্ণ অজানা ছিল। ওই ছড়াটা থেকে পেল পায়রা, পেল তাদের অকারণ বক্‌বকম, আর দিব্যি কথাটা ব্যবহার করল। আমি বেশ লক্ষ্য করি, একটা ছড়া বা কবিতা শুনল, তারপর তার কথাগুলো শিশুদের কেমন সহজে নিজের হ'য়ে যায়,—তাই ভাবছিলুম এতটুকু বয়স থেকে তো শুরু হোলো এবং চলবেও, তারপর হঠাৎ যখন বিশ একুশ বছর পরে 'রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত' হবার চেষ্টা করবে তখন ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে!"

উনি হেসে উঠলেন,—"তা বটে, একটু শক্ত হবে বৈকি। রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত, রবীন্দ্রোত্তর বা রবীন্‌-ধুত্তোর, অনেক কিছুই তো হ'তে হবে আধুনিক হ'তে হ'লে, বেচারা মুশকিলে পড়বে দেখছি।"

"সত্যিই আমি ভেবে পাইনে, প্রভাবমুক্ত হবার জন্য এরকম প্রাণপণ চেষ্টার দরকার কি? সহজে যদি কারও লেখা অন্যরকম হ'য়ে ওঠে, সে যদি সুশ্রাব্য হয়, ভালই তো। কিন্তু তার জন্য এত চেষ্টা এত বাড়াবাড়ি-রকম হৈ হৈ, কার লেখায় কত পার্সেণ্ট প্রভাব আছে, তা নিয়ে এত এনালিসিস্ কি দরকার? ভালো জিনিসের প্রভাবে ক্ষতি কি? মন্দের প্রভাব থেকে বাঁচাবার সে একটা কবচও তো বটে!"

"দেখ মাংপবী, তোমরা যদি একথা বল তাহ'লে লোকে বলবে, অন্ধ ভক্তিতে যারা অন্ধ, প্রভাবে যারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, এসব তাদের কথা।"

"সে তো নিশ্চয়ই, প্রভাবমুক্ত হবার আমরা তো পথ কিছুই দেখছি না। পাঁচ বছর বয়সে কথা ও কাহিনী থেকে শুরু হয়েছে, এখন তো 'সহজ পাঠ' থেকে শুরু করবে এরা।"

"আচ্ছা মিত্রা, কথা ও কাহিনীতে আমার একটা বাসবদত্তা ব'লে কবিতা আছে না? কাল দেখছিলুম কে একজন বাসবদত্তার উপর নাটক লিখেছেন, তখন মনে হচ্ছিল আমারও একটা আছে!"

"তাই নাকি, বাসবদত্তা ব'লে? মনে নেই তো!"

"মনে নেই? কোথায় যেন আছে।"

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত, নগরীর দীপ নিবেছে পবনে, দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে, নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত......" সমস্তটা বলা হ'য়ে গেল। যখন বলে চলেছি, চোখ মাটির দিকে নামিয়ে বসে আছেন, পা নাড়াচ্ছেন একটু একটু। থামলে বল্লেন—"এবার আমায় লজ্জা দিলে, একেবারে আগাগোড়া মুখস্থ? আমি আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলুম কবিতাটা জানো কি না। কি রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছি, মন্দ হয় নি তা বলতে হবে। তুমি যখন তোমার সুকুমার কণ্ঠে আবৃত্তি করছিলে, ভালো লাগছিল তা মানতেই হবে। আর একেবারে মুখস্থ?"

"দেখুন আর যাই করি, আপনার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে প্রশংসা শুনতে রাজী নই। 'অভিসার' কবিতাটা মুখস্থ বলা এমন কিছু নয়, ও অনেকেরই মুখস্থ আছে। বোধ হয় যাঁরা যাঁরা কবিতা পড়েন তাঁদের অধিকাংশই বলতে পারবেন।"

"এ তুমি বাড়িয়ে বলচ।"

"মোটেই নয়, আমার এত অবাক লাগে আপনি একেবারেই জানেন না, কি রকম ক'রে কতটা সবাই পড়ে আপনার লেখা। আপনি যখন হঠাৎ বলেন—গল্পগুচ্ছর গল্পগুলো বোধ হয় তোমাদের মনে নেই, তখন আমাদের কি রকম যে মজা লাগে।"

পঁচিশে বৈশাখ আসন্ন হ'য়ে এসেছে, আমরা ভাবছি কি করা যায়! এমন দিনে তিনি আমাদের কাছে আছেন, এ পরম দুর্লভ সৌভাগ্য তো বিনা উৎসবে ভোগ করা যায় না। অথচ এ তো একটা গভীর অরণ্য মাত্র, গ্রামও নয়। আছে এখানে জংলী পাহাড়ীর দল আর আছেন দু'তিন ঘর বাঙালী। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক হ'ল পাহাড়ীদের নিয়েই উৎসব করা হবে। অমিয়বাবু বল্লেন, "আমি জানি ওঁর ভাল লাগবে। মস্ত মস্ত হোমরা-চোমরাদের নিয়ে উৎসব তো ঢের হয়েছে, নগণ্যদের নিয়ে উৎসবের বিশেষত্ব আছে।"

জন্মদিন এগিয়ে এল, আয়াজন চলেছে, রথীদারা শীঘ্রই আসবেন, উনি খুশি হ'য়ে অপেক্ষা করে আছেন। পঁচিশে বৈশাখের দু'তিন দিন আগে একটা রবিবার এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হোলো। সকাল বেলা দশটার সময় স্নান ক'রে কালো জামা কালো রংএর জুতো প'রে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। উনি ঈশোপনিষদ্ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন দুপুর বেলা 'জন্মদিন' ব'লে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধ-বৃদ্ধের কথা ছিল। বিকেল বেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল—

আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী, সানাই বাজাতে লাগল, গেরুয়া রংএর জামার উপর মাল্য-চন্দনভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হ'য়ে দেখতে লাগল। ঠেলা চেয়ারে ক'রে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন ক'রে ফুল দিতে জানে তা আগে কখনো মনে করি নি। তিব্বতীরা পরালো 'খর্দা' গাছের সুতোয় বোনা স্কার্ফ, যা ওরা লামাদের পরায়। ফুলে প্রায় আবৃত হ'য়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে 'শিলাতলে' এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা শুরু করলে তাদের জংলী তাণ্ডব নাচ।

তারপর চালাটার নীচে সব সারি সারি বসে গেল পাতার ঠোঙা নিয়ে। উনি বল্লেন—তোমরা পরিবেশন কর। সমস্তক্ষণ বসে দেখতে লাগলেন, আমাদের ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, কে পায় নি, কাকে আর একবার দেওয়া দরকার।

সেদিন অনেক রাতে আমাদের সভা ভঙ্গ হোলো। ওষুধপত্র ঠিক ক'রে রাখতে গিয়েছি, দেখি তখনও জেগে আছেন। "কী, শরীরের অবস্থা কি রকম ?"

"কেন শরীরের আবার কী হবে ?"

"হবে না ? বাবা, আজ শেষ রাত থেকে যা চলছে। এখন নিদ্রা দাওগে যাও।"

"এমন দিনে যে আমাদের কাছে আপনাকে পাব, এ কখনো কল্পনা করি নি।"

"কল্পনাশক্তির অভাব একেই বলে।"

তার পরদিন সকাল বেলা আমরা সবাই পায়ের কাছে বসেছি। সুধাকান্ত বাবু প্রস্তুত হচ্ছেন—নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ তাঁকে জানাতে হবে।

"শোনো কালকের কবিতা। রয়ে গেল মংপুর একটা স্মৃতি :—

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে
লক্ষ কোটি নক্ষত্রের অগ্নি নির্ঝরের যেথা
নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে।

তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষতলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হ'তে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।

অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি,
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবস রাত্রি অবসানে
মন্থর গমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী,
অপূর্ব আলোকে,
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা,
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।

আমারও আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছি সূর্য প্রদক্ষিণ
যে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশিবর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

কবিতাটি পড়া হ'লে আমরা সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠলুম—'সাবিত্রী পৃথিবী' এই expressionটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তারপর দ্বিতীয় কবিতাটি পড়লেন।

"কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনা মন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহা মানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হ'তে,
নারায়ণী এ ধরণী
যার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ
যাহাতে প্রত্যক্ষ হ'ল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে,
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও॥"

৩

"অপরাহ্নে এসেছিল জন্ম বাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরী
নমস্কার সহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন ক্ষণে
প্রস্তর আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,
এই পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি—
সেই বর মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।"

পড়া হ'য়ে গেলে একটু পরে সুধাকান্তবাবু বল্লেন, "একটা খারাপ খবর আছে।"

"খারাপ খবর, কি খারাপ খবর? সুরেনের অসুখ বেড়েছে?"

"তিনি আর নেই। কালকেই খবর এসেছে, অত লোকজনের মধ্যে বলি নি।"

"তাহ'লে আর মাথা তুলতে পারতুম না।"

সবাই চলে গেলুম, স্তব্ধ হ'য়ে চোখ বুজে বসে রইলেন। আড়াল থেকে দেখলুম চোখ বুজে কষ্টে আত্মসংবরণ করছেন।

সমস্ত দিন নীরবে রইলেন, কিন্তু সব কাজই চলল। বিকেল বেলা 'মৃত্যু' ব'লে একটা কবিতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন— "জন্মদিন কবিতাগুলোর সঙ্গেই এটাও প্রবাসীতে যাক।"

সন্ধ্যেবেলা চুপ ক'রে বসেছিলেন। অন্ধকার বারান্দা, কী অসীম ধৈর্যে নীরবে বেদনা বহন করছিলেন, ওঁর মুখ দেখে বোঝা

যাচ্ছিল। একবার বল্লেন,—"কেউ জানল না সে কি আশ্চর্য মানুষ ছিল। এমন মহৎ, এমন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ সকলের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, অগোচরেই চলে গেল, যারা জানে শুধু তারাই বুঝবে—এমন হয় না, এমন দেখা যায় না।"...

একদিন দুপুর বেলা কথা উঠল এণ্ড্রুজ সাহেবের। তার অল্পদিন পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুধাকান্তবাবু দেশ পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আমার হাতে কাগজটা দিয়ে বল্লেন,—"পড়ে দেখ। ভালো লিখেছে, এমন ভাবে সমস্ত মানুষটি ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনে পড়তে লাগল তাকে। সকাল বেলা এসেই গুরুদেব ব'লে জড়িয়ে ধরত। কী অকৃত্রিম আশ্চর্য ভালবাসাই ছিল তার। কত করেছে আমাদের জন্য, অজস্র পরিশ্রম নিঃস্বার্থ নিষ্কামভাবে, অথচ তার জন্য এতটুকু গর্ব নেই। যথার্থ ক্রিশ্চান। অথচ প্রথম দিকে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ ওকে সন্দেহ করেছে কতরকম, সে সব কথা ওর কানেও গেছে। জলভরা চোখে শান্তিনিকেতনের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে।" বলতে বলতে ওঁর গলা ধরে এল, বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। "কেবল মনে পড়ে সেই লাল ধুলোয় ধূসর জামা কাপড় ধুতি খুলে খুলে পড়ছে, কোনোমতে সামলে চলেছে সন্ন্যাসী।"...

"মাতৃষসা একবাক্স পেনসিল উপহার দিয়েছেন আমার জন্মদিনে কিন্তু এ একেবারে নিঃস্বার্থ দান নয়। এর আবার একটা সর্ত আছে, একখানা ছবি এঁকে দিতে হবে।"

"হবে তো হবে, এখন আর সন্ধ্যেবেলায় আঁকে না, তার চেয়ে বাইরে চলুন।"

"মাসীকে ব'লে দেব তুমি সৎকার্যে বাধা দাও। ওই জানলাটা খুলে দাও, বড় গাছটা আঁকবো। তোমার ছবি এঁকে এঁকে অরুচি হ'য়ে গেল।"

"তার কারণ একটাও আমার মত হয় নি।"

"আমি যথার্থ আর্টিষ্ট কিনা, তাই হয় নি। তোমার ছবি দেখলে যদি আলুকে না মনে পড়ে তা'হলে আর হ'ল কি?

"আমি তো আলুবাবুর মতই দেখতে।"

"না না, অতটা আমিও বলতে পারি না, আমারও মুখে বাধে। ফস্ ক'রে তোমাকে সুধাকান্তবাবু বা আলুর মত দেখতে বলা, একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়।"

একটা প্রকাণ্ড কাগজ নিয়ে বসে chestnut গাছটার ছবি আঁকতে শুরু করলেন, আমি একটা ছুরি নিয়ে পেনসিল কাটতে শুরু করলুম। এত জোরে জোরে পেনসিল ঘষতেন যে দু'মিনিটের মধ্যে ক্ষয়ে যেত।

"আচ্ছা অকর্মা যা হোক, পেনসিলও কাটতে জান না? দাও দাও, একটা অন্য রং দাও?"

"কি রং?"

"আহা অত যদি বলতে হবে, তা'হলে আর কি সাহায্য হ'ল—?"

ছবি আঁকা চলেছে; এমন সময় কয়েকজন দেখা করতে এলেন। তাঁরা বল্লেন, "আপনি কালই যাচ্ছেন?"

"আবার আসবো কয়েকদিন পর—রথীরা এসেছেন, যাই কয়েক দিন ঘুরে আসি।"

"আবার আসবেন?"

"হ্যাঁ, সাত আট দিন পরই আসব,—আমার জিনিষপত্র কাপড় চোপড় সব রেখে যাচ্ছি। তোমরা লক্ষ্য রেখো, ইনি না সব বিক্রি ক'রে ফেলেন। বড়ো ভয়ে ভয়ে রেখে যাচ্ছি।"

ছবিটা শেষ হ'লে—'শ্রীমতী মাসী, পঁচিশে বৈশাখ' লিখে মাসীকে দিলেন। বল্লেন,—"তোমার হিংসে হচ্ছে?"

"অন্য কেউ হ'লে হ'ত, মাসীর সঙ্গে হয় না।"

"মেয়েদের যখন ঈর্ষা হয় না, তখন সে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা।"

"আমরা তো খুব খারাপ, ঈর্ষা দ্বেষে পরিপূর্ণ।"

"আহা, বোঝো না কেন, ঈর্ষা তো ভালোই। আমি ছবি এঁকে এঁকে সকলকে বিতরণ করছি, আর তোমার কোনো মনোবিকারই হচ্ছে না, এটা এমনই কি সুখবর?"

"চলার বড়ি বানাচ্ছি গো, চলার বড়ি। বুঝতে পারলে না? সব জিনিষের সংক্ষিপ্ত অস্তিত্ব হচ্ছে বড়ি ভাবে,—তা আমি এই চেয়ারে বসে বসে পা নাড়াচ্ছি, এতে বসে বসেই চলার কাজ হচ্ছে। তুমি যতক্ষণ ভাঁড়ার ঘরের রাজত্ব সামলাচ্ছিলে আমি ততক্ষণে দু'চার মাইল বেড়িয়ে এলুম এই চেয়ারে বসে। একে বলা যায় চলার বড়ি। যাক এখন একটা কথা আছে—

সমতট পরিহরি কতকাল মাংপবী,—
শৈল শিখর পরে লাম্ফবি ঝাম্ফবি?
যুগল মূরতি যেন গদ্যে ও পদ্যে
শ্যামলিম্ সিন্‌কোনা-কুঞ্জের মধ্যে।
নির্জন গিরি শিরে বিরচিলি চম্পূ*
তারেই কি নাম দিলি মংপু?

যাই হোক আপাতত তো কালিমপং চল। তোমার কর্তৃ-কারককে বলতে হবে। তা না হ'লে বৌমা বলবেন,—ওঁরা যদি একবারও না আসেন তাহ'লে আপনার আর যাওয়া চলবে না। আমাদের একটা মান-সম্মান আছে তো? তিনি হলেন কর্ত্রী, আমরা সবাই তাঁর অধীন। যদি এরকম বলেই বসেন, তখন তো আর আমার আসা হবে না।"

দুপুর বেলা কালিমপং থেকে গাড়ী আসবে, সকাল থেকেই তৈরি হ'য়ে বসে আছেন। আমরা খুব রাগ করলাম।—"বেশ যা হোক, যাবেনই তো, কিন্তু এত তাড়া কেন? আমাদের কাছ

* গদ্যে ও পদ্যে মেশানো সংস্কৃত কাব্য।

থেকে যেতে যদি এতই আনন্দ হয়, তাও তো ভদ্রতা ক'রেও একটু চেপে যেতে হয়।"

"ভদ্রে, চাপবার চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পেরে উঠছি নে,'এত আনন্দ! ··যাও কোথায়? চুপ ক'রে এইখানে বোসো। মাটিতে কেন, ওই তো তোমার দোষ!" গান গেয়ে উঠলেন,—"কেন ধরে রাখা ওযে যাবে চলে···মন খারাপ কেন করবে? যেতে তো একদিন হবেই। তাই তো তোমার মাকে বলছিলুম, অভিমন্যুর যেমন ব্যূহতে শুধু প্রবেশের পথ ছিল, মংপুতেও তেমনি একমাত্র প্রবেশেরই পথ আছে। হঠাৎ কোনোরকমে একটা টেলিগ্রাম না এসে পড়লে আর ছাড়া পাবার উপায় নেই।"

"কে আপনাকে যেতে বাধা দেয়?"

"তাই তো, আমি গেলে কত আরাম, খরচ কত কমে! তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান তারপরে যাই চলে, তুমি ভুলে যেও এ রজনী, রজনী ভোর হ'লে!"

মাসী বল্লে—"আপনাকে আর নিষ্ঠুরের মত গান করতে হবে না।"

"এ বুঝি নিষ্ঠুর? তোমরা নিজেরাই নিজেদের উপর নিষ্ঠুরতা কর। কেন দুঃখ পাবে? যাওয়া আসা এই তো নিয়ম, সহজে inevitable-কে মেনে নিতে হবে। সময় হ'লে যেতে তো হবেই তখন কি করবে? তখন ইনি কি কাণ্ডটা করবেন, সেটা বুঝি নিজের প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়! খুব অন্যায়। সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

গৃহকর্তা এসে বল্লেন—"এখন পঁচিশে বৈশাখের জন্য রেডিওতে স্পেশাল প্রোগ্রাম দেবে।" ওঁর চেয়ারটা রেডিওর খুব কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল।—বাবু একটা প্রবন্ধ পড়ছিলেন।

"আজকাল বাংলা ভাষার কত যে উন্নতি হয়েছে, অনেকেই মোটামুটি লেখে ভাল। তবে এর অর্ধেকের ওপরই তো আমার কোটেশন, রবি ঠাকুরের লেখা বল্লেও চলে।"

দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিনিসপত্র সব আগেই চলে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের চাইনিজ্ আর্টিষ্টরা এসে পড়ায় একটু বিলম্ব হ'ল রওনা হ'তে।

তখন বেলা পড়ে এসেছে, ওঁরা চলে গেলেন। বাড়িতে কী অসীম শূন্যতা, মনও কি রকম খালি হ'য়ে যায়। সবাই চুপ ক'রে বসে রইলুম। মনে পড়তে লাগল,—"ভুলে যেও এ রজনী, রজনী ভোর হ'লে।" আমাদের জীবনে এ ভোলার মতই ঘটনা বটে! তবুও আজ মনে হয়, তিনি যে এখন আর আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কোথাও নেই, আর যে কখনো হাসিমুখে তেমনি অপূর্ব আনন্দে আনন্দিত ক'রে আমাদের মাঝখানে দাঁড়াবেন না, এই গভীর বেদনা-দায়ক ক্ষতি কি ক'রে আমরা সহ্য করছি! তিনি না হ'লেও জীবন চলে, কিন্তু তাঁকে পেলে যে কি আনন্দে উচ্ছলিত হ'তে হ'তে জীবনের স্রোত ঝরনার মত নেচে চলে,—সে যাঁরা তাঁকে দেখেন নি তাঁদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হবে না। যদিও কালধর্মে হয় তো আজ যেমন ক'রে মনে পড়ছে এমন ক'রে পরে মনে পড়বে না,—কিন্তু তবু একদিন তিনি আমাদের জীবনে এসেছিলেন ব'লেই এমন মধুর এমন রমণীয় হ'য়ে উঠেছিল যে দিনগুলি, তারা জীবনের প্রধান সঞ্চয় হ'য়ে থাকবে।

মনে পড়ে একদিন একটি ছোট মেয়েকে 'ছবি' কবিতাটা শোনাচ্ছিলেন। বোঝাতে বোঝাতে বল্লেন—"একবার এলাহাবাদে সত্যর ঘরে পুরানো জিনিসপত্র কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ছবিখানি পেলুম, হঠাৎ ছবিখানা দেখে মনে হ'ল, কি আশ্চর্য। এই কিছুদিন আগে যে আমাদের মাঝখানে এত সত্য হ'য়ে, জীবনে এতখানি হ'য়ে ছিল, আজ সে কত দূরে দাঁড়িয়ে আছে! আমাদের জীবন ছুটে চলেছে, কিন্তু সে থেমে গেছে ঐখানে। কতটুকুই বা আর তাকে মনে পড়ে? কিন্তু তবু—তোমারে কি গিয়েছিনু ভুলে? ভুলেছি বটে, কিন্তু সে ভোলা কি রকম? তুমি আমার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হ'য়ে আছ ব'লেই সর্বদা তোমাকে মনে করতে হয়

না। যেমন আমাদের যে চোখ আছে, সে কথা কি আমরা সর্বদা মনে করি—যে আমাদের চোখ আছে, চোখ আছে? তবু চোখ আছে ব'লেই তো আমরা দেখতে পাই। তেমনি সর্বদা মনে করিনে বটে যে তুমি ছিলে, তুমি ছিলে,—কিন্তু জীবনের মূলে তুমি আছ ব'লেই, তুমি একদিন এসেছিলে ব'লেই আমার ভুবন এত আনন্দময়, আমার জীবনে এত মাধুর্য।"

"তোমারে কি গিয়েছিনু ভুলে।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্য মনে চলি পথে ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা
তবুও তাহারা
প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু করে সুমধুর
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।"

একদিন তাঁর যে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ ছিল, আমাদের জীবনে তা চিরদিন অসীম মাধুর্য বিস্তার করবে; কিন্তু তিনিও যে হৃদয়ে আমাদের স্থান দিয়েছিলেন, তাঁর ক্লান্ত রোগশয্যা থেকেও মংপুর কথা বারবার স্মরণ করতেন, সেই দুর্লভতম সৌভাগ্য প্রতিদিন হৃদয়ে লালন করছি। তিনি লিখেছিলেন—

মিত্রা,

মনে পড়ে শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটীর
হিমাদ্রি যেখানে তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে
নিশ্চল সবুজ বন্যা, নিবিড় নৈঃশব্দে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয় ঘোষণার কালে
অন্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্ব জীবনের

সগুস্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণের আদিম সূচনায়।
সহসা নাম-না-জানা পাখীদের চকিত পাখায়
চিন্তা মোর যেত ভেসে
শুভ্র হিম রেখাঙ্কিত মহা নিরুদ্দেশে।
বেলা যেত, লোকালয়
তুলিত ত্বরিত করি, সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়।
গিরি গাত্রে পথ গেছে বেঁকে,
বোঝা বহি' চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে
পর্বতী জনতা
বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে
রেখা রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে, অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে
কর্মের দৌত্য সে করে
প্রহরে প্রহরে।
প্রথম আলোর স্পর্শ লাগে
আতিথ্যের সখ্য জাগে
ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে
নানারঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে
গৃহিণীর যত্ন বহি' প্রকৃতির লিপি নিয়ে আসে
আকাশে বাতাসে
কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা,
যুগ যুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা।

উদয়ন
২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১
বিকাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া

অনন্তে ধরিয়া।······

নাই সময়ের পদধ্বনি

নিরস্ত মুহূর্ত স্থির দণ্ডপল কিছুই না গণি।

নাই আলো নাই অন্ধকার

আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।

··· ··· ···

তোমাতে সমস্ত লীন তুমি আছ একা

আমি হীন চিত্ত মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

পঞ্চম পর্ব

আমাদের সেই সুখ স্বর্গের পঞ্চম অঙ্ক পূর্ববর্তী চারিটি পর্বের সঙ্গে এত দিন যোগ করি নি। সেখানে যবনিকা পড়ল জীবনের উজ্জ্বলতম অংশকে আড়াল করে। কবি বলতেন 'জীবনের পালা বদল'—একটার পর একটা পালা, তাতে পাত্র পাত্রী পৃথক, সুখ দুঃখের চেহারা আলাদা। এমনি করে চলতে চলতে তার পরে চরম যবনিকার ওপারে একেবারে নূতন নাট্যে প্রবেশ।

মংপুর বাইশ বছরের জীবনে এ পুণ্য সঙ্গের চার বছরের জীবনোৎসব, সে অধ্যায়ের ছেদ পড়ল পঞ্চম অঙ্কে। এ অঙ্ক তাই সুখের নয়। এর পরের একটি বছরের করুণ দীর্ঘশ্বাস ভুলতেই চেষ্টা করেছি বরাবর। বিশেষ তাঁর স্মৃতির দীপ মহোৎসবের উজ্জ্বল সমারোহেই জ্বালাতে চেয়েছি—তার শেষ শিখার ছায়াটুকু মুছে ফেলে। কারণ দীর্ঘদিন—যখন স্নেহের বেদনা ছিল তীব্র, তখন সেই শোকাহত স্মৃতির মধ্যে নিজের পক্ষেও প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য।

আজ পনের বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে এল। মৃত্যুশোকের তীব্রতা হ্রাস হয়ে এসেছে। গুরুদেবের সেই কথার সত্যতা অনুভব করছি, 'মৃত্যু সে মরে মরে আপনাকেই মারছে। আপনাকেই সরাচ্ছে।' বিচ্ছেদ বেদনাকে পরমরমণীয় করে তোলবার মধুর মন্ত্র তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে জীবনে এসে পৌঁছচ্ছে—আজ তাই তাঁর সঙ্গে চির-বিচ্ছেদের দিনগুলির স্মরণে কোনো ভয়াবহতা নেই—সে যেন সন্ধ্যার দিগন্ত-প্রসারী অস্তরাগের মত ছড়িয়ে আছে সমস্ত সত্তার উপরে—আসন্ন রাত্রির জন্য উদ্বেগ তাতে নেই—আছে শুধু এক বিষাদমগ্ন আনন্দ স্বাদ! মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়—নহে বিচ্ছেদের ভয় শুধু সমাপন।

গত গ্রীষ্মে যখন পঁচিশে বৈশাখের উৎসব শেষ করে কবি কালিমপং ফিরলেন, ফেলে রেখে গেলেন প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস। গচ্ছিত রইল গরম কাপড় দু বাক্স—বল্লেন বার বার, এই বোঝা বয়ে নিয়ে আসবার দরকার নেই, ফিরবই তো আবার কালিমপং থেকে। অবশ্য সেবার কালিমপং থেকেই সোজা কলকাতায় চলে যেতে হল আর মংপু ফেরা হল না। কিন্তু গরম কাপড়ের বাক্স তাঁর সাজান ঘরের এক পাশে রইল সেপ্টেম্বরের প্রত্যাশায়। আগষ্ট মাসে সমাবর্তন উৎসব হল—যখন অক্সফোর্ডের ডিগ্রী দিতে এল সদলবলে বিদ্বৎ সমাজ, আমায় লিখলেন—"আমার পরিত্যক্ত বেশবাস আমার কাছে পাঠাবার জন্যে জোড়াসাঁকোর ভোলানাথ বাবুর উপরে ভার দিতে পার। সব চেয়ে সন্তোষের বিষয় হবে যদি সেগুলি হাতে করে আনতে পারো। যদি অসম্ভব হয় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও তার ক্ষতি আমি অনুভব করব না। অভাবের উপলব্ধি যে কতটা আপেক্ষিক সে সম্বন্ধে তুমি যদি মনস্তত্ত্ব-মূলক একটা প্রবন্ধ লিখতে পারো সেটা অভিনিবেশ পূর্বক আলোচনার যোগ্য হতে পারবে। কোনো কিছু লেখবার মতো অবস্থা আমার নয়। ইতি ৮ শ্রাবণ ১৩৪৭। স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ।"

এরই ঠিক এক বছর পরের ২২শে শ্রাবণ তাঁর তিরোধান দিবস। সে কথা তখন কিছুই আশঙ্কা করতে পারিনি। গরম কাপড় শান্তিনিকেতনে ফিরল না। ব্যবস্থা পাকা হল মাসখানেক পরে মংপু আসবেন,—যখন সেখানে সবে শীতের আমেজ লাগে মেঘমুক্ত আকাশে, যখন প্রথম ঘরের কোণে মোটা মোটা জংলি কাঠে 'লগ ফায়ার' জ্বলে বিলিতি ছবির দৃশ্যগুলি মনে পড়িয়ে, আর যখন চেরী ফুল ফোটে বনের পীত বসনের মাঝে মাঝে গোলাপী ছোপ লাগিয়ে।

প্রতিদিন অপেক্ষা করে আছি আজ হয়ত সঠিক খবর আসবে। সকাল হয় একটি মধুর আশা নিয়ে আজ হয়ত চিঠি পাব, কবে

আসবেন সে সংবাদ বহন করে। এমন সময় আমার মা জানালেন—"গুরুদেব মংপু যাবার পথে শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোয় এসেছেন জেনে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে মীরাদেবীও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সামনেই ডাক্তার রায় কবিকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর মতে ওঁর এখন পাহাড়ে যাওয়া উচিত নয়। সকলেই তাঁকে পাহাড়ে যেতে নিষেধ করছে কিন্তু তিনি বোধহয় তা শুনবেন না। বলছেন, মংপু যাব যখন স্থির করেছি তখন যাবই, তাছাড়া তারা কত আশা করে আছে। অতএব আমরা মনে করি, তুমি অবিলম্বে তাঁকে বারণ করে লিখবে। আমরা অবশ্য কিছু বলতে পারি নি।" যে কারণে মা কিছু বলতে পারেন নি সেই কারণেই ইতস্তত করে আমার দু এক দিন দেরি হল। তাছাড়া আমিও জানতুম যা তিনি স্থির করেছেন তা করবেন নিশ্চয়। এমন সময় হঠাৎ কালিমপং থেকে চিঠি পেলুম—

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মিত্রা

শরীর খারাপ। ডাক্তার এখানে আসতে নিষেধ করেছিলেন—কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় সমতট অত্যন্ত অসহ্য। শরীরের দুর্লক্ষণের না উপশম হওয়া পর্যন্ত নির্ডাক্তার দেশে যাওয়া নিরাপদ নয়। তুমি যদি আসতে পার খুসি হব। আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে। গল্পটাও শোনাবার অবকাশ হবে। দুটো গরম জামা এবং লুঙি শীত বস্ত্ররূপে আমাকে দান করলে পুণ্যভাগিনী হবে—যদিও যথেষ্ট কাপড় আছে, যথেষ্ট ঠাণ্ডাও লাগচে না। লেখাপড়া দুই বন্ধ করে জীবন্মৃত অবস্থায় আছি।

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

ঈষৎ নিরাশ হলেও মনে মনে সান্ত্বনা পেলুম, এত কাছে যখন এসেছেন একটু সুস্থ হয়েই আমার ঘরে আসবেন। দু'তিন দিনের মত ব্যবস্থা করে আমি চার বছরের মিঠুয়াকে নিয়ে কালিমপং রওনা হলুম। বাড়ি পৌঁছবার আগেই পথে মহাদেবের সঙ্গে দেখা—একটি খালি ওষুধের বোতল নিয়ে চলেছে।

"এসে পড়েছেন ভালো হয়েছে, বাবামশায়ের শরীরটা ভালো নেই।"

যতদিন তিনি আমাদের মাঝখানে ছিলেন ততদিন প্রাণরসে এমন পূর্ণ ছিলেন—অজর চিত্তের প্রভায় এমন উজ্জ্বল ছিলেন যে, তাঁর যে বয়স আশীর কাছে পৌঁছেছে এবং যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে তা হয়ত কারো মনেই থাকত না। সেজন্যই খুব সম্ভবত এরকম অরক্ষিত অবস্থায় দু'একজন ভৃত্য মাত্র সম্বল করে অসুস্থ প্রতিমাদেবীর কাছে কালিমপংএ আসতে বাধা পান নি। রথীন্দ্রনাথ গিয়েছেন পতিসরে জমিদারীতে। প্রতিমাদেবী আছেন ভৃত্যবাহিনী নিয়ে কালিমপংএ। উপযুক্ত রক্ষক সেখানে কেউ নেই।

কালিমপংএ গৌরীপুর ভবন বিরাট অট্টালিকা। কিন্তু পাহাড়ে' দেশের মত কাঠের নয়—বেশির ভাগ সিমেন্টের, তাই একটু ঠাণ্ডা। ঘরে ঢুকে দেখি ক্লান্ত শরীর এলিয়ে বসে আছেন। আমার সঙ্গে আমার সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা-উত্তীর্ণা ভাগ্নী রেণু ছিল। তাকে দেখে ঈষৎ হেসে বল্লেন, "তোমাদের বিদ্যার কথা শুনলে ভয় করে—আমি তো ম্যাট্রিক পাস করতে পারি নি।"

সেই সময়ে 'ল্যাবরেটরি' গল্পটা সবে লেখা শেষ হয়েছে— "একটা গল্প লিখেছি, ইচ্ছা ছিল তোমাকে পড়ে শোনাব। কিন্তু সে আর হবে না।"

"কেন হবে না? আজ শরীরটা ক্লান্ত আছে—কাল কি পরশু হবে—আমি তো এখন রইলুম।"

"সে আর হবে না। তার চেয়ে এসো তোমাকে কয়েকটা কবিতা শোনাই।"

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজল। সবাই বসেছি খাবার টেবিলে এমন সময় মহাদেব দৌড়ে এল—"বাবামশায় ডাকছেন—"

"তোমরাও কিন্তু সব সময় শুনতে পাওনা। আমি চৌকি থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলুম।"

"সে কি, পড়ে গেলেন ?"

"হাঁ, পতন হল। অধঃপতন থেকে রক্ষা করবার জন্য তোমরা তো কেউ ছিলে না।"

তখন বসবার ঘরের চৌকি থেকে শোবার খাটে এসে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছেন। খাটে বালিশে পিঠ দিয়ে বসাই তাঁর বরাবর অভ্যাস ছিল। রাত্রেও ঐ ভাবেই অনেক সময় বিশ্রাম করতেন। ইদানীং চলা ফেরা করতে গেলে বার্ধক্যে ন্যুব্জ দীর্ঘদেহ টলমল করতই। তিন চার বার পড়েও গিয়েছিলেন, কাজেই এখনও সেটা কোনো বিশেষ অসুস্থতার লক্ষণ বলে মনে করলুম না। মৃদু হেসে বল্লেন—"তুমি আমার নতুন গল্পটা এইখানে স্থির হয়ে বসে পড়। তুমি তো কাব্যরসিকা, তোমার মতামত চাই। আমি যদি পড়ে শোনাতে পারতুম তাহ'লে ভালো লাগাতে পারতুম। কিন্তু সে আর হয়ে উঠবে না। তাই নিজেই পড়ে দেখো। যদি অশ্লীলতা দোষ পাও তাহ'লে রুষ্ট হয়ো না। হে আদর্শবাদিনি, ওর ভিতরের আদর্শটি খুঁজে দেখো।"

আমি গল্পর খাতা নিয়ে বসলুম। দুপুর গড়িয়ে গেল। কবি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে দু-একবার ওঠবার চেষ্টা করাতে বনমালী ও আমরা ধরে নিয়ে গেলুম। কিন্তু সেই সম্পূর্ণ নীরবতা ও তন্দ্রার ঘোর যে রোগের পদক্ষেপ তা বুঝতে সময় লাগল।

বিকেল বেলা কালিমপং-এর একমাত্র বাঙালী ডাক্তার এলেন। সকালে তিনিই ওষুধ দিয়েছিলেন। ততক্ষণে দেখছি শরীর তাঁর

বেশ এলিয়ে পড়েছে, উঠতে গেলে নিজের ভার রাখতে পারছেন না। আচ্ছন্নভাবে যেন একটা কিসের ঘোরে আছেন। আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা তাও বুঝতে পারছি না। যদিও দেখছি, ভিতরে জ্ঞান আছে, দরকার মত ওঠবার চেষ্টা করছেন।

"ডাক্তারবাবু, উনি শরীরের ভার রাখতে পারছেন না কেন ?"

"সারাদিন তো কিছু খান নি তাই তুর্বল হয়ে পড়েছেন।"

একথা আমার বিশ্বাস্য বোধ হল না। এক দিনের উপবাসে এমন তুর্বলতা আসতে পারে না। তখনও অবশ্য কিছুই বুঝতে পারিনি যে ভিতরে যে বিষম রোগের জড় আছে তাই মূল বিস্তার করেছে। এই আচ্ছন্নভাব রোগের বিষক্রিয়ায়—এর নাম কোমা।

রাত্রে প্রতিমাদিরও জ্বর উঠল। তখন সেপ্টেম্বর মাস, পাহাড়ে' হাওয়ায় প্রথম ঠাণ্ডার আমেজ লেগেছে—মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিঝুম ঘুমন্ত—খাটের এক পাশে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে বসে আছি। তাকিয়ে আছি তন্দ্রাচ্ছন্ন নিঃসাড় মহাপুরুষের দিকে। তখন রাত্রি প্রায় তুটো বাজে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চারিদিকে দেখলেন—আমায় ভূমিশয্যায় দেখে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, "এসেছিলে কাব্যচর্চা করতে, পড়ে গেলে রোগ পরিচর্যায়। এখন সেখানে কি হবে ?"

"আমি তো কিছুদিন থাকব বলে এসেছি।"

"সকালে উঠেই পালাবে না তো তাহ'লে ?" হাতের ইসারা করে দেখালেন—"দৌড় !"

আবার ফিরে গেলেন সেই মহা অচৈতন্যে—অশুভ রাত্রি একভাবে প্রভাত হয়ে এল। প্রতিমাদি বল্লেন, আমার বিশ্বাস এ ওঁর পুরানো রোগের আক্রমণ। অজীর্ণ বা অন্য কিছু নয়—।

সকালবেলা কালিমপং হাসপাতালের ছোকরা সাহেব ডাক্তার এসে দেখে গেলেন। ওষুধ পথ্য সম্বন্ধে নূতন কোন নির্দেশ পাওয়া গেল না। প্রতিমাদেবী চিন্তিত হয়ে পড়লেন—নির্ভর যোগ্য

কোন পুরুষ সহায় নেই, মংপুও পঁচিশ মাইল দূর। আর সেই পাণ্ডববর্জিত দেশে তখন টেলিফোনেও যোগ ছিল না, টেলিগ্রাম অফিসও ছিল সাত মাইল দূরে রিয়াং ষ্টেশনে। যান-বাহনও যাতায়াত করে না। ডাকের ব্যবস্থা প্রাগৈতিহাসিক, ডাক্তার সেনের কাছে চিঠি দিয়ে একজন লোক পাঠিয়ে দিলুম। সে লোক পঁচিশ মাইল হেঁটে চিঠি নিয়ে যাবে। তারপর চল্ল কলকাতায় টেলিফোন করবার জন্য ধস্তাধস্তি। পোস্ট অফিস থেকে ট্রাঙ্ককল করবার ব্যবস্থা। দু-তিন ঘণ্টার চেষ্টায় খবর দেওয়া গেল। রথীন্দ্র-নাথ পতিসরের জমিদারীতে, প্রতিমাদেবীর নির্দেশ অনুসারে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীযুক্ত মহলানবিশকে বরাহনগরে খরর দিতে বলে দিলুম। বেলা বারটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখি রোগের অবস্থা আরো জটিল। প্রতিমাদেবী বল্লেন,—'ভালো ঠেকছে না মৈত্রেয়ী।' ডাক্তার দাশগুপ্ত বসেই ছিলেন, বিমর্ষ মুখে বল্লেন—"ক্রেগ আসতে চাচ্ছে না। তাকে একবার আনতে পারলে হত।"

সাহেব মিশনারী হাসপাতালের মাইনে করা ডাক্তার। তার বাড়ি গৌরীপুর ভবন থেকে অনেক দূর। বাজার পার হয়ে একটু উঁচু পাহাড়ের গায়ে মিশনারীদের ঐ হাসপাতাল সামান্য সরকারী সাহায্য পায়। এ ছাড়া অত লোকের বসতি ও স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছুই নেই। হাসপাতালের এলাকা পার হয়ে ডাক্তারের সাজান সুন্দর বাড়ি—বাগান ঘেরা। বিপর্যস্ত মন নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে পৌঁছলুম—সেদিনকার অনুভূতি আজও মনে করতে পারি।

আকাশে সাদা কালো মেঘেরা ঢেউ তুলে ভেসে চলেছে—ইউক্লিপ্টাসের পাতা সেই আকাশের পটের উপর ঝির ঝির করছে। টানা বারান্দায় বেতের কুশন লাগান সারি সারি চৌকি সাজান। একটা আধবোনা উলের জামা পড়ে আছে, দেখে বোঝা যায় কর্ত্রী এখনই বুনতে বুনতে উঠে গেছেন—চারিদিকে সব সুস্থ

স্বাভাবিক, সুন্দর, শুধু আমার উদ্বিগ্ন বিপন্ন মন থর থর করে কাঁপছে। কানে প্রতিমাদেবীর কথাটা বাজছে—মৈত্রেয়ী লক্ষণ ভালো নয়—

"বেয়ারা বেয়ারা"—

ভিতরে জুতোর শব্দের সঙ্গে শিষ শোনা গেল। সাহেব পৌঁছবার আগেই তার কুকুর এসে আমায় প্রদক্ষিণ করে শুঁকতে লাগল। ডাক্তার বেরিয়ে এলো, সুশ্রী চেহারা, অল্পবয়সী ছোকরা, আমাকে দেখে ঈষৎ বিস্মিত সপ্রশ্ন ভঙ্গী করলে—ভাবটা—what can I do for you ?

তাকে বুঝিয়ে বল্লুম, সকালে যে অবস্থা দেখে এসেছ এখন তার চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে, একবার যেতে হবে।

"আমার পক্ষে যাওয়া এখন অসম্ভব, আমার এখন হাসপাতালে কাজ আছে।"

"কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ কার জীবন সঙ্কটাপন্ন ?"

"আমি ডাক্তার। আমার কাছে সবাই সমান। হাসপাতালে ডেলিভারী কেস আছে একটি কুলী মেয়ের, তাকে ফেলে যেতে পারব না।"

"ও, তা তুমি তো এখন বাড়িতেই আছ, এই সময়টুকু চল।"

"অসম্ভব। আমার এখান থেকে নড়বার উপায় নেই।"

"কোনো সাহায্য করবে না ?"

"তোমরা কোনোরকমে ওঁকে perspire করাও—কম্বল চাপা দিয়ে ধরে থাক, ঘাম হলে আরাম হতে পারে—"

"কিন্তু তাতে কোনো strain হবে না ? distress কমবে ? পালস দেখবে কে ? কোলাপস করবার ভয় নেই ?"

"ভয় আছে বৈকি—কিন্তু আমি আর কি করব ?"

উত্তপ্ত মনকে বহু কষ্টে সংযত করে বল্লুম, "তুমি ডাক্তার, তুমি এই রুগীর ভার নিয়েছ, এখন তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে না ?"

"তোমার ধারণা ভুল। এ কেস আমি হাতে নিই নি। দাশ-গুপ্তর কেস। আমি তাঁর অনুরোধে একটু দেখতে গিয়েছিলুম মাত্র। আর আমি যাব না।"

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, নিজের নিরুপায় অবস্থাটা সব রাগ তেজ নিবিয়ে দিল। বুকের ভিতর ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল একটি কথা—উপায় কি! উপায় কি! এই একটা বেয়াড়া দুর্ধর্ষ জিদী লোক, তাকে কী করে বাগে আনবো! অথচ ও ডাক্তার, হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারে—হয়ত এখনও প্রাণ রক্ষাও করতে পারে। শেষটায় আমাদের চোখের সামনে সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় আজই এই পরম প্রিয় অমূল্য প্রাণ যাবে? আমি মান সম্মান বিসর্জন দিয়ে সেই উদ্ধত বিমুখ বিজাতীয় পরপুরুষের পায়ের কাছে বসে পড়ে অশ্রুপাত করতে লাগলুম—"oh! I beg you on my knees!" সাহেব উঠে পড়ে পায়চারী করতে লাগল। লম্বা বারান্দায় তার চিন্তিত ঈষৎ বিচলিত পদধ্বনি আমায় একটু আশ্বস্ত করলো। খানিকটা পরে দেখি অপ্রস্তুতভাবে এসে দাঁড়িয়েছে—Madam, please get up—তুমি এক কাজ কর, দার্জিলিংএ সিবিল সার্জেন আছেন ডাঃ ফ—খুব ভাল সার্জেন—তাঁকে ফোনে ডাক—আজ যদি এখনই এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয় সন্ধ্যা নাগাদ এসে পৌঁছবেন। এই সব চেয়ে ভালো হবে।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত উনি বাঁচবেন তো?"

"খুব সম্ভব একভাবেই থাকবেন। আর এ ছাড়া উপায় কিছু নেই। তুমি রুগীর কাছে চলে যাও, আমিই রোগের অবস্থা বুঝিয়ে টেলিফোনে খবর দিচ্ছি। সন্ধ্যার মধ্যেই খুব বড় ডাক্তার তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবেন।"

"ধন্যবাদ ধন্যবাদ"—

তখন ডাক্তার ফ-র নাম বা অস্তিত্ব কিছু জানতুম না। পরে জেনেছিলুম তিনি নামকরা সার্জেন বটে। ক্রেগ শেষ পর্যন্ত ঐটুকু উপকার করেছিল।

বাড়ি ফিরে দেখি প্রতিমাদি অসুস্থ শরীরে বৃদ্ধ ভৃত্য বনমালীর সাহায্যে রোগী পরিচর্যায় রয়েছেন। সেই দীর্ঘ বিরাট অচৈতন্য দেহ নাড়াচাড়া করায় শক্তি দরকার—। সেই দুঃসময়ে ঈশ্বর প্রতিমাদেবীর দুর্বল দেহে বল দিয়েছিলেন, মনে অসীম শক্তি দিয়েছিলেন।

আকাশে তখন ঘোর দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। বজ্র বিদ্যুতের কড়কড়ানি আর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে মনের অন্ধকার আরো গভীর করে তোলে। মনে জোর করে ভাবতে লাগলুম, যা করণীয় সবই হয়েছে—কলকাতায় খবর দেওয়া হয়েছে, মংপুতেও লোক গেছে, এ জেলার সব চেয়ে বড় ডাক্তারকেও খবর দেওয়া হল। আর কিছুই করবার নেই, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া। বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত সেই অপেক্ষা চলল।

রোগশয্যার পাশে নির্নিমেষ তাকিয়ে বসে আছি, রুগীর দেহে কোনো সাড়া নেই—নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়ছে, মাঝে মাঝে পা একটু নড়ছে, চোখ বন্ধ—জীবন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের আত্মার আত্মীয়—বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতিতে যেন বিসর্জনের বাজনা বাজছে। প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ আকাশে বাতাসে গাছের মাতামাতিতে তাণ্ডব। ভিতরে আবছা অন্ধকারে মৃত্যুময় স্তব্ধতা—শুধু ঘড়ি বাজছে টিক টিক টিক। একএকটি মুহূর্তে আছে অনন্তের অনুভূতি—সীমাহীন সময় তার সমস্ত পরিমাপের গণ্ডি লুপ্ত করে মনকে নিয়ে গেছে কূলহারা সমুদ্রে। এ ঝড় যে থামবে এ রাত্রি যে শেষ হবে সুপ্রভাতের প্রসন্নতায় আবার যে কখনো পাওয়া যাবে জীবনের আনন্দ বাণী সে আশ্বাস কোথাও নেই। ছিন্নপাল তরণীর মত আমাদের বিভ্রান্ত মন নানা চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে, তাকিয়ে আছে বন্ধ জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিকে।

জানি রাস্তা ভাঙবে, স্লিপ হবে, ডাক্তার এসে পৌঁছতে পারলে হয়—প্রতিমাদি বল্লেন, শিলিগুড়ির রাস্তায় যদি স্লিপ হয় তাহলে

তো কলকাতা থেকেও কেউ এসে পৌঁছতে পারবেন না। কালিম্পং যে কি রকম বিযুক্ত হয়ে যেতে পারে তাতো সকলেই জানি। ঘনীভূত অন্ধকারে বেদনায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রইলুম দুই নিরুপায় নারী।

সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে পাহাড়ে চড়াই ওঠার গীয়ারের গর্জন শোনা গেল। ডাক্তারের গাড়ির শব্দই বটে। লম্বা চওড়া বেশ তেজী জোয়ান ইংরেজ পুরুষ লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে এগিয়ে এলেন। তাঁর ভঙ্গী দ্রুত; মেজাজ ইম্পিরীয়াল। সঙ্গে সঙ্গে কোনো ক্রমে তাল ফেলে চলতে লাগলেন আমাদের শীর্ণকায় ভালমানুষ নিতান্ত বাঙালী ডাক্তার দাশগুপ্ত, রোগের অবস্থা বলবার চেষ্টা করতে করতে।

ডাক্তার ফ—রোগ শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বুকের কাপড় সরিয়ে পরীক্ষা করলেন, পায়ের ফোলা অনুভব করে দেখলেন, নাড়ী ধরলেন, আশী বছরের পুরাতন দেহে চামড়া এতটুকু কুঞ্চিত নয়—মসৃণ সুন্দর পেলব অথচ দৃঢ় সেই শালপ্রাংশু, ব্যূঢ়োরোস্ক দেহের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়পূর্ণ একটু হেসে বল্লেন, 'what a wonderful body।'

'Put out your tongue'! আচ্ছন্ন চেতনায় এ কথা প্রবেশ করল না। আবার নীচু হয়ে জোরে জোরে দুবার বল্লেন—put out your tongue please—কোনো উত্তর নেই। আমি কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে পরিষ্কার করে বল্লুম—"আপনার জিভ পরীক্ষা করবেন,"—আমার কথা শুনতে পেলেন। ডাক্তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল—"Does he speak English—!" এই অদ্ভুত প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে বলে ফেল্লুম—"perhaps better than you do।" ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদের সমাজ, জীবন ও

জাতি সম্বন্ধে যে কত অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল তা সেবার দুটি ডাক্তারের সংস্পর্শে এসে বেশ বুঝেছিলুম।

ডাক্তার ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল—"তোমরা এ রুগীকে এখনও হাসপাতালে রিমুভ কর নি কেন?"

আমি ও ডাঃ দাশগুপ্ত চোখাচোখি করলাম। ঐ হাসপাতালে নিয়ে যাবে! তাহলেই হয়েছে। ছারপোকাতেই মেরে ফেলবে। চারিদিকের চা বাগানে এমন কি মংপুর সরকারী কুইনাইন চাষ ক্ষেত্রেও চিকিৎসার ব্যবস্থা একেবারেই আদিম অবস্থায় ছিল। এক একটি সাব অ্যাসিস্টেন্ট সার্জনের উপর চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল এলাকার সব ভার—তাদের বিদ্যাতেও মর্চে পড়া, হাতেও হাতিয়ার নেই—খড়ো কুঁড়েতে দুটো খাটিয়া পেতে হাসপাতাল, সেখানে ভোঁতা সূচে ইনজেকসন দিয়ে চিকিৎসা চলে। কুলী মজুরের যদি হাত পা কেটে যেত তবে তাকে পালিশ করবার সময় এনেস্থেসিয়ার কথা কেউ চিন্তাও করত না। খটাং খটাং করে হাড় কাটা গুর্খারা বেশ সহ্য করত দেখতুম। এ জেলার এই সমস্ত অচিকিৎসিত কুলী মজুর ও প্ল্যানটারদের সুবিধার জন্য স্কটিশ মিশন কালিমপং-এ ঐ দাতব্য হাসপাতাল খুলেছিলেন। সেখানে শিক্ষিত ডাক্তার ছিল এবং মোটের উপর ব্যবস্থা মন্দ ছিল না—অপারেশন, এনেস্থেসিয়া দেওয়া ইত্যাদি সব কিছুরই মোটামুটি ভাল ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তবুও সে হাসপাতালে ঢুকলে আমাদের পক্ষে বাঁচার সম্ভাবনা কমই মনে করতুম, রবীন্দ্রনাথকে সেখানে কল্পনা করাও অসাধ্য। কিন্তু ইংরেজ ডাক্তার হাসপাতাল বোঝে—হাসপাতাল আছে কি নেই সে বিচার করবার তার সময় নেই—এই রকম রুগীর বাড়িতে চিকিৎসা হয় না। অতএব সে আবার গর্জন করে উঠল—"একে এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—।"

আমরা চুপ করে রইলুম। আমাদের মুখভাবে দারুণ অনিচ্ছা দেখে পুরুষপুঙ্গব আর একটি হুঙ্কার ছাড়লেন—"এর নার্স কে? আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।"

এবারে আমি যথার্থই নার্ভাস হয়ে পড়লুম। চেহারা পোষাক বিত্তা বুদ্ধি কিছুই আমার নার্সের উপযুক্ত নয়। একে তো হাসপাতালে নিয়ে যাইনি, দ্বিতীয়তঃ নার্সও ডাকি নি—আবার এ ডাক্তারও যদি চটে যায় তো বিপদ ঘটবে। উপযুক্ত কৈফিয়ৎ ভেবে না পেয়ে চট করে মিস এলেনকে ডেকে নিয়ে এলুম।

মিস এলেন মিশনারী ইংরেজ মহিলা, বৃদ্ধা, প্রায় ম্যালেরিয়ায় ভোগেন, তিনি ঐ বাড়িতেই ছিলেন। তাঁরও সেদিন জ্বর এসেছে, কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। আমি ভাবলুম যাহোক একজন ইংরেজ মেয়ে দেখলে ডাক্তারের মেজাজ হয়ত ঠাণ্ডা হবে। তাই যদিও তিনি বিশেষ রুগীর ঘরেও ঢোকেন নি তবু তাঁকে এনে খাড়া করিয়ে দিলুম। ফট করে যে একজন সাদা চামড়ার মানুষ হাজির করতে পারব সাহেব বোধহয় তা ভাবতে পারেনি। দেখলুম একটু ঠাণ্ডা হল। সে মিস এলেনের দিকে তাকিয়ে বেশ কড়া ভাবে বল্লে—"গরম জল বসাও, একটা পাত্র ষ্টেরিলাইস কর—একটা বড় বাতির বন্দোবস্ত কর—গামলা আছে?" মিস এলেন ভয়ানক ঘাবড়ে নিরুত্তরে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলুম—গরম জল গামলা ইত্যাদি দিয়ে কি হবে।

"অপারেশন করতে হবে। এ রুগীর প্রাণ বাঁচাতে হলে এখনই অপারেশন করতে হবে।"

"কী অপারেশন?"

"হয় লাম্বার পাঙ্কচার করে ফ্লুইড বের করে দেওয়া নয় সুপ্রা পিউবিক—সেই জন্যই হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই, এসব কাজের জন্য ব্যবস্থা চাই—।"

"একটু অপেক্ষা করুন—এঁর পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে—তাঁর অপারেশনে মত আছে কি না জানা চাই—"

"বেশ।"

সেই মুহূর্তে প্রতিমাদির সঙ্কট তিনি নিজেই নির্বাণ বইতে লিখেছেন। সে বিষয়ে আমার নূতন করে বলবার কিছু নেই।

তাঁকে কিছুক্ষণ ভাববার সময় দিয়ে, ডাক্তারের কাছে আবার ছুটে এলুম।

"উনি একটু চিন্তা করে বলবেন। ততক্ষণ রিলিফ দেবার মত কিছু করবার নেই? অপারেশন ছাড়া আর কিছুই করবার নেই?"

"ডাক্তার দাশগুপ্ত ক্যাথিটার দিতে পারে কিন্তু সেটা যন্ত্রণাদায়ক হবে ফলও বিশেষ কিছু হবে না।" সাহেব অধৈর্য হয়ে পায়চারী করতে লাগল।

প্রতিমাদি বল্লেন, "বুঝিয়ে বল, আজ রাতটার মত উনি এখানে থাকুন, কাল সকালে অপারেশন করবেন। ততক্ষণে কলকাতা থেকেও সবাই এসে পড়বেন।" ডাক্তার তাতে কিছুতেই রাজী হল না—আমি পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি করে সেই এক অনুরোধ জানাতে লাগলুম। 'Please wait another few hours.' সে তখন হাতের জামা গুটিয়ে একটা কিছু করবার জন্য উদ্যত—হঠাৎ ফিরে আমার দুই কাঁধের উপর তার বজ্র মুষ্টি স্থাপন করে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে—'Young lady! do you know the risk you are taking, he may not last twelve hours.'

তখনকার আমাদের দিশাহারা মনের অবস্থা আজ ভাল করে অনুভবে ফিরিয়ে আনতে পারি না। ভীত শঙ্কিত মন কাঁপতে লাগল—"একটু অপেক্ষা কর ডাক্তার, আমাদের উদভ্রান্ত করে দিও না। প্রতিমা দেবীই ডিসিসন নেবেন। তিনিই কর্ত্রী।"

ডাক্তার দাশগুপ্তর মুখও দেখি পাংশুবর্ণ। যেই স্থির করুক স্থির করা যে কত দুঃসাধ্য কাজ এবং তার দায়িত্ব ওখানে উপস্থিত

সকলেরই যে যথেষ্ট তা বুঝতে বাকি ছিল না। যদি অপারেশন না হয় ও এই রাত্রে প্রাণ যায়, সারা দেশের এই বিষম ক্ষতির কি জবাবদিহি করব ? সবাই বলবে, নিজেরাও চিরদিন ধিক্কার দেব নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকে। যদি রথীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, অতবড় সার্জেন যখন অপারেশন করতে চাইলেন তোমরা রাজী হলে না কী জন্যে ? স্ত্রী-জনোচিত দুর্বলতার জন্য এমন সর্বনাশ ঘটল। আর যদি এই ছোট জায়গায় দারুণ অবন্দোবস্তের মধ্যে অপরিচিত দুর্ধর্ষ ডাক্তারের ছুরিতেই প্রাণ যায় তাহ'লেই বা কি উত্তর ? ডাক্তার বলেছে বলেই এমন হঠকারিতা করব। এই প্রচণ্ড দ্বিধায় প্রতিমাদির মনে যে ঝড় উঠেছে আমিও তারি তরঙ্গে ওঠা পড়া করছি। ডাক্তার গর্জন করে উঠল—"যদি আমার উপদেশ শুনবে না, যদি ডাক্তারকে চিকিৎসা করতে দেবে না তবে আমাকে ডেকেছিলে কেন ? কেন আমাকে এই ঘোর দুর্যোগে চল্লিশ মাইল দৌড় করালে ?"

প্রতিমাদি গুরুদেবের মাথার কাছে স্থির দাঁড়িয়েছিলেন। বল্লেন, "মৈত্রেয়ী, আমি শান্তমনে ভেবে দেখলাম এই মুহূর্তে যদি বাবা মশায়ের জ্ঞান থাকত তিনি অপারেশনে মত দিতেন না। কোনো দিন তাঁর শরীরে অস্ত্রাঘাত করার মত নেই। নিজেরা যখন ভালোমন্দ বিচার করতে পারছি না এবং ফলও যখন অনিশ্চিত তখন তাঁর মতেই চলব। তবে কোনো রকমে ডাক্তারকে আজ রাতটা রাখবার চেষ্টা কর— ।"

কিন্তু সেই একরোখা ইংরেজ কোনোমতেই থাকতে রাজী হল না। সে তখনি ফিরে যাবেই। এবং যে দু তিন ঘণ্টা ছিল কোনো চিকিৎসাই করল না। যা কিছু যন্ত্রপাতি বের করেছিল একে একে ব্যাগে পুরে ফেরবার জন্য তৈরি হল। তখন আমরা স্থির করলুম আবার কলকাতায় ফোন করে জানা যাবে সেখান থেকে কেউ ডাক্তার নিয়ে রওনা হয়েছেন কি না। যদি আজ রাত্রেই রওনা হয়ে থাকেন তাহলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই

হবে নৈলে আর একবার এই ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবার চেষ্টা করা যাবে।

তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ে' সেপ্টেম্বরে শীতের কনকনানি। জ্বর গায়ে প্রতিমাদেবী গাড়ীতে উঠলেন, ডাক্তার দাশগুপ্তকে নিয়ে টেলিফোন করে সেইখানেই যা হয় স্থির করবেন। রোগশয্যার পাশে একাকী বসে রইলুম। রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। দুর্যোগের অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তার যেন মৃত্যুর পদধ্বনি বাজিয়ে গেল। অচৈতন্য দেহের মৃদু শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে উৎকণ্ঠিত তাকিয়ে আছি। শঙ্কায় শোকে বুকের ভিতর পাক দিয়ে উঠেছে। হঠাৎ আমার ভয়ানক রাগ হল। মন যখন দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়বার মত হয়েছে তখন তাতে ভারি জোর পেলুম। এ আবার একটা ডাক্তার। যত নাম করা সার্জেনই হোক,—সহ্য নেই, ধৈর্য নেই, দয়া মায়া নেই, কোনো কথা স্থির হয়ে বসে বিবেচনা করবার মত স্থিরতা নেই—। এই পরম মানবের জীবনের কী মূল্য বোধ এর থাকবেই বা? মেসিনের মত চলে, মেসিনের মত কাজ করতে চায়, এর হাতে কি সঁপে দেওয়া চলে? খুব সুবিবেচনার কাজই হয়েছে। মন স্থির করে উঠে দাশগুপ্তর দেওয়া মিক্স্‌চার খাইয়ে দিলুম, অচৈতন্য রুগীর মুখে জল দেওয়া বিপজ্জনক তবু ধীরে ধীরে একটু ডাবের জল খেলেন। তারপর একবার চোখ মেলে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন—"সব আপদ গেছে!'

"হ্যাঁ, ডাক্তার চলে গেছে—আপনি টের পেয়েছিলেন?"

কিন্তু ততক্ষণে আবাব সব চুপ হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ, অর্ধ অচৈতন্যের স্তিমিত মানসলোকে ফিরে গেলেন। রাত্রি এগারটা নাগাদ প্রতিমাদি ফিরে এলেন।

কলকাতায় ফোন পাওয়া গেছে, প্রশান্ত মহলানবিশ, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র ও ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার সকলেই রওনা হয়েছেন। ডাক্তার ফ—কিন্তু অনেক বলা সত্ত্বেও রাতটা থাকতে রাজী হল না। তাই তাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

একভাবে সেই বিষম সঙ্কটময় রাত্রি প্রভাত হল। অতি প্রত্যূষে মংপুর গাড়ী এসে পৌঁছল। ডাক্তার সেন বল্লেন, "রাস্তা চতুর্দিকে ধ্বসেছে। যদি এঁরা কলকাতায় নিয়ে যেতে চান তাহলে রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।" বেলা দশটা নাগাদ কলকাতার দল বল এসে পৌঁছল। মীরাদেবীও সেই সঙ্গে এসেছিলেন। ডাক্তার মৈত্র প্রথমেই একটি ইনটারমাসকুলার গ্লুকোজ ইনজেকসন দিলেন। আর একটা বড় ফ্লাস্কে আশি আউন্স গ্লুকোজ জল করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"এইটি তিন ঘণ্টায় খাইয়ে দিতে হবে।"

"সে কি জ্যোতিদা, উনি তো এক আউন্সও জল খেতে চান না—"

"সেই জন্যই তো তোমায় বলা হচ্ছে। এটা করতেই হবে।"

আর কি কি ইনজেকসন পড়েছিল জানিনা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অবস্থা উন্নতির দিকে গেল। জ্ঞান ফিরে এল। প্রথম চোখ খুলেই পায়ের কাছে কন্যাকে দেখতে পেলেন। সেই চিরদিনের প্রসন্ন হাসি হেসে বল্লেন, "এত দূরে কষ্ট করে ছুটে এসেছিস?" সর্বদাই অন্যের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল, অন্যের সুবিধার চেয়ে তাঁরটা যে কোনো অংশে বড়, তিনি যে প্রথম ও প্রধান সে প্রাধান্য আমলই পেত না। এটা কোনো তৈরি করা বিনয় নয়। এ সহজাত মানব মূল্য বোধ।

"আর তুমি কি করবে? রুগী পরিচর্যায় থাকবে? এলে বেড়াতে, পড়লে বিপাকে।"

তিন দিন পরে আবার সেই মধুর কৌতুক হাসি দেখে মনে ভরসা হল।

কলকাতা থেকে দলটি এসেছিল বিরাট—শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত সুরেন কর। ডাঃ অমিয় বোস, ডাঃ সত্যসখা মৈত্র, ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ও মীরা দেবী। এ ছাড়া আর কেউ ছিলেন কিনা মনেও নেই লেখাও নেই! অতএব কারু নাম বাদ পড়ে যেতেও পারে। ডাক্তারেরা পরামর্শ

করে স্থির করলেন সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় রওনা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। কিন্তু রাস্তার অবস্থা শোচনীয়, মাঝে মাঝে ধ্বস হয়ে জলে কাদায় কোনো কোনো জায়গা গাড়ী চলবার অযোগ্য হয়েছে—ঝাঁকানী লাগবার সম্ভাবনাও খুব। ডাক্তার সেন রাস্তার ব্যবস্থার ভার নিলেন। শ'খানেক কুলী জুটিয়ে রাস্তায় কাজ শুরু করলেন। পাথর মাটি দিয়ে দিয়ে ধ্বসের জায়গাগুলো কোনোমতে গাড়ীর যোগ্য করে তোলবার চেষ্টা চলতে লাগল! সকলকে পেয়ে প্রতিমাদির মন খুব হালকা হয়ে গেছে। প্রসন্ন মনে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। জিনিষপত্র বাঁধা চলেছে।

কিন্তু আমার হৃদয় কম্পমান। এখনি এঁরা সদলবলে নেমে চলে যাবেন—আর আমি শূন্যমনে মংপু ফিরে যাব। এই অবস্থায় এঁরা চলে গেলে আমি কী আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে একাকী আমার বনবাসে সে শূন্যতা বহন করব। কিন্তু অভিমান পূর্ণ আছে—অহং আকাশ স্পর্ধিত—যদি এঁরা না ডাকেন তবে কখনই যাব বলব না। আমাকে আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার যে প্রয়োজন আছে সে কথা কাউকে বলবনা।

বেপথু চিত্তে জিনিষপত্র গোছাতে লাগলুম! বেতের তিনটে ঝুড়ি—একটাতে বাসনপত্র রাস্তায় ব্যবহারের তার সঙ্গে সেই আশী আউন্স জল রাখা লাল বড় ফ্লাস্কটা রাখলুম। তোয়ালে ছোট ছোট। বন্ধ করা ঘড়িটা, যেটা সব সময় টেবিলের উপর থাকত সেটাও সঙ্গে যাবে এটাচিকেসে।—

"প্রতিমাদি, দেখে নিন কোথায় কি রাখছি। গাড়ীতে যে সঙ্গে থাকবে তাকে দেখিয়ে দেবেন।"

"বা! গাড়ীতে কি তুমি থাকবে না? তুমি কি যাবে না? এখন তুমি না গেলে কি চলে? আমি বলে দিই তোমার টিকেট করতে।"

পাশের ঘরে ঈষৎ আপত্তির আভাস অনুভব করলুম। কেউ কেউ বলেছিলেন অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়ে নিয়ে যাবার দরকার

হবে না। কিন্তু স্নেহময়ী আমার মাতৃসমা প্রতিমা দেবী বল্লেন, তা হবে না, মৈত্রেয়ীকে যেতেই হবে এবং গাড়ীতেও পরিচর্যার কাজে সে-ই থাকবে।

একটা স্টেশন ওয়াগনের সীট খুলে ফেলে বিছানা পাতা হল, তার মধ্যে শুইয়ে দেওয়া হল। ড্রাইভারের পাশে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ ও শ্রীসুরেন কর পালা করে বসতে লাগলেন। ভিতরে আমি রইলুম—মাঝে মাঝে জল খাওয়াতে খাওয়াতে ও অর্ধ অচৈতন্য দীর্ঘ শরীরকে সেই পাহাড়ে' পথে ঝাঁকানী থেকে বাঁচিয়ে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে করতে সে তিন ঘণ্টা খুব কাজেই কাটল। দীর্ঘ দুর্গম পথ। কিন্তু এতজন সহায় থাকাতে আগের ক'দিনের মত ভয়শঙ্কা কিছু ছিল না, শুধু সেই পরম প্রিয় আরাধ্য নরোত্তমের সেবার দুর্লভ সৌভাগ্য মনকে স্নিগ্ধ করে রেখেছিল। পথে মাঝে মাঝে আমাদের বাগানের কুলীর দল দেখা গেল, এক হাঁটু জল কাদায় ডাক্তার সেন তাদের দিয়ে রাস্তা ঠিক করাচ্ছেন। গাড়ী একটু একটু করে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে, তিনি এসে গাড়ীর পাশে দাঁড়ালেন। আমাদের তখন মনে হচ্ছিল কবির হয়ত একেবারেই চেতনা নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়—পরে জোড়াসাঁকোয় আমায় একবার জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখো, ডাক্তার তো কালিমপং আসেনি, কিন্তু নামবার সময় একবার তাকে দেখলুম, সে কি স্বপ্ন?"

এই কোমা বা বিষক্রিয়ার তন্দ্রা ভারি অদ্ভুত—বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি বাইরে যখন চেতনার লক্ষণ নেই ভিতরে তখন যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে।

রাত্রি ৯টা নাগাদ আমাদের পাঁচ ছয়খানা গাড়ীর ক্যারাভান শিলিগুড়ি পৌঁছল। মিঠু তার বাহন সুখদার সঙ্গে মীরাদির কাছে দিব্যি কাটিয়েছে। কিন্তু বেচারা মীরাদেবীর পাহাড়ে' পথে অভ্যাস নেই, তাই মাথা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বল্লেন—"ভাগ্যিস তুমি এলে, রুগী নিয়ে বসে রইলে তিন ঘণ্টা এই রাস্তায়—"

আমি জানি কী সৌভাগ্য সে আমার। তবু তখনও জানিনা সেই ক'দিনের স্মৃতিটুকু কী অমূল্য সম্পদ হবে। জীবনের বাকি দিনগুলি ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে রাখবে—অকিঞ্চিৎকর জীবনকে মহৎ মর্যাদা দেবে।

শিলিগুড়ি ষ্টেশন লোকারণ্য। রথীদা পতিসর থেকে সেখানে এসে পৌঁছেছেন। সম্ভবত তিনি রেডিও মারফৎ খবর পেয়েছিলেন যে ঐ সময়ে কবিকে নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় আমাদের টেলিফোন মারফৎ কথাবার্তা শুনে টেলিফোন এক্সেঞ্জের কর্মীরা খুব সাহায্য করেছিলেন—খবরাখবর পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ছটো কি তিনটে কামরা রিজার্ভ করা হল। একটা কামরায় ডাঃ অমিয় বোস, ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর ও আমি রোগী পরিচর্যায় রইলুম। অন্য কামরায় আর সকলে চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশ আমাদের ঘরে ছিলেন না কিন্তু প্রতি ষ্টেশনেই প্রায় তাঁকে নেমে আসতে দেখেছিলুম—। কারণ, খবর ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ষ্টেশনে গাড়ী আসলেই লোকের ভিড় উৎকণ্ঠিত হয়ে কুশল প্রশ্ন করছিল—রেলিংএর উপর চড়ে চড়ে ঘরের ভিতর দেখবার চেষ্টাও করছিল। গভীর রাত পর্যন্তও ষ্টেশনে ষ্টেশনে এই স্নেহব্যাকুল জনতার উচ্ছ্বাস থামে নি। প্রশান্তবাবু ভয় পাচ্ছিলেন পাছে কোনো গোলমাল হয়। তাই হাত জোড় করে অনুনয় করে করে ভিড় সরাবার চেষ্টা করছিলেন। আমি জানালায় বসে বসে সে দৃশ্য দেখে নিজের অসীম সৌভাগ্যে লজ্জা বোধ করছিলুম। আমার চেয়ে যোগ্যতর ভক্ত, আমার চেয়ে অধিক উৎকণ্ঠিত, অধিক আগ্রহপূর্ণ অনেকেই নিশ্চয় ঐ ভিড়ের মধ্যে ছিলেন, যাঁরা এ নিশীথ রাত্রে উড়ো খবর পেয়ে ভিড় ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে আছেন, কখন এ পথ দিয়ে ট্রেন যাবে একটুখানি দেখতে পাবেন সেই আশায়—তাঁরা এ ঘরে ঢুকতে পাবেন না। তাঁদেরও পরম আত্মীয়র চিরবিদায়ের মুহূর্তে

স্নেহস্পর্শটুকু পাবার, মনের আর্তিটুকু পৌঁছে দেবার উপায় নেই। এমন কি তাঁদের দৃষ্টিপাতের সামনেও আড়াল আছে। একথা সেদিন মনে হয়েছে এবং পরে আরো গভীর ভাবে বুঝেছি যে তাঁর চারপাশে যাঁরা নিয়ত তাঁর স্নেহধারায় সিক্ত হয়েছেন সে তাঁদের নিজস্ব কোনো আশ্চর্যগুণে নয়—সে কেবল অদৃষ্টক্রমে। তাঁর স্বতস্ফূর্ত স্নেহ ও করুণা আপন উচ্ছ্বাসেই প্রবাহিত হয়েছে। যাদের উদ্দেশ্য করেছে তারা উপলক্ষ মাত্র। তবে যার যেমন পাত্র সে ততটুকুই ধারণ করতে পেরেছে সে কথাও সত্য বটে।

কিন্তু যেমন কাব্যের উপলক্ষ কোথায় হারিয়ে যায় কিন্তু কাব্য থাকে কারণ উপলক্ষর চেয়ে কাব্য অনেক বড় তেমনি নানা বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে স্নেহে প্রেমে করুণায় বন্ধুত্বে বাৎসল্যে মাধুর্যে এমন কি কখনো ক্ষোভে দুঃখে যখন যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছেন তাও এক একটি কাব্য রূপ। তার উপলক্ষ যন্ত্রীর যন্ত্র মাত্র। সে যেন সেতারের তার, শিল্পীর রং তুলি, রূপকারের জীবন ধ্বনি বাজাবার কতগুলি উপায়। যে কাউকেই তিনি দেখতেন তার বিশেষ সংকীর্ণ রূপকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রসারিত হত তাঁর দৃষ্টি। সে ব্যক্তি নিজেকে নিজে যা জানে তার চেয়ে অনেক বড় আছে তার চিত্তের পটভূমি, সেই অনাবিষ্কৃত মহাদেশ তিনি দেখতে পেতেন চারিদিকের মানুষের মধ্যে—তাই সাধারণ দৃষ্টিতে অতি অপাত্রকেও স্নেহ দিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কথা লিখতে যাওয়া তাই কঠিন কাজ। অহংকে সরিয়ে না রাখতে পারলে সে লেখা সত্য হবে না। তুমি আমি কেউ নয়, মহামানবের সঙ্গে সকল মানুষের নিত্যকালের সম্বন্ধ। এ শুধু কাব্য কথা নয়। তাঁর সম্বন্ধে গত পনের বছর ধরে যতই ভাবছি ততই এ কথার সত্যতা বুঝেছি। সেজন্যই আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরি আমার দেশবাসীকে অসঙ্কোচে উৎসর্গ করছি যাতে আমার ব্যক্তিগত ভক্তি ভালবাসার ভিতরে তাঁরা তাঁদেরও প্রিয় কবির সঙ্গে দেশগুরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের গ্রন্থিটি বাঁধেন।

সকালবেলা ষ্টেশনে গাড়ী এসে পৌঁছল—তখন অবস্থা অনেক ভাল। অ্যাম্ব্যুলেন্স গাড়ীর মধ্যে প্রথম জ্ঞান ফিরে এল, তখনকার কথা অন্যত্র লিখেছি। সেবারে প্রায় একমাস জোড়াসাঁকোয় কাটল। সেবক সেবিকা অনেক ছিলেন। যদিও সকলে আমারি মত অ্যামেচার। শিক্ষিত নার্স রাখা চলল না। ডাক্তার রাম অধিকারী বাড়িতেই থাকতেন। তিনি খুব গম্ভীর স্বরে মানসীর কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন, কবির তা ভালও লাগত। এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে এ বিষয়ে আমারও বেশ উৎসাহ বেড়ে গেল। তাতেও কবি ক্ষুণ্ণ হতেন না। বলতেন, "না না ক্লান্ত হব কেন? শুনতে কষ্ট হবে এ রচনা তো ঠিক তত মন্দ নয়।"

সারা সকাল বৈঠকখানায় ডাক্তারের সভা বসত। ডাক্তার রায় নিয়মিত আসতেন।

কলকাতায় নেমেই অপারেশনের কথা খুব শুনলুম। ডাঃ ব্যানার্জী অপারেশন করতে ইচ্ছুক। অনেকেই ইচ্ছুক। অপারেশন ছাড়া উপায় নেই। কলকাতায় পৌঁছবার দু'তিন দিনের মধ্যেই একদিন রাত্রে খুব বাড়াবাড়ি হল—দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ডাঃ রায়ও শিলং গিয়েছিলেন।

এমন সময় একদিন পূজ্যপাদ ডাঃ নীলরতন সরকার এলেন—তাঁকে ঘিরে সভা বসল। ডাক্তারের সভা। সব বয়সের নানা স্তরের খ্যাতিসম্পন্ন নানা ডাক্তারের ভিড় সব সময়ই থাকত। আমরা অর্বাচীনের দল কাছে কাছে ঘোরা ফেরা করতে লাগলুম। ভিতরে ঢুকে পড়তে সাহস নেই—অথচ ভারি কৌতূহল। এমন সময় রথীদা আমায় ডেকে রুগী সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলেন। সেই সুযোগে স্থাণুবৎ এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘরের দৃশ্যটি দেখতে লাগলুম। আজ পর্যন্ত সেই দিনটি আমার মনে গভীর উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঋষিতুল্য মানুষ নীলরতন সরকার—সদাপ্রসন্ন স্নিগ্ধমূর্তি। তাঁকে চিরদিন আমাদের সুহৃদ ও সহায় রূপে জানতুম। তিনি ঘরে ঢুকলেই পরম আশ্বাস পেতুম।

তিনি ছাড়াও যে রোগ ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা বাঁচতে পারব এ কথা তাঁর বর্তমানে, বিশ্বাস হত না। সেই ডাক্তার তখন নিজেই সম্পূর্ণ অথর্ব হয়ে পড়েছেন—হাত পা কাঁপে, বোধ হয় বেশি কথাও বলতে পারেন না। তবু তিনি নীলরতন সরকার —চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ। তিনি একটা বড় চৌকিতে বসেছেন আর তাঁকে ঘিরে বসেছেন ডাক্তারের দল। সকলেই বিদ্বান চৌকস। একজন অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা ও সেটা যে অবিলম্বেই দরকার তা বিশেষ করে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। বক্তব্য শেষ করে তিনি ডাঃ সরকারের অনুমতি চাইলেন, "তাহলে স্যর এখনই করা চলে ?"

"না"—

আবার একজন নানা যুক্তি বিচার করে কিছুক্ষণ বুঝিয়ে সেই একই প্রশ্ন করলো—"তাহলে স্যর ?"

কোনো রকম উত্তেজনাহীন স্মিতমুখে সেই একই উত্তর দিলেন,—"না"—

এই ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বড় বড় রথীরা একে একে তাঁদের বক্তব্য শেষ করলেন। ডাঃ সরকার স্থির ভাবে মুখে একটি প্রসন্ন হাসি নিয়ে সব কথা শুনলেন, কোনো কথা যে তাঁর অপছন্দ হয়েছে তাও তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না—কোনো উত্তর প্রত্যুত্তর করলেন না। শুধু সবার বক্তব্যর শেষে ও প্রশ্নের উত্তরে, একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত কথা বললেন—"না"—।

শেষ "না" বলে তিনি কম্পিত পদে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললেন—। আলুবাবু বোধ হয় তাঁকে ধরে নামাতে লাগলেন। এমন সময় একটি তরুণ ডাক্তার ছুটে এসে তাঁকে কি প্রশ্ন করলেন। বোধ হয় ভাবার্থ এই যে অপারেশন তো হবে না তবে এখন কর্তব্য কি। একটু চুপ করে স্থির হয়ে রইলেন জ্ঞানী পুরুষ। তারপর ঈষৎ একটু ফিরে বললেন—'এম বি সিকস নাইন থ্রি।'

তখন এসব ওষুধের নাম এমন সড় গড় হয় নি। সাল্‌ফা-ড্রাগস্ একেবারে নূতন উঠেছে। আমি ভাবছি একথাটার অর্থ বা কি।

এইচ এম্ ভি গ্রামোফোন রেকর্ড আছে তো জানি কিন্তু এম বি দু'শ তিরানব্বইর মানেটা কি! এটা যে ওষুধের নাম তাই কোনো দিন শুনিনি। নবীন ডাক্তারেরা চিন্তিত মুখে প্রশ্নোত্তর করতে লাগলেন—বিশেষত সকলেই re-action এর ভয় করছিলেন। যাহোক সেবার ক্রমে সেই ওষুধেই মোটামুটি সেরে উঠলেন। শান্তিনিকেতনে ফেরবার কথা চলতে লাগল—আমিও আমার শৈলাবাসে ফিরে এলুম। কয়েক বছর পূর্বেও আমি তাঁকে কখনো কারু জন্য বিশেষ ব্যস্ত হতে দেখিনি। একটি গভীর নির্লিপ্ততা তাঁকে বেষ্টন করে থাকত—যত স্নেহপাত্রই হোক তাঁদেরই প্রয়োজনমত ইচ্ছামত তাঁরা আসা যাওয়া করতেন। কাউকে আঁকড়ে ধরা তাঁর স্বভাবই ছিল না। কিন্তু ইদানিং অসুখের মধ্যে কেউ দূরে যাবার কথা বললেই বিচলিত হয়ে পড়তেন। সুধাকান্তবাবুর সাহায্যে ফেরবার কথা তোলা গেল।—

"একেবারে টিকিট করা হয়ে গিয়েছে?" একটু ক্ষণ সবাই চুপচাপ।

"Reduced price sale-এ উঠেছি এখন, আর আমি ইনটারেষ্টিং নই!"

এই ভর্ৎসনার উত্তরে নতমুখে বসে রইলুম নীরবে। বলতে পারলুম না রোগশয্যার এই প্রান্তটুকুতে থাকতে পারা আমাদের কতখানি কাম্য! বলতে পারলুম না প্রায়-অস্তমিত রবির বর্ণচ্ছটা মধ্যাহ্নের ভাস্করের চেয়ে কম মনোরম নয়। বলতে পারিনি এই রুগীর ঘরখানির মধ্যেও মহাকালের পদক্ষেপের তালে তালে তিনি আজও বাজাচ্ছেন উৎসবের রাগিনী। এসব উত্তর তখন কোন্ শূন্যে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা ভেদ করে সুধাকান্ত বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তরল ভাবে বলে উঠলেন—"কিন্তু গুরুদেব, এ কথাটা আপনার মাংপবীকে বলা উচিত হয়নি।"

"তুই থাম্, তুই এসবের কি বুঝিস্"—

আমি জন্মদিন কবিতাটা থেকে খানিকটা আবৃত্তি করতে লাগলুম—"আমাতে তোমার প্রয়োজন শিথিল হয়েছে। তাই মূল্য মোর করিছ হরণ—দিতেছ ললাট পটে বর্জনের ছাপ।··· যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধ প্রায়—যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়, বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙ্গা মন্দির বেদিতে প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে—তারে কেড়ে নিতে শক্তি নাই তব। ভাঙো ভাঙো, উচ্চ কর ভগ্নস্তূপ। জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী, প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালবাসিয়াছি' সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি—"

"ঠিক কথা,—প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে—যা হয়েছি তা ফুরাবে না—আর যা পেয়েছি যা দেখেছি তুলনা তার নাই—কিন্তু মিত্রা, তুমি সর্বদা আমারি অস্ত্র তোমার হাতে শান দিয়ে রাখ, কাজেই হেরে গিয়েও নালিশ করতে পারি না।"

এই অক্টোবরের পরেও প্রায় একবছর তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য গিয়েছি শান্তিনিকেতনে কিন্তু বেশি দিন থাকা আর হয়নি। প্রয়োজনও কিছু ছিল না এবং রুগীর বাড়িতে বেশি ভিড় করাও উচিত হত না। চিঠিপত্রও বেশি লিখতুম না পাছে তাঁর উত্তর দিতে বা উত্তর দিতে না পেরে কষ্ট হয়। অন্তর্যামীর মত সে কথাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

সুধাকান্তবাবু লিখলেন—

"আপনার প্রেরিত কমলালেবু দেখে গুরুদেব যে কী আনন্দ পেয়েছেন সেটা ভাষায় বলতে পারব না। লেবুগুলো দেখেই আমাকে বল্লেন, 'বেচারী আমাকে চিঠি লেখে না পাছে আমার পড়তে বা তার জবাব দিতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমার জন্য সর্বক্ষণ ভাবছে' * * * ইত্যাদি—

সেই সঙ্গে একটি কবিতা পেলুম কম্পিত অক্ষরে সই করে পাঠিয়েছেন।

নগাধিরাজের দূর নেবু নিকুঞ্জের
রস পাত্রগুলি
আনিল এ শয্যাতলে
জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা।
অজানা নির্ঝরিণীর—
বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার
হিরণ্ময় লিপি
সুনিবিড় অরণ্য বীথির
নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত
স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি।
রোগ পঙ্গু লেখনীর বিরল ভাষার
ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার

—রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন ২৫।১১।৪০

এ কবিতা অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।

আজ এই সব ছোটখাট ঘটনার ভিতরে দেখতে পাই সেই আশ্চর্য মানুষের পরিচয়। কী দরদ নিয়ে তিনি দেখতেন তাঁর চারিদিকের সকলের মন। মানুষের অন্তস্তলে পাঠিয়ে দিতেন স্নেহময় অন্তর্দৃষ্টি কত সহজে।

মানুষের স্পর্শ-প্রত্যাশী সেই পরম মানবের শেষ কয়েক মাস রোগ যন্ত্রণার চেয়েও বেশি কষ্ট ছিল এই যে, তাঁকে চারপাশের জীবনযাত্রা থেকে দূরে চলে যেতে হয়েছিল। প্রতিদিন কত লোকের জীবনধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলত তাঁর চিন্তায় আনন্দে, সংসারে নানা ব্যাপারে স্পর্শিত হতেন প্রত্যহ। সে সব কোনো বড় বড় ঘটনা নয় সামান্য লোকের সামান্য ছোটখাট সুখ দুঃখ—'ইতিহাস যাহাদের তোলে অনায়াসে সভা ঘরে যাহাদের স্থান নাই'—তাদের সেই প্রতিদিনের জীবন তরঙ্গ তাঁর জীবন স্রোত থেকে সরে যেতে

লাগল দূর থেকে দূরে—তিনি শয্যায় বন্দী, রোগের কষ্টে বন্দী, কানের অশক্তিতে বন্দী, চারপাশের জীবনের সঙ্গে এই বিচ্ছেদে তাঁর পূর্ণ প্রাণের উৎসরণের পথ গেল হারিয়ে। এই সময়ে যে সব চিঠি লিখতেন তা বেশির ভাগই অন্য কারু হাতের লেখায়। হঠাৎ একদিন তাঁর নিজের হাতের কম্পিত অক্ষরে লেখা একটি চিঠি পেলাম।

এই চিঠির মধ্যে সেই দূরের পথিকের, নিঃসঙ্গ পথিকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যার—

"সম্মুখে অকূল সিন্ধু নিঃশব্দ রজনী
তারি তীর হতে আমি আপনার শুনি পদধ্বনি।"

"কল্যাণীয়াসু,

কাল তোমাকে হতাশ্বাস ভাবে চিঠি লিখেছি, আজ বৌমার কাছ থেকে যথাসম্ভব খবর পেয়েছি—অতএব সে চিঠি ক্যানসেলড্। তোমারও অনেক খবর পাওয়া গেল। সব কথা আলোচনা করবার মত শক্তি নেই। অতএব চুপ করলুম। আমার ভ্রমণ এক ঘর থেকে আর এক ঘরে এবং ঘর থেকে বারান্দায়। সারাদিন কেদারাটাতে বসে তোমাদের সচলতাকে ঈর্ষা করি।

বড় ঘর থেকে এসেছি কাঁচের ঘরে। বসে আছি নির্জনে, জানালার ভিতর দিয়ে আলো আসচে—তুর্দিনগ্রস্ত রোগীর পক্ষে সে একটা পরম লাভ। জীবনের মহাদেশ থেকে আমাকে দ্বীপান্তরে চালান করা হয়েছে—একলা ঘোর একলা। চললুম, সেলাম।

ইতি—

তোমাদের নির্বাসিত
রবীন্দ্রনাথ

৭।১।৪১
শান্তিনিকেতন

পরিচয়পত্র

অক্সোনিয়ান—	শ্রীঅনিল কুমার চন্দ
অনিল—	ঐ
অমিয়—	ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী
ডাঃ অমিয় বোস	
আলু—	শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়
ইয়েটস্—	W. B. Yeats
উমাচরণ—	ভৃত্য
একপুত্র—	শ্রীজয়দেব গুপ্ত
এণ্ড্রুজ—	Rev. C. F. Andrews
অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ছেলে—	J. Macdonald and D. Macdonald
মিস্ এলেন—	Miss.Mary Allen
কানু—	বালক ভৃত্য
ক্রেগ—	ডাক্তার ক্রেগ
খুকু—(৪২ পৃঃ)	শ্রীঅমিতা সেন
খুকু—	শ্রীমতী মধুশ্রী সেন
গাঙ্গুলী—	শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
গাঙ্গুলীপত্নী—	শ্রীউমা দেবী
গৃহকর্তা—	শ্রীমনোমোহন সেন
ছোটকর্তা—	শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়
ছোটবৌ—	কবিপত্নী পূজনীয়া ৺মৃণালিনী দেবী
জ্যোতিদাদা—	৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্যোতিবাবু—	ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার
ডাক্তার—	শ্রীমনোমোহন সেন
ডাক্তার দাশগুপ্ত—	
চিত্রার ভগ্নিপতি—	ঐ
তুলতুল—	শ্রীমতী সুমিত্রা দাশগুপ্তা
তোমার খুকু—	শ্রীমতী মধুশ্রী সেন
তোমার জামাতা—	শ্রীমান অভিজিত চন্দ (পরিহাসচ্ছলে উক্ত)

তোমার বন্ধু—	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী
তোমার বাবা—	ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
তোমার ভাগ্নী—	শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী
দ্বিপু—	৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দাদা—	৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
নতুন বৌঠান—	৺কাদম্বিনী দেবী
নন্দবাবু—	শ্রীনন্দলাল বসু
নন্দিভৃঙ্গি	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীঅনিলকুমার চন্দ
নন্দিনী—	শ্রীমতী নন্দিনী দেবী
নলিনী—	শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার
নীলরতনবাবু—	ডাঃ সার নীলরতন সরকার
পটেটো—	শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়
পুপে—	শ্রীনন্দিতা দেবী
প্রশান্ত—	শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ
বনমালী—	পুরাতন ভৃত্য
বলডুইন—	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী
বড়দা—	৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বড়কর্তা—	শ্রীঅনিলকুমার চন্দ
বাঙাল—	শ্রীসুধীর কর
বেলা—	কবিকন্যা ৺মাধুরীলতা দেবী
বিহারীলাল—	কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী
বৌঠানরা—	৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীদ্বয়
বৌঠাকরুণ—	৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ৺কাদম্বিনী দেবী
বৌদ্ধবৃদ্ধ—	হরকামান লামা
বৌমা—	প্রতিমা দেবী
ডাঃ ব্যানার্জী	ডাঃ ললিত ব্যানার্জী
মনোমোহন—	মনোমোহন সেন
মহাদেব—	ভৃত্য
মা—	হিমানী দাশগুপ্তা
মাতৃস্বসা—	সুব্রতা দেবী
মাসী—	ঐ

মাংগবী—	মৈত্রেয়ী দেবী
মিঠুয়া—	মধুশ্রী সেন
মিত্রা—	মৈত্রেয়ী দেবী
মীরা—	মীরা দেবী
মেজদা—	৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেজমেয়ে—	রেণুকা দেবী
রথী—	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রথেনষ্টাইন—	William Rothenstein
রামানন্দবাবু—	৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ অধিকারী—	ডাঃ রাম অধিকারী
রেণু—	রেণুকা রায়
লোকেন পালিত—	৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত
শমী—	৺শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সত্য—	৺সত্যেন্দ্রপ্রসাদ গাঙ্গুলী (কবির ভাগিনেয়)
সপ্তমপুত্র—	কবি স্বয়ং
সুধাকান্ত—	সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
সুধাসমুদ্র—	ঐ
সুরেন—	৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরেনবাবু—	সুরেন্দ্রনাথ কর
সুচিত্রা—	চিত্রিতা দেবী
সুমিত্রা—	মৈত্রেয়ী দেবী